রাধামতি।

উপন্যাস।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দ্বারা প্রকাশিত।

৯।১নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

CALCUTTA.
PRINTED BY K P BIDYARUTNA
AT THE HERALD PRINTING WORKS,
75, Cornwallis Street.

ভূমিকা।

জনৈক প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে 'রাধামতি' রচিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ পুস্তকখানি লেখা হয় নাই। সামাজিক দুর্দ্দশা দেখিয়া বহু দিবসাবধি একখানি উপন্যাস জনসাধারণে প্রকাশের অভিলাষ ছিল, অদ্য সেই আশা পূর্ণ হইল। এক্ষণে প্রিয় পাঠকমণ্ডলী স্নেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে নিবেদন, বঙ্গদেশে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য যতই কেন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক না। সম্পূর্ণ নির্ভুল পুস্তক অদ্যাবধি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাধামতি পুস্তকেও স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি ভুল হইয়াছে। যথাসাধ্য কতকগুলি ভ্রমসংশোধনের তালিকা প্রদত্ত হইল। পাঠক মহোদয়গণ এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা করিবেন।

বিনয়াবনত

গ্রন্থকার।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি।
১০	৬	ষাহাদিগেব	যাহাদিগের
১২	৯	চিন্তানলে	চিতানলে
১৩	১৬	অধিকাংশই	অধিকাংশ
১৫	১	ষেঁ	যে
১৬	২৩	নিবুদ্ধিতা	নির্বুদ্ধিতা
১৭	২	বর্গেব	বর্গের
২০	৪	ষে	যে
২২	৪	যৌবন	যৌবন
,,	১৭	কাজকের্ম্মেব	কাজকর্ম্মের
,,	১৯	ক্রমে	ক্রমে
২৪	২১	সমুক্ষে	সমক্ষে
,,	২৪	পারপাট্য	পারিপাট্য
২৬	১৯	হইয়াছিলেন	হইলেন
২৮	২১	আধার	আঁধার
২৯	১	শশা	শশী
,,	১৩	এইটীই	ইহাই
৩১	১	সরলা	সরল
৩৭	৬	চলিতেছে	চলিয়াছে
৪১	২৩	পংস্পরকে	পরস্পরকে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি।
৪৪	১৪	হইয়া	হইয়া যে
৪৮	৪	মিমিত্তই	নিমিত্তই
৬৩	২৪	ষাইয়া	যাইয়া
৬৮	১৭	ষে	যে
৭৬	২৪	সম্মখে	সন্মুখে
৮১	২১	ষেণ	যেন
৮২	১১	স্থান স্থান	স্থানে স্থানে
৮৪	১৬	ছিলনে	ছিলেন
৮৬	৯	শান্ত্বনা	সান্ত্বনা
৯৭	২	স্থল	স্থান
১০১	১২	হেমেন্দ্রর	হেমেন্দ্রের
১০২	৬	সংঅ	অসং
১১৩	২	স্ত্রীলোকটীকে	স্ত্রীলোকটীকে
১১৭	২০	বৃদ্ধর	বৃদ্ধার
১২০	৪	আর্জীবন	আজীবন
"	১০	প্রাণপেক্ষা	প্রণাপেক্ষা
"	১৪	সুরাশক্ত	সুরাসক্ত
১২৬	১২	আশায়	আশয়ে
১৩৩	১১	করিতেছেন	করিয়াছেন
১৩৬	২১	অনুকক্তা	অনুরক্তা
১৪০	১৫	সুবোধমতি	সুবোধ
১৪১	১৪	লোক স্থান	লোকালয়
১৪২	৭	সমাজিক	সামাজিক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি।
,,	২১	দুবৃত্ত	দুর্ব্বৃত্ত
১৪৫	৭	ঘটিনার	ঘটনার
১৪৯	৩	আজি	আজ
,,	৭	জবনর্গের	জনবর্গের
১৬০	৯	আশক্ত	আসক্ত
,,	১৩	সহদরার	সহোদরার
১৬৫	১৬	স্ত্রীলোক	স্ত্রীলোক
,,	১৯	করিয়া	করিয়া
১৬৬	২২	কাথাবার্ত্তা	কথাবার্ত্তা
,,	২৩	তাহাকে	তাঁহাকে
১৬০	১৫	যাবে	যাবে
১৭০	৮	ভূষায়	ভূষা
১৭৭	১৯	মকলে	সকলে
১৭৯	১০	অর্পিত!	অর্পিত
১৮০	১৭	সবিশেষ	সবিশেষ
১৮৯	১৮	বিষরে	বিষয়ে
১৯১	৩	যথেষ্ট	যথেষ্ট
,,	১৭	সুরাশক্ত	সুরাসক্ত
১৯৬	২০	আশক্ত	আসক্ত
১৯৮	১৯	হেমেন্দ্র	মহেন্দ্র
২১১	৩	আজি	আজ
২১৩	২১	প্রতীক্ষার	প্রতীক্ষায়
২১৫	১	আশক্ত	আসক্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি।
২২২	৮	হ তেছে	হইতেছে
২২৩	৭	কাচ	কদাচ
২২৫	১৪	শ্বশ্রু	শ্বশ্রূ
২৩৮	২	এতাবৎকাল পর্য্যন্ত	এতাবৎকাল
”	৬	জন্যে	জন্য
২৩৯	১২	প্যবেশ	প্রবেশ
”	২১	কলিলকাতায	কলিকাতার
২৪৪	১১	যন্থনা	যন্ত্রণা
২৫৫	৩	ত্রৈ	ত্রৈ
২৬২	১১	হইজন্মের	ইহজন্মের
২৭০	২২	আাডিট	অডিট
২৮১	২৬	য়াছেন	দিয়াছেন
২৮২	”	জগতরে	জগতের
২৮১	’	কোনি	কোন
২৮৫	৭	অনুবাগিনী	অনুরাগিণী
২৮৭	১৬	বিয ম্বর্ণ	বিনয় স্বর্ণ
২৯২	১২	সক্ষাং	সাক্ষাৎ
২৯৫	১০	গিয়াছিল	গিয়াছে
৩/০	১৯	যে	বে

রাধামতি।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। নিদাঘের নিদারুণ পীড়নে জীবজন্তু যেন হতচেতনায় নিস্পন্দভাবে কালক্ষেপ করিতেছে, নিত্যনিয়মিত পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিয়াও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই; সকলেই শান্তি আশয়ে উৎকণ্ঠিত, দিবাভাগে গগনমণ্ডলে রবি তেজোময় ছবি বিকাশ করিয়া স্বভাবতঃ ধরাতল উত্তপ্ত করিয়া থাকে। তাহাতে গ্রীষ্মকাল, শান্তি-ময়ী উষা-সতীর তিরোভাব হইতে না হইতে রক্তিম বর্ণে অরুণদেব আকাশের পূর্ব্বভাগে বিকসিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, পথ ঘাটে কর্দ্দমের চিহ্নমাত্র নাই; স্থানে স্থানে সঞ্চালিত বায়ু-বিতাড়িত ধূলিরাশি পথিকদিগের পরিধেয় বিবর্ণ করিতেছে, নদ নদী সরোবরের এক্ষণে সেরূপ সরস ভাব দৃষ্ট হইতেছে না; অধিকাংশের জলরাশির পঙ্কাবশেষ হইয়াছে, তন্মধ্যে যথায় স্রোতস্বতী-প্রবাহ অবিরত সঞ্চালিত, সে সকলে অপেক্ষাকৃত সলিলরাশি ন্যূন

হইলেও পঙ্কিল ভাব দৃষ্ট হয় না। যে পঞ্চভূতে জীবের দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান, বায়ুশূন্য স্থানে মনুষ্য ক্ষণকাল কদাচ যাপন করিতে পারে না। আবার শীতল সমীরণই আমাদিগের একমাত্র শ্রান্ত কলেবরের উপাদেয়; গ্রীষ্মকালে সুশীতল মৃদুল অনিল তাদৃশ অনুভূত হয় না, তাহাতেই সমধিক কষ্টের উদ্রেক হইয়া থাকে। তরুলতা-ছায়ায় শরীর সুশীতল হইবে ভাবিয়া রৌদ্র-তাপে তাপিত পথিক সত্বর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করে, কিন্তু প্রভাত ও সন্ধ্যার প্রাকৃতিক শীতলতা প্রযুক্ত নিদাঘের দারুণ কষ্ট তাদৃশ অনুভব হয় না, মধ্যাহ্নে সর্ব্বত্র অগ্নি সদৃশ উত্তপ্ত ভাব ধারণ করে, গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইতে হইলে প্রখর সূর্য্যকিরণে শরীর উত্তাপিত হইতে থাকে। ধনাঢ্যবর্গের ঋতু-পরিবর্ত্তন-জনিত কোন কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। বৈঠকখানাগৃহের চতুষ্পার্শ্ব খস্‌খসের টাটি দ্বারা আচ্ছাদিত, মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরোপরি "ঐরাবত" দেহ বিস্তারিত করিয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আজ্ঞাবাহী ভৃত্যগণ অবিরত বীজন সঞ্চালন করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুশীতল অনিলরাশি প্রভুর উপভোগ কারণ গৃহমধ্যে আনয়ন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে গোলাপ কেওড়া সংযুক্ত বরফমিশ্রিত শীতল পানীয়ে তাহাদিগের তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে। দরিদ্রগণ স্বভাব-সুন্দরীর প্রকৃত সন্ততি; তাহারা শীত-গ্রীষ্মের স্বাভাবিক প্রতাপ সমভাবে সহ্য করিয়া থাকে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে

তাপিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গ্রীষ্মকাল যাপন করে এবং প্রখর শীতের প্রবল প্রতাপ-নিবারণোপযোগী পরিচ্ছদাদির অভাবজনিত জীর্ণ শীর্ণবস্ত্রে তনু আচ্ছাদন করিয়া কায়ক্লেশে তাহাদিগের সময় অতিবাহিত হয়।

এক দিবস এই নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে, জগৎজীবন বায়ু এককালে স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছে, সময়ে সময়ে অগ্নিশিখা সদৃশ উত্তাপরাশি সংমিশ্রিত বায়ুবেগে চতুর্দ্দিক উত্তপ্ত হইতেছে, বৃক্ষলতাদির পত্রাদিও কিঞ্চিন্মাত্র সঞ্চালিত হইতেছে না, শাখারূঢ় পক্ষীগণ নয়ন মুদিয়া নিস্তব্ধভাবে কালক্ষেপ করিতেছে. ক্ষেত্রস্থ পশুগণ চারণস্থানে সমাসীন হইয়াও নির্জ্জীব-ভাবে বৃক্ষতলে শ্রান্তি দূর করিতেছে, পথ ঘাট লোক-শূন্য, মধ্যে মধ্যে দুই-এক জন পথিককে যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারা যেন মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে, পরিণামে যে কি ঘটিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তাহীন! গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্ভাগের যে দিকে দৃষ্টিপাত হয়,—সমস্ত যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ নয়ন-পথে প্রতীয়মান হইতেছে, প্রদীপ্ত তপন-তাপে ধরাতল তাপিত, স্নিগ্ধভাব এককালে বিদূরিত হইয়াছে; তরুলতাদিতে কুসুমদাম উত্তাপে নতশির হইয়া মলিন-ভাবে অবস্থিত, প্রকৃতিরাণীও গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে বেশ-ভূষায় বিসর্জ্জন দিয়া আলু থালু বেশে দিবাভাগের দুঃখময় সময় অতিবাহন করিতেছে, বহুল লোকপূর্ণ জনপদ লোকে পূর্ণ থাকিয়াও যেন নির্জ্জন ভাবাপন্ন,

শিশু বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিদাঘের উৎপীড়নে সম্যক্ প্রপীড়িত, গৃহের বাহিরে ক্ষণকাল ক্ষেপণ করে—কাহার সাধ্য? সকলেই কি প্রকারে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে শান্তি দান করিবে, তাহারই উপায় প্রতিবিধানে সযত্ন। কেবল-মাত্র পরান্নভোজী ভৃত্যবর্গের এরূপ সময়েও অ াহতি নাই, তাহারা প্রভুর আদেশমত কার্য্য সাধনে সংযত, নতুবা গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলন হয় না।

লোকে যে স্বেচ্ছায় অপরের নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া থাকে, একমাত্র ভরণ-পোষণ ব্যয়ভার নির্ব্বাহই তাহার মুখ্যকারণ। সংসারে থাকিতে হইলে সমাজের প্রতি সদা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। যাহাতে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে অনুক্ষণ চেষ্টিত থাকা কর্ত্তব্য; নতুবা লোকাপবাদে সর্ব্ব সমক্ষে মুখ দেখান ভার, ক্ষণকাল যাপন করা দুরূহ হইয়া উঠে; এই সকল কারণেই আমাদিগকে পরপদ-সেবায় স্বীকৃত হইতে হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষ শ্বেতদ্বীপবাসীর করগত; ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-কার্য্য সমুদায়ই তাঁহা-দিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে,হংস যেরূপ জল-মিশ্রিত দুগ্ধের পুষ্টিকর ভাগ গ্রহণ করে, সেইরূপ তাহারা সার অংশ আত্মসাৎ করিয়া অসার যাহা কিছু আমাদিগের জন্য বিধান করিতেছেন, আমরাও তাহাই পরমবস্তু জ্ঞানে গ্রহণ করিতেছি; প্রতীতি—সংসারে পরিশ্রম করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, শ্রম করিয়া দিনাতিপাত হইল, ইহাপেক্ষা আর গৌরবের সামগ্রী কি আছে ?

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যৎসামান্ত মাসিক বৃত্তি-লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে রাজপুরুষবর্গের পরিতোষ সাধন করিতেছি। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী যেরূপ যদৃচ্ছাক্রমে আহার বিহারে বঞ্চিত, পালকের অভিলাষানুযায়িক খাদ্যসামগ্রী তাহার নির্দ্দিষ্ট; সেইরূপ আমরাও বন্ধনমণ্ডলে আবদ্ধ—সীমা অতিক্রম করিয়া যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, সে অধিকার আমাদিগের আদৌ নাই।

এক্ষণে বিজাতিদিগের অধিকারে সমগ্র ভারতবর্ষ নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, রাজপুরুষগণের স্বেচ্ছামত কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা শাসনবিষয়ে জাতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করিতেছেন, স্বদেশবাসীদিগের হিতকামনায় সমস্ত কার্য্য রাজভাষায় সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞান না থাকিলে আর নিস্তার নাই। রাজভাষা শিক্ষার পারদর্শিতানুসারে উপাধি লাভ হইয়া থাকে; অধুনা সমাজে মান-সম্ভ্রম, গৌরবাদি সমস্তই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির প্রতি একমাত্র নির্ভর করিয়া থাকে। কার্য্যস্থলে কর্ম্মপ্রার্থীগণের উপাধির আবশ্যক। দুই ছত্র ইংরাজী বিশুদ্ধভাবে লিখিতে অক্ষম হইয়াও স্মরণ-শক্তির প্রভাবে যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-রত্ন লাভে কৃতী হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ! ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহারই প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর করিয়া থাকেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষায় এই উপাধি লাভ

হয়, একবিষয়ে পারদর্শী হইয়া অন্য বিষয়ে অজ্ঞতা জন্মিলে—কোন ফল নাই। পুরাকালে যে ব্যক্তির যে বিষয়ে সম্যক্ আসক্তি থাকিত, তিনি সেই বিষয় বিশেষের আন্দোলনে জীবন অতিবাহিত করিতেন, তথাপি কদাচ তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এক্ষণে লোকদিগের আর সেরূপ ভাব লক্ষিত হয় না; অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঔষধ সেবনবৎ বিবিধ শাস্ত্রে এককালে মনঃসংযোগ করিয়া একটীরও উৎকর্ষ সাধিত হয় না। পুরাকালে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রপাঠে মনঃসংযত থাকিতেন। তখন ক্ষত্রিয়বর্গ ভূস্বামী; তাঁহারা বাহুবলে শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও ব্রাহ্মণবর্গের সমধিক সম্মান করিতেন, রাজস্বের নির্দ্ধারিত অংশ সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণার্থ প্রদত্ত হইত। তৎকালে লোকে স্ব স্ব জাতীয় মর্য্যাদানুসারে ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত; তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিত, ধীবরের মৎস্য ধরিয়া দিনাতিপাত হইত; বৈশ্যসম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যেই ক্ষেপণ করিত, এক্ষণে আর এ ভারতে সে ভাব লক্ষিত হয় না! যে কুম্ভকার চিরকাল মৃত্তিকা-গঠন-কার্য্যে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত, যে রজক লোকের দ্বারে দ্বারে মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার উদ্দেশে ফিরিয়া বেড়াইত; অধুনা তাহাদিগের সন্তান বিদ্যালোকে হৃদয়-ক্ষেত্র আলোকিত করিয়া, সমাজে গণ্য মান্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সমাজের এই শোচনীয় অবনতি!

হিন্দুমণি ব্রাহ্মণ-সন্তান সামান্য ভিক্ষুকভাবে গৃহস্থের

দ্বারদেশে মধ্যাহ্নকালে তপনতাপে দণ্ডায়মান। ধরাতল উত্তাপিত, গৃহের বাহিরে ক্ষণকাল ক্ষেপণ দুঃসাধ্য, বৃক্ষ-সমূহের পত্রাদি নিশ্চলভাবে অবস্থিত, বায়ু সঞ্চালন এককালে লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সময়ে সময়ে অগ্নিশিখা সদৃশ উষ্ণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া পথিক-বর্গের প্রাণ-সংহারে উদ্যত হইতেছে; ভূচর খেচর সকলেই যেন স্ফূর্ত্তিহীন, শান্তিলাভে সকলেই যেন ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছে; লোকপূর্ণ মহানগরী এক্ষণে যেন লোকশূন্য, লোকজনের বাদ-বিসম্বাদজনিত গোলযোগাদি এককালে যেন স্থগিত হইয়া গিয়াছে, সকলেই যেন জীবনসত্ত্বেও অসাড়; ধরাতল নীরব, নিস্পন্দ; কালবিশেষে প্রকৃতিরাণী দিবাভাগে দিনমণি দরশনে যে অপূর্ব্বরূপে ভূষিতা থাকিত, আজি সে ভাব সত্ত্বেও সেরূপ বিকাশ নাই। সুশীতল বায়ুসেবনে সকলেই লোলুপ, ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণার উদ্রেক, একমাত্র শীতলবারি সেবন করিয়া সেই ক্লেশের কথঞ্চিৎ লাঘব হইতেছে। এদিকে সূর্য্যকিরণে লোক পথের বাহির হইতেছে না, নানাবিধ উপায়ে শান্তিলাভ আশয়ে সমুৎসুক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দরিদ্রদিগের সাবকাশ নাই, তাহারা প্রাণপণে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ব্রাহ্মণ এই নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদাঘকালে এই-রূপ সময়ে এক গৃহস্থের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! গৃহস্বামী অথবা অন্য কোন অভিভাবক তথায় উপস্থিত না থাকায়, আগন্তুক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা

করিতেছিলেন; এমত সময়ে একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা তথায় উপস্থিতা হইল। কুমারীকে দেখিতে পরম রূপবতী; কিন্তু নেত্র-যুগল সৌদামিনী সদৃশ চঞ্চল; ক্ষণকাল একভাবে থাকিতে অক্ষম। বালিকা—সাতিশয় চঞ্চলা। ব্রাহ্মণের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, গৃহস্থের নিকটে পিপাসায় জলপানে বঞ্চিত হইবেন না জানিয়াই আজি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। কুমারী ব্রাহ্মণের হৃদয়গত ভাব কিছুমাত্র না বুঝিয়া রুষ্টভাবে তাঁহার প্রতি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?

ব্রাহ্মণ। "তৃষ্ণায় জলপান করিবার জন্য।"

বালিকা। "এখন বাটীর সকলেই নিদ্রিত, তোমাকে আবার কে জল আনিয়া দিবে? স্থানান্তরে যাও।

ব্রাহ্মণ বালিকা প্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া আদৌ বাক্যব্যয় না করিয়া ম্লানবদনে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন, কোথায় যাইলেন—তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না; কিন্তু প্রতিগমনকালে পশ্চাদ্ভাগে অবলোকনানন্তর পুনঃপুনঃ সেই বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কি যেন দুই চারিটী কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। কি বলিলেন, জানিতে পারা যায় নাই; কিন্তু অনুমানে সিদ্ধান্ত হইল, ব্রাহ্মণ যেন কুমারীর প্রতি বিরক্ত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে স্থানান্তরিত হইলেন; যেহেতু পরিণামে যাহা সংঘটিত হইল, তাহা ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই অনুমিত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত কোদালে গ্রাম, বহুকালাবধি এই স্থানে ছত্রীদিগের বসতি; আচার ব্যবহারে ইঁহাদিগের সহিত বাঙ্গালী জাতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সমগ্র ভারতবর্ষ হিন্দুজাতির নিবাসভূমি; একদিকে হিমালয় হইতে কুমারিকা, অপর দিকে সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্য্যন্ত এককালে হিন্দু রাজার আয়ত্তাধীন ছিল, এই কারণেই সমস্ত ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান নামে বিখ্যাত। মারহাট্টা, রাজপুত, শিখ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীভুক্ত লোকের ভারতবর্ষে বাসস্থান। দেশাচার ও প্রথার বিভিন্নতা অনুসারে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্মিলন রহিত হইয়াছে; নতুবা এক মাতার সন্তান হইয়া এরূপ ভিন্ন ভাবের সংঘটন কিরূপে হইতে পারে? তথাপি সকলেই হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে এবং পরস্পর এই সমস্ত জাতিমধ্যে কোন না কোন অংশে রীতিনীতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পুরাকালাবধি ভারতবর্ষের কীর্ত্তি-কলাপ জগতের স্থানে স্থানে ঘোষিত হইতেছে। ভারত-বর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্যলাভের আশয়ে বিদেশীগণ বারে বারে আক্রমণ করিয়াছেন এবং সেই বিজাতিদিগের ভীষণ অত্যাচার-স্রোতে ভারতবর্ষের কীর্ত্তিকলাপ বারে বারে ধৌত হইয়া গিয়াছে। আর্য্যকীর্ত্তি এককালে লুপ্ত-প্রায়, পৌরাণিক ইতিবৃত্তাদি পাঠ করিলে, হিন্দুস্থানে

হিন্দুদিগের পূর্ব্বগৌরব স্মৃতি-পথে উদয় হইতে থাকে; কিন্তু আজ ভারতবর্ষ যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে সে সমস্ত ঘটনাবলী কেবলমাত্র আখ্যায়িকা-স্বরূপ প্রতীয়মান হইতে থাকে; যেহেতু যে জাতি পূর্ব্বে অতুল বিক্রম সহকারে স্বদেশ অতিক্রম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, যাহাদিগের রীতি-নীতি অদ্যাবধি বিজাতিগণ সাদরে, সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকে, অনেকস্থলে যাঁহাদিগের আচারপদ্ধতি এখনও আদর্শ-স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, অধুনা সেই হিন্দুজাতির কিরূপ শোচনীয় অবস্থা উপনীত হইয়াছে, বারেকমাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলেও হৃদয় বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়। ভারতের হিন্দুসন্তানগণ পুনরায় যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে—ক্ষণেকের নিমিত্তও সে কল্পনা চিন্তা-পথে উদিত হয় না। যে দেশ এককালে বিশেষ গৌরব ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছে, উত্তরোত্তর তাহার অদৃষ্টে অধঃপতন সংঘটিত হইলে—পূর্ব্বো-পার্জ্জিত যশোরাশি লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

ভারতবর্ষ সকল সুখে বঞ্চিত হইলেও, ভারত-ললনা হিন্দুজাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী। এই অমূল্য রত্নে বিভূষিতা হইয়া অনাথিনী, দুর্দ্দশাপন্না ভারতভূমি কাঙ্গালিনী হইয়াও রাজারাণী—সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী স্বরূপিণী। হিন্দুকামিনী আর্ম্মেণিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্যপ্রধান দেশের রমণীমণ্ডলী অপেক্ষাও সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে

যে অমূল্য ভূষণে ভূষিতা হইয়া আসিতেছেন, সে অলঙ্কার জগতের যাবতীয় মণি-মাণিক্যাপেক্ষা বহুমূল্য; তন্নিমিত্তই এখনও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি পতিব্রতা কামিনীগণের আখ্যায়িকা ঘরে ঘরে প্রতিদিন কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর করুন, পুরাকালাবধি যে হিন্দু-নারীগণ সতীত্বধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল, যাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র আদর্শ গ্রহণ করিয়া সুদূরবর্ত্তী দেশসমূহ সভ্যতার উন্নত পথে অগ্রসর হইয়াছে, চিরকাল "সতীত্বে—অতুলনা হিন্দুললনা" এই খ্যাতি বিশ্ব ব্যাপিয়া ঘোষিত হউক, এ সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন যেন বিন্দুমাত্র শিথিল না হয়। এক্ষণে বয়োবৃদ্ধা জননী, সমবয়স্কা ভগ্নী ও কোমলমতি বালিকাদিগের নিকট করযোড়ে এই-মাত্র প্রার্থনা, তাঁহারা যেন সর্ব্বক্ষণ হিন্দু আচার-ব্যবহারের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখেন। অধীন ভারতে গৌরবের সামগ্রী আর কিছুই নাই, একমাত্র ভারত-ললনা, ভারতের অমূল্য রত্ন। জননী এই অমূল্য মণি বক্ষে ধারণ করিয়াই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা! সুখ-দুঃখ; সম্পদ-বিপদ, সকল অবস্থাতেই হিন্দুরমণীগণের এই স্বর্গীয় রত্নের প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে। পতিব্রতা সতী অনাহারে তনুত্যাগ করিবে, তথাপি জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষণে প্রাণপণে পরাঙ্মুখ হইবে না। স্বামীর চরণসেবায় সংযুক্তা থাকিয়া দিনান্তে একবারমাত্র শাকান্ন ভোজন করিয়া দিন যাপন করিবে, শতগ্রন্থি মলিন বাসে লজ্জা নিবারণ করিবে, তথাচ কুপথগামিনী হইবে না। স্বামী অক্ষম বা অকৃতি হউন,

তাহাতে তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বিকারের সঞ্চার হয় না, তিনি মনে মনে তাঁহাকেই দেবোপম জ্ঞান করিয়া, তাঁহারই চিত্তবিনোদনে অনুরক্তা থাকেন এবং নিজের সেই কার্য্যই জগতের প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির জানিয়াছেন। সতী-স্ত্রীর হৃদয়ে সকল অবস্থাতেই পূর্ণানন্দ বিরাজমান, বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া তিনি যে পতির প্রতি প্রীতচিত্তে শুদ্ধভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই ভাবেই আজীবন দেখিবেন এবং যতদিন না তাঁহার দেহ চিতানলে ভস্ম হইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবেই দেখিবেন, কদাচ তাহার বিভিন্নতা হইবে না, মনে মনে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

গ্রামে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রভৃতি নানাবিধ লোকের বসতি। কোদালে-গ্রাম অন্যান্য গ্রামাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাতে বিবিধ প্রকার অবস্থার লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বা দাস-দাসী-পরিবৃত সুচারু অট্টালিকায় সুখে কালাতিপাত করিতেছে, আবার হয় ত কোথাও দৈনন্দিন পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থে দুঃখে কষ্টে কাহারও দিনাতিপাত হইতেছে, কেহ কেহ বা পর্ণকুটীরে বাস করিয়া এক সন্ধ্যামাত্র আহার করিয়া যোগে যাগে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! লোকের অবস্থা আবার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, হস্তস্থিত পাশা যেরূপ নিক্ষেপ করিলেই প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দান পড়িয়া থাকে, এক ভাবে দুই বা ততোধিক বার পড়ে না, সেইরূপ লোকের অদৃষ্টে শুভাশুভ দণ্ডে দণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন :

একের উন্নতি, অপরের অবনতি—সংসার-সমুদ্রে অহোরাত্র এই ভাবে স্রোত বহিতেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী যে কখন কাহার প্রতি সদয়া, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই! আজি যে ব্যক্তি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত ক্ষণকালও ভাবিতে হইতেছে না; কার্য্যগতিকে হয়ত তাহাকেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতে হইবে; পুনশ্চ ওই যে জীর্ণশীর্ণকায় ভিক্ষুক এক মুষ্টি তণ্ডুলের নিমিত্ত কাতরোক্তি প্রয়োগ করিতেছে, সময়ে তাহার এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি জনৈক ধনশালী পুরুষের ন্যায় সুখে দিনাতিপাত করিবে!

কোদালেগ্রামে বক্কেশ্বর মিত্র নামক জনৈক গৃহীর বসতি; এই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন, ধন হইলেই সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়া থাকে; বসতবাটী, উদ্যান প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের অর্থের পরিচয়। বক্কেশ্বর সদ্বংশজাত হইয়াও সময়ে লেখাপড়ায় তাদৃশ যত্ন করেন নাই; অধিকাংশই ধনশালী লোকদিগের সন্তানবর্গ যেরূপ অল্প বয়সে বিলাসভোগী হইয়া পড়ে, পরিণামে যে দুঃখের দিন সমুদিত হইতে পারে—বারেকমাত্রও তাহা চিন্তা করে না, আমোদ-প্রমোদই একমাত্র জীবনের সার জানিয়া—তল্লাভেই সংযত থাকে, আমাদিগের বক্কেশ্বরের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি পৈতৃক বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও নিজের অবিবেচনাবশতঃ সমস্ত অর্থে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

জগতে এক প্রকার জীব আছে, তাহারা ধনশালী পুরুষবর্গের মনস্তুষ্টি কার্য্যে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকে। প্রভুর প্রীতিজনক কার্য্য করিতে তাহাদের হিতাহিত বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য থাকে না। তাহারা যে ব্যক্তির চাটু-কারিতায় অনুরাগী হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে, ন্যায়-অন্যায়-বিবেচনা-শূন্য হইয়া কখন শ্বেতকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে শ্বেত বলিয়া বর্ণনা করে! আমাদিগের বক্কেশ্বরের অল্প বয়সেই এইরূপ কয়েকজন সহচর জুটিয়াছিল; তাহারা যে স্বার্থের উদ্দেশে এইরূপ করিয়া থাকে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই। পিতার এক-মাত্র পুত্র বক্কেশ্বর অল্প বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং উক্ত সহচরদিগের পরামর্শানুসারে নানাবিধ মাদক দ্রব্যাদি সেবনে আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃতিচক্র সকলকে সমভাবে ক্ষেপণ করিতে দেয় না, জগদীশ্বর যে নিয়তিচক্র মনুষ্যের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সাধ্য কোথায়? যথাসময়ে তাঁহার পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনবর্গ পরলোকগত হইলে, তিনি সংসারের কর্ত্তা হইলেন। পিতা মাতা সামাজিক নিয়মানুসারে সন্তানের বিবাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ আমাদিগের গুরুজনবর্গের দ্বারা এ কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য বক্কেশ্বরের পরিণয়-কার্য্য পূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি এক তনয়া-রত্ন লাভ করিয়াছেন; তাহার নাম রাধামতি। মধ্যাহ্ন-

কালে যে বালিকা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়াও অভ্যাগত ব্রাহ্মণের অতিথি সৎকারে বিমুখ হইয়াছিল, সেই কুমারীই বঙ্কেশ্বর বাবুর দুহিতা।

যখন মানুষের অবস্থার অবনতি হইতে থাকে, সে সময়ে কোন বাধাই মানে না; বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় অবিরত স্রোতে অধোগতি-সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে! যে বঙ্কেশ্বর স্নেহময়ী জননীর একমাত্র নয়ন-পুত্তলি, পিতার অদ্বিতীয় বংশধর, সহচর-বর্গের বিরাম-স্থান; দেখিতে দেখিতে কু-সংসর্গে পতিত হইয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য পাত্র-স্থিত কর্পূর সদৃশ অচিরাৎ নষ্ট হইল। তিনি মাদক সেবনাদি গর্হিত কার্য্যে সংযুক্ত হইবার অনধিক বিলম্বেই জনকজননী রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, যথাসময়ে উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইলে—যাহাদিগের লক্ষ্মী, তাঁহাদিগেরই সঙ্গে চলিয়া গেল; দুর্ভাগা বঙ্কেশ্বর দিনে দিনে ঋণ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। বিষয় আশয় সমস্তই নির্বুদ্ধিতা বশতঃ চাটুকার ও প্রতারকগণ বন্টন করিয়া লইল। এক্ষণে পূর্ব্বের মত তাঁহার সেরূপ বিষয়সম্পত্তি কিছুই নাই।

কিন্তু বঙ্কেশ্বরের এখনও চৈতন্য হয় নাই, মদিরা সেবনে ও অন্যান্য গর্হিত কার্য্যে এখনও তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। লোক আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইলে, তাহার বিষয়াদি কিছুরই প্রতি দৃষ্টি থাকে না; অনিত্য অসার আমোদে উন্মত্ত হইয়া সংসারের প্রিয় পরিজনবর্গের প্রতি যত্ন কমিয়া যায়,

অনুক্ষণ অভিপ্রেত বস্তু লাভের আশয়ে নিযুক্ত থাকে। সংসারের কার্য্য যে কি ভাবে চলিতেছে, পরিবারবর্গের কোন বিষয়ে অভাব আছে কি না, বক্কেশ্বরের সে সমস্ত বিষয়ে এককালে দৃষ্টি নাই; তিনি একমাত্র সুরা ও বেশ্যাকে জগতের সার জানিয়া, তাহাদেরই আরাধনায় উন্মত্ত! লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলে নানাবিধ বিঘ্নের সূত্রপাত হইয়া থাকে. বক্কেশ্বর পিতৃ মাতৃহীন হইয়া দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক আত্মীয়ের কার্য্যনিবন্ধন তিনি কোন মহাজনের নিকট জামিন-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় ও তহবিল তছরুপ অপরাধে সেই ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায়. তাঁহাকে তাহার কারণ প্রায় চারি পাঁচ সহস্র মুদ্রা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিষয় আশয়ের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে দুঃখের দশায় এরূপ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাহার আর দুঃখের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্বেই বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত এক প্রকার শেষ হইয়াছিল, এক্ষণে অকস্মাৎ দেনায় আবদ্ধ হইয়া ভদ্রাসনবাটী খানিও হস্তান্তর হই-বার উদ্যোগ হইল! অভাগা বক্কেশ্বর বাল্যকালে পিতা-মাতার আনন্দের সামগ্রী ছিলেন, তজ্জন্য লেখা-পড়ায় যত্ন করেন নাই; এরূপ অবস্থায় পৈতৃক ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হওয়ায় গ্রাসাচ্ছাদনের কারণ ভাবিত হইবার তাঁহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতাদোষে সমস্ত বিষয় আশয়ে বঞ্চিত হইয়া, এক্ষণে দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। এরূপ লেখা-পড়া

শিখেন নাই যে, কোন কাজ কর্ম্ম জুটাইয়া লইয়া পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিবেন, তাহাতে অবিবাহিতা কন্যা; দুই এক বৎসর পরেই তাহার বিবাহকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের গৃহে কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বক্রেশ্বরের বর্ত্তমান যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহই একপ্রকার দুরূহ কার্য্য; কিরূপে এই গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন—মনে মনে আন্দোলন করিয়া দিনে দিনে তিনি সাতিশয় চিন্তিত হইলেন।

যাহার পয়সা নাই, দিবারাত্রি তাহার দুঃখেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, বক্রেশ্বর বাবু এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াও মদিরা সেবনে ও বেশ্যাসঙ্গমে যে এরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ-ব্যয় অভাবে, যতদূর না তিনি কাতর হইতেন, ততোধিক পরিমাণে মদিরা সেবনে তাঁহার আসক্তি বলবতী ছিল। সংসারের দাসদাসী বহুদিবসাবধি কাজে নিযুক্ত ছিল, ক্রমে ক্রমে বেতনাদি না পাইয়া সকলেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র স্নেহ-মমতাময়ী এক জন বৃদ্ধা বিনাবেতনে গৃহকার্য্য করিতে স্বীকৃতা হওয়ায়, বক্রেশ্বরের বাটীতে এখনও কার্য্য করিতে ছিল। যে সকল চাটুকারেরা তাঁহার উন্নত অবস্থায় চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিত, বর্ত্তমান অবস্থায়

কেহ আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিত না; এমন কি, পথে যাইতে যাইতে কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলে,অন্য পথদিয়া যাইবার চেষ্টা করিত; পথ ঘাটে ঘটনাক্রমে কদাচ দেখা সাক্ষাৎ হইলে, বক্কেশ্বরের কথায় দুই একটী-মাত্র উত্তরপ্রদান করিয়া স্থানান্তরিত হইত। মধুকর যেরূপ মধুলোভে প্রস্ফুটিত কুসুমের মধু অন্বেষণে, তাহার চতুস্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং স্বকার্য্য সিদ্ধ হইলে শুষ্ক কুসুমের প্রতি আর ফিরিয়া দেখে না; বক্কেশ্বরের বন্ধুবর্গও এক্ষণে তাঁহাকে নিঃস্ব জানিয়া তাঁহার সহিত আর দেখা সাক্ষাৎও করিত না। বিলাস-ভোগে, আমোদ প্রমোদে বক্কেশ্বরের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, যৌবনেও তাঁহার বিষয়ের কিছুমাত্র অভাব ছিল না; আপনার দোষেই সমস্ত নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের কারণ যে তাঁহার এরূপ কষ্ট হইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। একে তিনি ধনাঢ্যের সন্তান, বিষয়-কর্ম্ম নিজ হস্তে কখন গ্রহণ করেন নাই; এক্ষণে পরের নিকট গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নির্ব্বাহ কারণ দাস হইবেন, সে কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ তাঁহার বিষয়-কার্য্যে আদৌ ব্যুৎপত্তি ছিল না। এক দিবস কার্য্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপনীত হইলেন এবং গৃহস্বামীর কথামত কার্য্যে সম্মত হইয়াও কার্য্যকালে অপারগ হওয়ায়, তথা হইতে কর্ম্মচ্যুত হইলেন। অবশেষে দাসত্ব-জীবনে ধিকার দিয়া মলিন

বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার গৃহিণী—পতিপ্রাণা; স্বামীর বাহ্যিক মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে বিষণ্ণা হইলেন, প্রকাশ করিলে পাছে পতির মনোবেদনার সঞ্চার হয়—ভাবিয়া কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না।

জগদীশ্বর যাবতীয় জীবের আহার যোগাইতেছেন, তাঁহার প্রেমময় রাজ্যে অনাহারে কাহারও দিন অতিবাহিত হয় না। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেরই তিনি আহারদাতা। মনুষ্য জীবের শ্রেষ্ঠ, সংসারে যে অনেক মনুষ্য অনাহারে দিনাতিপাত করিবে, ইহাপেক্ষা বিচিত্র আর কি আছে? বক্রেশ্বরের সহধর্ম্মিণী স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় যথাযথ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, অপেক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে স্বামীকে সমাগত দেখিয়া সচঞ্চল-ভাবে তাঁহার স্নানাদির উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন। বক্রেশ্বর অনলপ্রকৃতি—মাদকের দাস্; বিষয়-সম্পত্তি সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াও অভ্যাস জনিত পীড়া এক্ষণে তাঁহাকে ব্যাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে গৃহে টাকা-কড়ির অনাটন বশতঃ দুই সন্ধ্যা আহার সংগ্রহ ভার হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসংসর্গ বশত. তিনি যে কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে মৃত্যুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত কালে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থকে, সেই প্রবাহ-স্রোতে দেহ ভাসাইয়া যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করে, পরিণামে তাহাকে

দুঃখে কালাতিপাত করিতে হয়। আমাদের বক্রেশ্বরের এক্ষণে সেই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে!

যৌবন কালে নানাবিধ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে থাকে, যে ব্যক্তি সেই জীবন সঙ্কট তরুণ বয়সে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত বুঝিয়া কার্য্য করিতে কৃতী হইতে পারেন, তাহার চিরকাল সমভাবে যাপিত হয়! অভাগা বক্রেশ্বর যৌবনে বন্ধুজন-পরিবৃত হইয়া সুরাদেবীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; প্রচুর অর্থের সমাগম বশতঃ কোন অভাবই অনুভব করিতে হয় নাই; এক্ষণে তাহার আর সে দিন নাই! পয়সার অনাটন বশতঃ সুরাপান ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া পরিমিত ব্যয় সাপেক্ষ নেশা—গঞ্জিকা সেবন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেও দৈনিক এক আনার প্রয়োজন। পরিবারবর্গ অনাহারে দিনযাপন করিতেছে, নিজেরও আহার জুটিতেছে না; তথাপি তাহাকে সেই মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে হইবে। তখনও তাহার চৈতন্য হয় নাই, গৃহে আসিবা সংসারের ভাবনাচিন্তা দূরে গেল; বক্রেশ্বর গঞ্জিকার কলিকা লইয়া ধূমপানে নিয়োজিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করে না, যথানিয়মে আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, এই রজনী প্রভাত হইল, দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনে দিনমণি উজ্জ্বল কিরণ-মালায় ভূষিত হইলেন, সংসারী সংসার কার্য্যে নিয়োজিত হইল। যথাসময়ে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন। রবি নিজ ছবি আকাশপথে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে লইয়া যাইয়া, অস্তাচলে ছবি সহ বিলীন হইলেন। দিবার আলোকরাশি তপন সহ তিরোভাব হইল। অন্ধকারে অর্দ্ধজগৎ তিমিরাবৃত করিল। পশু, পক্ষী, জীব জন্তু দিবাভাগে যথাযথ বিচরণ করিয়া রাত্রির সুদীর্ঘকাল নিরাপদে যাপন উদ্দেশে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল, কেবলমাত্র এক্ষণে নিশাচরগণ অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া সানন্দচিত্তে স্ব স্ব আহার অন্বেষণে বহির্গত হইল! একভাবে বহুক্ষণ থাকে না, যথানিয়মে রজনী প্রভাত হইল, পুনরায় নিয়মানুসারে কার্য্য চলিতে লাগিল। মনুষ্যজীবনে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কালচক্রে যথাসময়ে সকল কার্য্যই সাধিত হইতেছে। মুহূর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে প্রহর, প্রহর হইতে দিবা যেরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসারে মনুষ্য-জীবনে তিনটী বিচিত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। শিশুকাল আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত

হইতে না হইতে যৌবনের সমাগম, এই সময়েই লোকে সাধের সংসার পাতিয়া দিনাতিপাতের উপায় অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংসারী, তাহাকে ভীষণ যৌবনপথে সদত অতি সাবধানে, প্রতিকার্য্যে লক্ষ রাখিয়া, অগ্রসর হইতে হয়। তৎপরে, পরিণামে বার্দ্ধক্য; তৎকালে শৈশবের ঘটনাবলী পুনরায় বিপরীত পর্য্যায়ে সংঘটিত হইতে থাকে। এইমাত্র যে ব্যক্তি প্রবল প্রতাপে অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, কিছু দিবস পরেই আর তাহার সে ভাব নাই; ভিন্নভাবে সে ব্যক্তি কার্য্যে সংযত, যৌবনে যেরূপ মনোবৃত্তির প্রবলতা লক্ষিত হয়, অন্যান্য সময়ে কদাচ সেরূপ দৃষ্ট হয় না। আমাদিগের কার্য্যাকার্য্য যাহা কিছু সমুদায়ই যৌবনের হস্তে নির্ভর করিতেছে; যেহেতু বাল্যকালে বুদ্ধিশক্তির সঞ্চার হয় না এবং বৃদ্ধকালে তৎসমুদায় হীনবল হইয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে যজ্ঞেশ্বর যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, এ সময়ে তাঁহার কাজকের্ম্মের প্রতি অনুরাগ দিনে দিনে হ্রাস হইতে লাগিল; যাইবার দিন সন্নিকট ভাবিয়া বিষয় ভোগ-লালসা ক্রমে ক্রমে তাঁহার চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

এক্ষণে হিন্দুসমাজে কন্যার বিবাহ দায় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাপেক্ষাও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার কন্যার বিবাহ-জন্য চিন্তা নাই; নতুবা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতেই জনক জননীকে

উৎকণ্ঠিত ভাবে কালযাপন করিতে হয়। তাহাতে কঠোর দেশাচার, দশম বর্ষ অতীত হইলে, কুমারী অবিবাহিতা থাকিলে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। বক্কেশ্বরের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ন্যূনাধিক সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ না করিয়া কন্যার কিরূপে বিবাহ-উৎসব সমাধা করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার কারণ। দেখিতে দেখিতে রাধামতিও বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিল। কন্যাকে আর গৃহে রাখা সমাজে ভাল দেখায় না ভাবিয়া, স্ত্রী-পুরুষে ক্ষুণ্ণচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনাথের দৈবসখা, লোকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার যতই কেন চেষ্টা করুন না, জগদীশ্বরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি তাহার প্রতি না পড়িলে—আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় নাই! ঈশ্বর সুখ-দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই জীবকে দুঃখে পতিত করিতেছেন, পুনরায় তাঁহারই কৃপায় লোকে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। বক্কেশ্বর বিষণ্ণ বদনে দিবানিশি কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অবশেষে দুই চারিজন আত্মীয়-স্বজনের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা কিছুই সুবিধা বুঝিলেন না; অধিকন্তু তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতাজন্য ভর্ৎসনা বাক্য লাভ হইল; অনন্তর কি করিবেন, কাহাকে জ্ঞাপন করিলে এ কার্য্যে তাঁহার উপকার হইতে পারে, এইরূপ চিন্তায় এককালে

হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; তাঁহার জনৈক প্রতিবেশী সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং পাত্র নির্দ্দেশার্থ তাঁহাকে অনুমতি করিলেন। বক্কেশ্বর প্রতিবেশীর এরূপ উদারপ্রকৃতি জ্ঞাত হইয়া, মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাত্রান্বেষণে তৎপর হইলেন; লোকের দুরবস্থায় প্রকৃত বিষয়েও কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করে না। পূর্ব্বে যে সকল লোক তাঁহার আদেশ মাত্র কার্য্যে অগ্রসর হইত, এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। বহুদিবস জনৈক কুলাচার্য্যের নিকট যাতায়াত করায় অবশেষে সে ব্যক্তি পাত্র অন্বেষণে স্বীকৃত হইল। দুই এক মাস অনুসন্ধানের পর খলসিনী গ্রামের প্রসিদ্ধ বসু পরিবার বংশীয় চন্দ্রনাথ বাবুর কনিষ্ঠপুত্র ফণীন্দ্রনাথ নামক যুবকের সহিত সম্বন্ধ ধার্য্য হইল। হিন্দু প্রথানুসারে পাত্রের পিতা জনৈক বন্ধুকে লইয়া ঘটকের সহিত বক্কেশ্বরের কন্যা দেখিতে আসিলেন। বক্কেশ্বরের অবস্থা হীন হইলেও তিনি সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত, তাহাতে কন্যাভারগ্রস্ত; তিনি যথা-যথ সমাগত ভদ্রলোকদ্বয়ের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। অবশেষে রাধামতিকে তাঁহাদিগের সম্মুখে আনা হইল। রাধামতি পরম রূপবতী, দেখিলেই চক্ষু আকৃষ্ট হইতে থাকে। বর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়, মুখমণ্ডল সানন্দ, কিন্তু নাসিকা ও নয়নযুগলে তাদৃশ পারপাট্য

নাই ; তথাপি অঙ্গ সৌষ্ঠব মন্দ নহে। একে গৌর-কান্তি হৃদয়গ্রাহী, তাহাতে সুগোলাকৃতি গঠন দর্শনে পাত্রের পিতা রাধামতিকেই পুত্রবধূ করিবেন, মনস্থ করিলেন। অবশেষে কন্যাকে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদানানন্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া বহির্ব্বাটী হইতে অন্দর মহলে লইয়া যাইবার কথা বলা হইল ; যে সময় রাধামতি দাঁড়াইয়া উঠিল, তৎকালে যেন চন্দ্রনাথের মনে অকস্মাৎ কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইল ! তিনি মনে মনে অগ্রেই কন্যা দেখিয়া মনোনীত করিয়াছেন, এক্ষণে পূর্ব্ব-ভাবের কথঞ্চিৎ ভিন্নরূপ লক্ষ্য করিয়াও তাঁহার মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না। কেবলমাত্র তিনি একবার ভাবিলেন যে, বালিকা—চঞ্চলা : কিন্তু ক্ষণেকে সে ভাব তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর তথায় আর কিছুক্ষণ বন্ধুসহ অপেক্ষা ও জল-যোগাদি করিয়া বক্কেশ্বর সমীপে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বক্কেশ্বর তাঁহাদিগকে যথাযথ সম্ভাষণ পূর্ব্বক যাইতে অনু-মতি দিলেন। ফণীন্দ্রনাথের পিতা আগামী মাসের শুভ-লগ্নে শুভকার্য্য সম্পাদন করিবেন. ভাবিয়াছিলেন ; তজ্জন্য দুই চারি দিবসের মধ্যেই বক্কেশ্বরকে পাত্র দেখিয়া আসি-বার নিমিত্ত আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পুত্র-কন্যার যথাকালে বিবাহ দেওয়া হিন্দু পিতা-মাতা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগের বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইলে, জনক-জননীর পরিতাপের সীমা থাকে না।

এক্ষণে বক্কেশ্বর যে কন্যার কারণ এতাবৎকাল অস্থির-চিত্তে কালক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহার বিবাহ-কার্য্য অচিরে সুসম্পন্ন হইবে ভাবিয়া—মনে মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি এবং যে ব্যক্তি এই বিবাহের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহারা উভয়ে পাত্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা করিয়া সম্মান রক্ষা করিলেন। পরিশেষে ফণীন্দ্রনাথকে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপনীত করা হইল; ফণীন্দ্রনাথ মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিনাব্যয়ে হিন্দুস্কুলে পাঠাভ্যাস করিয়া গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে -প্রথম-বর্ষীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল। যদিও ফণীন্দ্রনাথের বাহিক রূপরাশি তাদৃশ ছিল না, দেখিতে কৃষ্ণাকৃতি; কিন্তু পুরুষের গুণ থাকিলেই তাহার সুখ্যাতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ফণীন্দ্রনাথ মিষ্টভাষী, শিষ্ট ও নম্রপ্রকৃতি; বক্কেশ্বর তাঁহাকে লেখা-পড়া সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়-পক্ষের আর মতামতের প্রভেদ রহিল না। উভয়েই এই শুভকার্য্য সম্পাদনে ব্যগ্র হইলেন, অনতিবিলম্বে বক্কেশ্বর বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, পাত্রদর্শনী স্বরূপ একটী সুবর্ণমুদ্রা ফণীন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ফণীন্দ্রনাথ, বক্কেশ্বর ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ভদ্রলোক,

উভয়কে নমস্কার করিয়া, তাঁহাদিগের আদেশমত তথা হইতে উঠিয়া আসিলেন। তদ্দণ্ডেই উপস্থিত ঘটকের সহিত যুক্তি করিয়া লগ্ন-পত্র লেখা হইল।

বক্কেশ্বরের সঙ্গী সেই বন্ধু পূর্ব্বেই বিবাহের সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে পাত্র দেখিয়া তাঁহার মনোনীত হওয়ায় বাটীতে যাইয়াই বক্কেশ্বরকে প্রয়োজনীয় অর্থের কথা জিজ্ঞাসা কবিলেন। পরিশেষে পল্লীস্থ দুই চারিজন বিজ্ঞ লোক মিলিয়া বিবাহ সংক্রান্ত উদ্‌যোগ কবিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, যথানিয়মে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাধামতি পিত্রালয় হইতে ভর্ত্তৃগৃহে নীতা হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফণীন্দ্রনাথ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি সুশীল যুবক, তাহার নিকট যে রাধামতির অনাদর হইবে—এরূপ কখনই আশা করা যাইতে পারে না। তাহাতে যুবক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে এবং বয়সোচিত প্রণয়-ভাব সে হৃদয়ে বিকাশ পাইয়াছে। আনন্দে ফুলবাসর অতিবাহিত হইল, রাধামতি পুনরায় পিতৃগৃহে আসিল। বিবাহের পরেই ফণীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছিল এবং রাধামতির পিত্রালয়ে আসিবার কালে একখানি বর্ণপরিচয় সুচারুরূপে বাঁধাই করাইয়া দিয়াছিল। বালিকা এতাবৎকাল চঞ্চল-ভাবেই কালক্ষেপ করিত, সংসারের কিছুই জানিত না, স্বামীদত্ত পুস্তিকাখানি পুতুলের বাক্সমধ্যে রাখিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম আকাশে লোহিতবর্ণ বিকাশ পাইতেছে। আতপ-তাপ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাব, তপনদেব অস্তাচলাভিমুখী, বৃক্ষলতাদির পত্র সমূহে স্থানে স্থানে রবির কিরণমালা খেলা করিতেছে। মধ্যাহ্নকালে যে প্রখর তাপে ধরাতল উষ্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে সুশীতল সমীরণ-হিল্লোল নব-প্রস্ফুটিত কুসুমদামের সুবাসরাশি বহন করিতেছে, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব গগনে বিকাশ থাকিতে থাকিতে লুপ্তপ্রায়, দিবাকর বিহনে দিবাবিভা মলিন ভাব ধারণ করিল। জগতের চক্ষু জীবে আলোক দান করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই রবি-ছবি-খানি অদৃশ্য। দিবা-সতী সুষমায় সজ্জিতা থাকিয়া আর কাহার চিত্তাকর্ষণ করিবে? নাথের বিরহ-জ্বালায় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দিবারাণী মুখখানি ক্রমে ক্রমে জগতের মধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। কাহারও উন্নতি, কাহারও অবনতি, জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাই এই। যে ব্যক্তি যখন উন্নতি-পথে অগ্রসর করিতেছেন, তৎকালে তাঁহার গতিরোধ করে—কাহার সাধ্য? কিন্তু কালক্রমে সে ব্যক্তির অদৃষ্টে দুঃখের দশা ঘটিলে, ক্ষণে ক্ষণে তাহার অবনতি হইতে থাকে। দিনমণি অস্তাচলাভিমুখে গমন করিয়াছেন, প্রকৃতি সুন্দরী আঁধার—মলিন বসনে

বপু আবৃতা করিলেন। তারকানিকর-পরিবৃত শশাঙ্ক গগনমণ্ডলে বিকসিত হইল; দিবাভাগের পরিশ্রম শেষ করিয়া গৃহীজন নিজ নিজ আবাসে উপস্থিত হইল। পশু-পক্ষীগণ ক্ষুধায় আহারান্বেষণে এতক্ষণ স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছিল, এক্ষণে তাহাদিগের উদর পূর্ণ হইয়াছে, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। যামিনী জীবের বিরাম-দায়িনী, শান্তিময়ী; সকলেই এই সময়ে কুশলে কালক্ষেপ করিয়া থাকে; শ্বাপদ জন্তুদিগের বিচরণের এই একমাত্র উপযুক্ত সময়। পেচক, শৃগাল, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভয়াল নিশাচরবর্গ এক্ষণে লোকের অত্যাচারভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে, সানন্দে যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছে; কেহ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার নাই; এইই তাহাদিগের শীকারান্বেষণের প্রকৃত সময়। আর কুপ্রবৃত্তিরত লম্পটগণ—অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া, মনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে অভিলষিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। সংসার বিচিত্র লীলাস্থল, এই স্থানেই পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সমুদায়েরই উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে।

রাধামতির পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কদলীবৃক্ষ যেরূপ দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সংসারে রমণীর বৃদ্ধিও সেইরূপ। দুই বৎসরের পূর্ব্বে যে বালিকাকে ধূলিখেলায় খেলিতে দেখিয়াছি, যাহার সচঞ্চল ভাব, সরলস্বভাব—সকলকেই বাৎসল্যভাবে মোহিত করিয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রতি অকস্মাৎ দৃষ্টি পতিত

হইলে, লোক-লজ্জায় অধিকক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকা যায় না; তৎক্ষণাৎ চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইতে হয়! কামিনীর কি মোহিনী শক্তি! সংসারে যত কিছু ঘাত-প্রতিঘাত ঘটিয়া থাকে, রমণী তাহার মূলস্বরূপিণী, আদ্যাশক্তির প্রভাবে দেবদেব মহাদেব স্বয়ং পরাভব স্বীকার করিয়াছেন! পুরুষ প্রকৃতি বিহনে ক্ষণকাল থাকিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃতি হইতেই সংসারের সুখ-দুঃখ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রিয় পরিজনবর্গে মিলিত হইয়া আমরা যে কালক্ষেপ করি, নারীই তাহার ভিত্তি; পুরুষ শ্রম করিয়া সংসারের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেছেন, রমণী হইতে গৃহস্থালী রক্ষিত হইতেছে। যে সংসারে নারী নাই, সে সংসার দুঃখভারে পূর্ণ; যেহেতু কামিনী কোমল-প্রকৃতি; কাঠিন্য-ভাবে যদি দিবানিশি যাপন করিতে হয়, তাহা হইলে আর সুখ কোথায়? রমণী সেই পার্থিব সুখের আকর, অপরতঃ রমণী হইতেই যাবতীয় বিপদের সূত্রপাত! লোকে নারীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া কত শত সর্ব্বনাশই ঘটাই-তেছে। পরিণামে যে কি ঘটিবে, কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার কিছুতেই দৃষ্টি নাই; মনে যাহা উদয় হইল—অবিমৃষ্যকারিতাদোষে তাহাই সাধন করিতে অগ্রসর হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা এককালে বিসর্জ্জন দিয়া, লোকে আনন্দে অনন্ত বিষাদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছে। রাধামতি এক্ষণে আর বালিকা নহে, যৌবনোচিত লক্ষণ তাহার শরীরে বিরাজিত; এক্ষণে ভালবাসা যে কি

বস্তু, তাহার প্রতিবিম্ব অবলার সরলা হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে অঙ্কিত হইতেছে। কিরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইলে রাধামতি অপরের নিকট আদৃতা হইবে, কিরূপে সকলের হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে, এই সমস্ত চিন্তাই এক্ষণে তাহার হৃদয়-মন্দিরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যে জনৈক পরিচারিকা বক্কেশ্বরের গৃহে বহুকালাবধি নিযুক্তা ছিল, তাহার নাম কামিনী; রাধামতির শৈশবাবস্থায় সেই দাসী তাহাকে কন্যাভাবে লালন-পালন করিয়াছে; বিবাহোৎসবেও কামিনী বক্কেশ্বরের গৃহে ছিল এবং কন্যা ভর্ত্তৃগৃহে যাইবার কালীন সেই পরিচারিকাই সমভিব্যাহারে গিয়াছিল। বিশেষতঃ কামিনী রাধামতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা ছিল, রাধামতির মনোমধ্যে কোন ভাবের উদয় হইলে, অকপটচিত্তে সেই পরিচারিকা-সমীপে সকল কথা ব্যক্ত করিত, এমন কি, রাধামতি জননী-সমীপে যে সকল কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা হইত, অকপটচিত্তে তৎসমুদায়ই তাহার নিকট জ্ঞাপন করিত। অর্দ্ধ শতাব্দীর শীত গ্রীষ্ম কামিনীর মস্তক দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার চপল-স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে সেই বৃদ্ধা বিশেষ পরিদর্শিনী ছিল, তাহাতে বহুকালাবধি এক প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, এক্ষণে সে সংসারে গৃহিণীর মত হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত বিষয়-কার্য্যেই বক্কেশ্বর তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি তাহার অজ্ঞাতসারে কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আর কামিনীর

দুঃখের সীমা থাকে না। কাহারও বাটীতে কোন কাজ-কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, কামিনী তথায় কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু স্বভাব মৃত্যুকালাবধি সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে, বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে সহজে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। বয়সে বৃদ্ধা হইলেও কামিনীর স্বভাব-চরিত্র তাদৃশ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই, অল্প-বয়স্কা রমণী যেরূপ হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া—মনো-মধ্যে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই পূর্ণ করিতে যত্নবতী থাকে, সেইরূপ কামিনীও মনে মনে 'কোন বিষয় করিব বলিয়া স্থির করিলে, তাহাতে পরিণামে মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা না করিয়া, তৎসাধনে সযত্ন হয়।

নারী কোমলপ্রকৃতি, জগদীশ্বর রমণীকে এই ধাতুতে সৃষ্টি করিয়া পুরুষের কঠিনতার লাঘব সাধন করিয়াছেন; পথে ঘাটে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পক্ককেশ, দন্ত-বিহীন বৃদ্ধ, নবীন যুবকের মত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া বিহার করিয়া থাকে। চিরকাল সে ব্যক্তি এই ভাবেই ক্ষেপণ করিয়াছে, বিলাসভোগই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। লোকের নিকট অপবাদ বা তজ্জনিত কোন কথা সহ্য করিতে হইবে, তাহা ক্ষণ-কালও ভাবিয়া দেখে না। সে অকর্ত্তী পুরুষ আপনার বেশ ভূষা ও বিলাস ভোগেই একান্ত অনুরক্ত, ইহ সংসার যে অচিরে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং পরলোকে আমাদিগের ইহজীবনের কার্য্যাদির যে সম্যক্ সমালোচন হইবে, দিনেকের নিমিত্তও সে চিন্তা তাহার হৃদয়ে

উদ্রেক হয় না। পুরুষের গর্হিত কার্য্যের বিষয় সমাজে প্রকাশিত হইলেও, এক্ষণে তাহাকে তাদৃশ নিন্দিনীয় হইতে হয় না। যাহারা তাহার প্রতি উপহাস-নেত্রে দৃষ্টি-পাত করিল, তাহাদিগের নিকট সেই ব্যক্তি নিন্দিত হইলেন মাত্র, কিন্তু তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইল না। স্ত্রীলোকের চরিত্র দর্পণ সদৃশ! একবার বিন্দুমাত্র কলঙ্ক সঞ্চার হইলে, জীবনে সে অপবাদ আর বিদূরিত হইবার নহে। তাহাতে যে সকল রমণী কুলশীলে জলাঞ্জলি দিয়া কুপথগামিনী হইয়াছে, তাহাদিগকে চিরকাল বিষাদ-নীরে নিমগ্ন থাকিতে হয়। সংসারে মনের সুখই পরম সুখ, যাহাকে নিত্য নিত্য নব নব ভাবে নব নব পুরুষের মনস্তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত সংযত থাকিতে হইবে, সে কামিনীর তৃপ্তি কোথায়? আমাদিগের কামিনীর চরিত্র দূষিত ছিল। এরূপ শুনা যায়, যৌবন-কালে কোন যুবকের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে গুপ্ত-প্রেম পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রমর যেরূপ প্রস্ফু-টিত কুসুমের মধুপান করিয়া চরিতার্থ হইলে, আর তাহার নিকটে যাতায়াত করে না; পুষ্প যে ভাবে ছিল, সেইভাবে থাকিয়াই কালের কঠোর শাসনে মলিন হইয়া ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে; আমাদিগের কামিনীরও সেই ভাব উপস্থিত হইয়াছে, সময়ে তাহার আমোদ-প্রমোদে দিনা-তিপাত হইয়াছে, এক্ষণে সে যুবাই বা কোথায়. আর কামিনীর পূর্ব্ব সুখ-সম্পত্তিই বা কোথায়? কামিনী একে পরের গৃহে দাসী, তাহাতে আবার অসার যৌবন উত্তীর্ণ

হইয়াছে, সে সুখ উপভোগের আর সম্ভাবনা নাই। তবে তাহার চরিত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। লোকে কথায় বলে "বস আছে—রসিক নাই"। আমাদের কামিনীও আমোদ প্রমোদ রসরঙ্গের কথায় সর্ব্বাপেক্ষা মুখরা। তাহার এই মহৎ দোষ সত্ত্বেও যে প্রভুর মাসিকবৃত্তি গ্রহণ করিত, তাঁহার সংসারের প্রতি বিশেষ যত্ন, এই জন্যই বক্কেশ্বর তাহাকে বহুকালাবধি বাটীতে রাখিয়াছেন।

রাধামতির শৈশবাবধি সহোদর বা সহোদরা কেহই নাই: পিতা মাতা মাত্র সংসারের সহযোগী, সমবয়স্ক বালিকাদিগের সহিত একত্র কালক্ষেপ করিতে বালিকা বয়সে সকল কণ্যাই অভিলাষিণী হইয়া থাকে। রাধামতির ভ্রাতা ভগ্নী না থাকিলেও পল্লীস্থ বালিকাদিগের সহিত অবিবাহিতাবস্থায় কালযাপন করিত, এক্ষণে বিবাহ হইয়াছে। হিন্দুরমণী কপালে সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিলেই গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উপায় থাকে না, তাহাতে দেখিতে দেখিতে রাধামতি যৌবনাবস্থায় পরিণতা হইয়াছে। যে সকল বালিকাগণের সহিত তাহার সখ্যতা হইয়াছিল, তাহারাও এক্ষণে পতি-অঙ্গ-শোভিনী হইয়াছে, সুতরাং পরস্পরের পূর্ব্বের মত একত্র বিহার আর হইয়া উঠে না; কালক্রমে দেখা সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরে পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসামাত্র হইয়া থাকে। সঙ্গদোষে লোকের চরিত্র কলুষিত হয়, কোন ব্যক্তির স্বভাব ভাল হইলেও

অসতের সহ সহবাস থাকিলে, দিনে দিনে তাহার স্বভা-বের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে ; সংসারে যে সৎ ও অসৎ উভয়বিধ বৈলক্ষণ্যভাব পরিলক্ষিত হয়, একমাত্র সঙ্গ সহবাসই তাহার মূলকারণ। মাতা-সংসর্গ বাসই পিতা হইতে আমরা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের কৃপায় আমরা এই সুখসেব্য ধরণীতল দেখিতে পাইলাম, অধিকন্তু তাঁহাদিগেরই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র স্নেহে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি ; কিন্তু দিনে দিনে যেমন আমরা বর্দ্ধিত হইতে থাকি, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মোহিত হই ; একমাত্র প্রিয়বন্ধু হইতে সে সকল বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করি। এরূপ অনেক মনোগত ভাব জনক-জননীর নিকট গোপন রাখিয়া সেই প্রিয় বন্ধুর নিকট অকপট চিত্তে ব্যক্ত করি ; প্রকৃত যাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি এবং যাহার হৃদয়ের সহিত আপনার হৃদয়ের কোন প্রভেদ রাখি না, সেই ব্যক্তির ইচ্ছার উপর সুখ-দুঃখ সমুদায় নির্ভর করিতেছে, কারণ আমি তাহাকে বিশ্বস্ত জানিয়া প্রাণ-মন সমর্পণ করিলাম এবং সে ব্যক্তির নিকট সরলভাবে সকল বিষয় ব্যক্ত করিলাম ; কিন্তু সে ব্যক্তি মৌখিক আমার সহিত সরলতা দেখাইয়া অন্তরে কপটতা ব্যবহার করিলে, সেই বিষধর উদ্গারিত গরলরাশি হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, নিশ্চয়ই সেই হলাহল পানে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। লোকে অনেক স্থলে নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া থাকে। আমাদিগের রাধামতি সরলা, কিন্তু

বালিকাবয়স বশতঃ কিঞ্চিৎ চপলস্বভাবা। শিশুকালের চরিত্র দেখিয়া পরিণামে যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজে সম্যক্‌রূপ অনুভব করা যাইতে পারে না; যেহেতু মাতার নিকট সস্নেহ বচন, পিতার স্নেহ ও যত্ন সকল বালক-বালিকারই তৃপ্তিসাধক। বয়োবৃদ্ধি সহকারে নরনারী যতই সংসারে প্রবেশ করিতে থাকে, ততই লোকের চরিত্র দেখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাধামতি এক্ষণে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে, তাহার হৃদয়ের প্রকৃতি সমূহ অপেক্ষাকৃত বলবতী হইয়াছে। এক্ষণে সহচরীস্বরূপা পরিচারিকা কামিনীর সহিত সকল ভাবের কথাবার্ত্তাই হইয়া থাকে। রাধামতি কামিনীর হস্তে সংসারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, কামিনী তাহাকে যে দিকে লওয়াইবে, রাধামতিও সেই দিকে নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইবে, তদ্বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবিয়া দেখিবে না। বিশেষতঃ রাধামতি যুবতী, কামিনী প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থার উপনীতা হইয়াছে। যুবতী বৃদ্ধার সহিত সরল ব্যবহার করিলেও বৃদ্ধা সংসারের সবিশেষ দেখিয়া শুনিয়া বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; এরূপ ভাবে যুবতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে যে তাহাতে আত্মসংরক্ষণ সাধিত হয়, অথচ যুবতীর মনস্তুষ্টি করে; সন্ধ্যাকালে যুবতী কামিনী সহ অন্দর মহলের ছাদে উঠিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কখন বা আকাশের নিশাকরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার কলঙ্ক লইয়া কত কথার আন্দোলন হইতেছে, আবার

ক্ষণেকে চন্দ্রমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার সহিত তুলনা করিয়া নক্ষত্রনিকরের কর-ধারার নিন্দাবাদ করিতেছে; গুল্মলতাদিতে জড়িত হইয়া মধ্যে মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণা-লোক বিকাশ-দর্শনে ফণীর মণি রাখিয়া বিচরণ অনুমান করিতেছে, এইরূপ বিবিধ ভাবে কথাবার্ত্তা ও ভাবনা-স্রোত চলিতেছে, এমন সময়ে রাধামতির পার্শ্বস্থিতা কামিনী যেন কোন সঙ্কেতানুসারে কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিল। চপলা রাধামতি ধাত্রীর এরূপ ভাব দেখিয়া কারণ জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হৃদয়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল. ক্ষণকাল কাহারও মুখ হইতে কোন কথা নিঃসৃত হইল না। উভয়েই পরস্পর মৌনভাব ধারণ করিয়া ক্ষণকাল ক্ষেপণ করিল। অনতিবিলম্বে দাসীর মুখে কিঞ্চিৎ হাস্য বিকাশ পাইল, বালিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কামিনী আর এবার নীরবে থাকিল না, রাধামতির কাণে কাণে কি দুই একটী কথা বলিল; কিন্তু তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে. যে ব্যক্তির আনুকুল্যে রাধামতির বিবাহোৎসব সাধিত হইয়াছে. সেই বাটীর কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল; যেহেতু উভয়ে সেই বাটীর দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, এবং দুই একবার সেই দিকে অঙ্গুলিও দেখান হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে স্পষ্টভাবে কিছু প্রতীয়মান না হইলেও, সেই ছাদের উপরে একটী লোক যে বিহার করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক ছত্র কবিতা উচ্চারণ করিতেছে, এইরূপ অনুমান হইল। রাধামতি কামিনী সহ

সেই স্থানে অনেকক্ষণ চিন্তাকুলচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং অনতিবিলম্বে ধাত্রীসহ নিম্নতলে নামিয়া আসিল। আসিবার কালেও কামিনী তাহার সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিল, কিন্তু কি কথা কহিল—কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া রাধামতির বিবাহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বক্কেশ্বরের বিশেষ সখ্যতা ছিল। লোকের সহিত আলাপ-পরিচয়ে যে কাজ সাধিত হইয়া থাকে, সময়ে স্বজন দ্বারাও তাহা হইয়া উঠে না। পৃথিবীতে বন্ধুর সদৃশ প্রিয় সামগ্রী আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি ইহ জীবনে প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছেন, তিনিই সুখী; নতুবা কপট বন্ধুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়া, বারে বারে বিপদ-জালে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। বক্কেশ্বরকে কন্যা-দায় হইতে যে মহাশয় মুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দ্বারকানাথ রায়, নিবাস মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি গ্রাম।

তাঁহাকে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু বিলক্ষণ বুদ্ধিমান; প্রায় বিশ বৎসর স্বদেশ হইতে পরিবারাদি লইয়া এক্ষণে তিনি হুগলিতে বাস করিতে ছিলেন। রায় মহাশয় বুদ্ধিজীবী, পৈতৃক বিষয়াদি তাদৃশ না থাকিলেও নিজের পারদর্শিতায় দশ টাকা সংস্থান করিয়াছিলেন। যদিও তিনি বিদেশে অপরিচিত স্থানে এক্ষণে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি অলৌকিক বদান্যতা ও মিষ্টভাষিতা গুণে অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি হুগলির বিচারালয়ে মক্কেলের কার্য্য করিয়া মাসিক তিন চারিশত টাকা উপায় করিতেন, মধ্যে যশোরের জনৈক ভূম্যধিকারীর কোন বিবাদ মামলার নির্ব্বাহভার গ্রহণ করিয়া বিচারে তাঁহাকে জয়ী করায়, এককালে বিশ পঁচিশ সহস্র টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এ সকল কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ও মিষ্টভাষী হইলে অচিরে তাহার সুখ্যাতি ঘোষিত হইয়া থাকে এবং লোকেও বিচার কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকে। দ্বারকা নাথ উত্তরাঢ়ি শ্রেণীভুক্ত বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহাদিগের সহিত এখানকার লোকের করণ কারণ নাই এবং তাহাদের দেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। যখন তিনি প্রথম হুগলিতে আগমন করেন, তৎকালে পরিবারাদি কাহাকেও লইয়া আসেন নাই; কেবলমাত্র ললিত চন্দ্র দে নামক তাঁহার সরকার ও আপনি আসিয়াছিলেন। সে সময় বক্রেশ্বরের

অবস্থা এরূপ হীনভাবাপন্ন হয় নাই, বাটীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি কার্য্য সমূহ বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইত। দ্বারকা নাথ দুই চারি দিবস বক্রেশ্বরের বাটীর সন্নিকটে একটী বাসা ভাড়া লইয়া অবস্থিতি কালে, অকস্মাৎ বক্রেশ্বরের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। সে সময়ে জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়াদি লইয়া বক্রেশ্বরের মামলা মকর্দ্দমা প্রায়ই উপস্থিত হইত; সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহাদের উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়া উঠে। দ্বারকা নাথ হুগলিতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবারাদি তথায় লইয়া আসেন এবং সুবিধাক্রমে বক্রেশ্বরের পল্লীতেই একখানি বাটী খরিদ করিয়া তথায় বাস করেন। এক্ষণে দিনে দিনে পরস্পরের প্রণয় গাঢ়তর হইয়াছে; সমাজে আহার বিহার না থাকিলেও উভয়ে উভয়ের বাটীতে আহারাদি চলিত। এমন কি, সময়ক্রমে বন্ধুযুগলের মহিলাদিগেরও পরস্পর আলাপ পরিচয় হইয়া উঠে। আমাদিগের নায়িকা বাল্য-কালাবধি দ্বারকা নাথের কনিষ্ঠ কন্যার সহিত একত্রে খেলা করিত এবং উভয়ে 'বকুল ফুল' পাতাইয়া ছিল, সেই সুবাদে সময়ে সময়ে উভয়ের তত্ত্বাদি চলিত। দ্বারকানাথের কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুমতি; সুম-তির সহিত রাধামতির এরূপ সদ্ভাব হইয়া উঠিয়া-ছিল যে, একত্র বিহার না হইলে উভয়েই মনে মনে ক্ষুণ্ণা হইতেন। কালচক্রের বিচিত্র গতি, জীবের ভাগ্যে ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বক্কেশ্বরের অবস্থার অধোগতি হইয়াছে, ওদিকে দ্বারকানাথ দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সংসারে ধনাঢ্য লোকের গৃহে বিনা আহ্বানে লোকের জনতা হইয়া থাকে, সকলেই মনে মনে সেই ধনশালী ব্যক্তি হইতে সময়ে কোন না কোন উপকার হইতে পারিবে স্থির জানিয়া, দিবা রাত্রি তাহার বাটীতে গতিবিধি করিতে থাকে। যে ব্যক্তি নিঃস্ব, লোকে তাহার বাটীতে যাওয়া দূরে থাকুক, পথ ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেও ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহে না। বিশেষতঃ দ্বারকা নাথ শান্তপ্রকৃতি ও মিষ্টভাষী, ইতর বিশেষ না করিয়া সকলের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। লোকে যথায় যত্ন পায়, অগ্রে সেই স্থানেই জনতা করিয়া থাকে, তাহাতে আর তাঁহার বাটীতে লোক জনের সমাগম না হইবে কেন? অবস্থার উন্নতির সহিত আমোদ-প্রমোদেরও বৃদ্ধি হয়। আজ বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া ভোজনাদি হইল, কাল হয়ত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চলিল; এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন আমোদ দ্বারকা নাথের বাটীতে হইয়া থাকে। আমাদিগের নায়িকা সুমতির সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধা, তাহাতে দ্বারকা নাথ তাহাকে সুমতির সহোদরাভাবে যত্ন করিতেন। রাধামতিও দ্বারকানাথকে খুল্লতাত বলিয়া জানিত। বালিকাবস্থায় সুমতির সহিত রাধামতির মিলন হয়, তাহারা উভয়েই সমবয়স্কা, পরিস্পর পরস্পরকে ভগ্নীর মত জ্ঞান করিত। দ্বারকা নাথ এক্ষণে বক্কেশ্বরের

হীনাবস্থা জানিয়া সুমতির কারণ যখন যে কোন বস্তু লইয়া আসেন, পাছে তাহা দেখিয়া রাধামতির মন বিচলিত হয়, তজ্জন্য দুইপ্রস্থ করিয়া লইয়া আসিতেন। সংক্ষেপতঃ দ্বারকা নাথের স্নেহে—দরিদ্র পিতার কন্যা হইয়াও রাধামতির কোন বিষয়ে অভাব ছিল না, সুমতির ন্যায় সেও বেশভূষায় সজ্জিতা থাকিত। বালক বালিকা যথায় আদর ও যত্ন পায়, সদা সর্ব্বদা সে স্থানে থাকিতেই ভাল বাসে; আমাদিগের নায়িকা এই জন্যই দ্বারকা নাথের বাটীতে অধিকক্ষণ যাপন করিত।

দ্বারকা নাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র নাথ, পিতার মত শিষ্ট ও লেখা পড়ায় সুপণ্ডিত, চতুর্থ বর্ষের পাঠাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে আইন শিক্ষা করিতেছেন। সকলেই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য অথবা বিষয়াদি জনিত অহঙ্কার তাঁহার হৃদয়ে লেশমাত্র স্থান পায় নাই, পিতার পরামর্শ ব্যতিরেকে কদাচ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। নিজেও যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহাতেও তিলার্দ্ধ গর্ব্ব নাই। কিন্তু নয়নমোহন চন্দ্রে ও যেরূপ কলঙ্ক আছে, সেইরূপ এই সর্ব্বগুণবিভূষিত মহেন্দ্র নাথ সর্ব্ব গুণ সত্ত্বেও একটী বিষয়ে পিতার বিরুদ্ধাচারী, পিতা পরম হিন্দু—বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী; আর মহেন্দ্রনাথ আধুনিক প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসক—এই মাত্র বিভেদ মহেন্দ্র নাথের মনে ও মুখে কোন বৈলক্ষণ্যভাব প্রতীয়মান হইত না,

কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত গোলযোগে পতিত হওয়ায়, সুখের সংসার তাঁহার পক্ষে বিষাগার হইয়া উঠিয়াছিল। পিতা যে সকল কার্য্য করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন এবং সেই ভাবে সমাজে চলিবার নিমিত্ত সন্তান-সন্ততিকে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাতে মহেন্দ্রনাথের মন ক্ষুব্ধ হইত।

কনিষ্ঠ পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। লোকের সহিত বাহ্যিক কথা বার্ত্তায় অমায়িকপুরুষ; কিন্তু যৌবনসুলভ সঙ্গদোষে তাহার চরিত্র পঙ্কিল। লেখা পড়ায় তাহার আদৌ মনোযোগ নাই; সর্ব্বদাই আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে অভিলাষী। জীবনে একমাত্র সঙ্গীগণ সহ কুস্থানে গমন ও মদ্যাদি পান করাই সার বলিয়া জানিয়াছে। পিতা যে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কত দুঃখ কষ্টে অর্থ সংস্থান করিতেছেন, সে বিষয় ক্ষণকালও ভাবিয়া দেখে না। যাহাতে আপনি মনের আনন্দে কালক্ষেপ করিতে পারে, অনুক্ষণ সেই সকল বিষয়েই চিন্তাকুল। ধনাঢ্য লোকের পুত্র, পিতার অবর্ত্তমানে অতুলধনের অধিকারী হইবে জানিয়া, নানাবিধ লোক তাহাকে সদা সর্ব্বদাই বেষ্টন করিয়া থাকে। বৈঠকখানা গৃহে উৎকৃষ্ট তোষকে জাজিম পাতা, মধ্যে মধ্যে ভৃত্যগণ আলবলায় তমাক আনিয়া দিতেছে। এরূপ স্থলে লোক সমাগমের আর ভাবনা কি?

শৈশবাবধি সুমতির সহিত রাধামতি একত্রে খেলা করে। সুমতি যেরূপ হেমেন্দ্র ও মহেন্দ্রকে দাদা বলিয়া

সম্বোধন করিয়া থাকে, রাধামতিও সেইরূপ তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়াই জানে। কোমলমতি বালিকা সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষালাভ করে নাই। হেমেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া সুমতি ও রাধামতিকে একত্রে খেলা করিতে দেখিয়া কথাচ্ছলে সময়ে সময়ে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইত এবং নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ করিত, আবার কখন বা দুই একটী উপহাসের কথাও কহিত; হেমেন্দ্র যুবক, তাহার ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ক্ষমতাবিশিষ্ট; এদিকে সুমতি ও রাধামতি উভয়েই বালিকা। হেমেন্দ্র যে ভাবেই তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করুক না কেন, তাহারা ভ্রাতার স্নেহ ও আদর ব্যতিরেকে আর কিছুই জানে না। এদিকে যুবক রাধামতির রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়াছে, সে ভাব স্বপ্নেও বালিকাযুগলের চিত্তে অঙ্কিত হয় নাই। যে চক্ষে হেমেন্দ্র বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহা পশুবৃত্তিজনিত পাপেপূর্ণ, কিন্তু বালিকাদ্বয়ের পবিত্র হৃদয় ভ্রাতাকে গুরুজন জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকে। যে দিবস রাধামতি ধাত্রী সহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাদোপরি বিচরণ করিতে করিতে অকস্মাৎ সহচরীর মনের উদ্বেগবশতঃ যে নিম্নতলে আসিয়াছিল এবং অনতিদূরবর্ত্তী ছাদে যে এক জনের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র দেখিতে পাইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এই নরপিশাচ হেমেন্দ্রনাথ। ইতর প্রকৃতিগ্রস্ত লোকদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য

নাই; তাহাদিগের দ্বারা জগতের সকল অনিষ্টই সংঘটিত হইতে পারে। অবলা বালিকা রাধামতি কোমল-মতি; তাহার আন্তরিক ও মৌখিক ভাবের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। সরলার হৃদয় দ্বিধাশূন্য। সে যাহা দেখে, তাহার পক্ষে তাহাই সুন্দর; যাহা খায়, তাহাই তাহার মধুর; কিন্তু এই যে অকলঙ্ক কুসুমকোরকে কীটের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র সে সরল হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। বালিকা আপন মনে আপনার গৌরবেই উন্মত্তা; কিরূপ ভাবে সমাজে চলিলে লোকের নিকট সম্মান হইবে, কিরূপ কার্য্যে লোক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে, এ সকল কিছুই জ্ঞাত নহে। মৃগশাবক আয়ত্তাধীনে পাইয়া শৃগালের যেরূপ আনন্দ হয়, দিনে দিনে রাধা-মতিকে সহোদরা সুমতির সহিত একত্র কালক্ষেপ করিতে দেখিয়া, দুর্ব্বৃত্ত হেমেন্দ্রের সেইরূপ আর সন্তোষের সীমা নাই! কি কৌশলে সে সেই মনোরমা বালিকাকে হস্তগত করিবে, হেমেন্দ্র সারাদিন সেই চেষ্টায় সংযত হইল।

কোন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, তাহাতে নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু পাপা-চারের পথ প্রশস্ত। হেমেন্দ্রের হৃদয়ে ইতর প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে পত্র ও শাখাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুমতি রাধামতি সহ একত্র খেলা করিতেছে, সে গৃহে অপর কেহই নাই; নির্লজ্জ হেমেন্দ্র তাহাদিগের সহিত অষ্টমবর্ষীয় বালকের ন্যায় উপহাস বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। কখনবা

রাধামতির আরক্তিম গণ্ডস্থলে হস্তপ্রদান করিয়া তাহার মনের অভিলাষ জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে লাগিল। প্রেমোন্মত্ত যুবক হিতাহিত বিবেচনা শূন্য—মান, সম্ভ্রম, গুরুজনের তিরস্কার প্রভৃতি সামাজিক বন্ধনের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। এক্ষণে কি কৌশলে রাধামতি তাহার প্রণয়িণী হইবে, এই বিষয়েই দিবানিশি চিন্তা। সাংসারিক বিষয়-ভোগ-লালসা সে পাপিষ্ঠ-হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। এক্ষণে মহেন্দ্র দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য, তাহার জীবনের প্রতিও আশা নাই, হয়ত রাধামতি ও সুমতিসহ একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তায় কালক্ষেপ করিতেছে; আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহাতেও মনে লজ্জা বা কলঙ্কের ভাবনা চিন্তার লেশমাত্র নাই; রাধামতিই তাহার জীবনের সার ব্রত!

জগতে রূপবতী কামিনীর পদে পদে শত্রু। অনেকেই মনোমোহিনীর হৃদয়গত ভাব বুঝিব, এইরূপ অসার কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। জগতে নারীর প্রণয় সদৃশ মনোমুগ্ধকারী আর কিছুই নাই। যত কিছু অনিষ্ট আছে, প্রায় সমুদায়েরই রমণী মূল। নারীর ভালবাসায় আসক্ত হইয়া কত শত রাজ্য উৎসন্ন গিয়াছে, কতশত স্বাধীন রাজা পরাধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। হেমেন্দ্রনাথ

হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না করিয়া অবলা সরলা রাধামতির প্রতি আসক্ত হইলে, তাহার জীবনের সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল। আত্মীয় স্বজনের উপদেশ, সহধর্ম্মিণীর প্রবোধবাক্য, আহার বিহার সকলই তাহার যেন গরল সদৃশ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাধামতির রূপ লাবণ্যে, মহেন্দ্রনাথের অনুরাগ সঞ্চার সময়ে বালিকার বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয় নাই। স্থানে স্থানে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে; বালিকা তৎকালে নবমবর্ষ অতিক্রম করিয়া দশমে পদার্পণ করিয়াছেমাত্র। এক এক নারীর কেমন অলৌকিক রূপমাধুরী, যে ভাবেই নেত্রপথে পতিত হউক না কেন, চিত্তাকর্ষণ করে। আমাদিগের নায়িকার রূপগুণের অভাব নাই. একে ভুবনমোহিনী রূপরাশি, তাহাতে সুমধুর বচনসুধা—দুরাচার হেমেন্দ্র নাথের পক্ষে মাহেন্দ্রযোগ। মূঢ় সেই বালিকাপ্রেমে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, যে কোন উপায়েই হউক, তাহাকে হস্তগত করিবে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল।

পাপকর্ম্ম আমরা যতই গোপন করি নাকেন. পরিশেষে সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়ে। রাধামতির প্রতি হেমেন্দ্রের অনুরাগ সঞ্চার পিতা মাতার গোচর হইয়াছিল। এমন কি, পরিশেষে রাধামতি আর সেরূপ সদা সর্ব্বদা দ্বারকানাথের বাটীতে বেড়াইতে আসিত না। তাহাতে দ্বারকানাথ উত্তরাঢ়ি কায়স্থ; সুতরাং দক্ষিণাঢ়িদিগের সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। তিনি যে কনিষ্ঠ পুত্রকে

রাধামতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তনয়কে সুখী করিবেন, সে আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ হেমেন্দ্রের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দ্বারকানাথ এই নিমিত্তই বঙ্কেশ্বরকে রাধামতির বিবাহ সত্বর প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের পরিবারবর্গ প্রায় সকলেই হেমেন্দ্রের এরূপ প্রবৃত্তির কথা শুনিয়াছিল এবং তাহার প্রতিবিধানে সযত্ন হইয়াছিল। হেমেন্দ্র পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া বিষাদে নিমগ্ন হইল। কিন্তু যাহারা চিরকাল অসৎকার্য্যে রত রহিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ কার্য্য কদাচ দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। হীনচেতা কি উপায়ে পূর্ণমনোরথ হইবে, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সরলমতি রাধামতির অধোগতির সূত্রপাত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংসারে সুখ-দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। এক যায় আর আসে. বিরাম নাই! ধূলার দেহ,

যতক্ষণ ধূলিরাশিতে মিলিত না হইবে, পঞ্চভূত যেকাল পর্য্যন্ত পঞ্চভূতে আশ্রয় না লইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত বিরাম নাই। জগতের ঘাত-প্রতিঘাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহ্য করিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানের বিনাশ নাই। যে ব্যক্তি সতর্কতার সহিত সংসার-পথে বিচরণ করিতে কৃতী হইয়াছেন, তিনিই মহাপুরুষ। তাঁহার নামের সহিত সংসারের সম্বন্ধ লুপ্ত হয় না, যুগ-যুগান্তরকাল তাঁহার সুযশ কীর্ত্তিত হইতে থাকে। লোকে সেই দিব্যপুরুষকে আদর্শস্বরূপ অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বঙ্কেশ্বর ধনাঢ্যের পুত্র, সুখ-সম্ভোগ অর্থের দ্বারা যাহা কিছু উপভোগ করা যাইতে পারে, তৎসমুদায়ই এককালে তাহার সম্ভোগ হইয়াছে। এক্ষণে দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিয়া কুমারী ও সহধর্ম্মিণীর জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাতেও তাহার প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টি নাই। মহাত্মা দ্বারকা-নাথ রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, কন্যাভার-জনিত প্রপীড়ন এক্ষণে হীনাবস্থ হইয়াও তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই; কিন্তু যে মাদকদ্রব্য সেবনে আজি ধনপতি হইয়া পথের ভিখারী স্বরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সে সংক্রামক ব্যাধি অদ্যাবধি তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কতক পরিমাণে চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কেশ্বর নিজের অবস্থা বুঝিয়াও স্বভাবদোষে তাহা ত্যাগ স্বীকার করে নাই। গঞ্জিকা সেবন অপেক্ষাকৃত

অল্প ব্যয়সাপেক্ষ; দুই চারি টাকা ব্যয় করিয়া মদিরা পানে মদ্যপায়ী যে আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হয়, গঞ্জিকাসক্ত দুই পয়সা ব্যয়ে ততোধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকে! কিন্তু বক্কেশ্বর মাদকের দাস হইলেও তাহার সংসারের প্রতি এককালে ঔদাস্য ছিল না; দুঃখে কষ্টে সংসারের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিত।

গৃহিণীর পারদর্শিতা থাকিলে সংসারে কিছুরই অভাব থাকে না। অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানে যেরূপ অন্ন-ব্যঞ্জনের চিন্তা নাই, যতই লোক আহার করুক না কেন, রন্ধনশালায় সতত অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে; সেইরূপ যে গৃহে গৃহিণী পরিশুদ্ধাচারিণী—সে সংসার যে ভাবেই চালিত হউক না কেন, কিছুতেই অনটন হয় না। বিশেষতঃ বক্কেশ্বরের ভার্য্যা পতিব্রতা সাধ্বী, সেই রমণীর বুদ্ধিকৌশলে সংসারের সকল অভাব সঙ্কুলন হইত। পতিপ্রাণা কামিনী একমাত্র পতির মঙ্গল-সাধন-ব্রত উদযাপন-মানসে যাহাতে স্বামী ও কন্যার কোন বিষয়ে অভাব না হয়, এই চিন্তাতেই দিবা-যামিনী চিন্তিতা থাকিতেন। তাঁহার মধুমাখা বচনে সকলেই মুগ্ধ হইত, দীন দুঃখী হইতে ধনাঢ্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। ক্রোধ কাহাকে বলে, তিনি তাহা এককালে অজ্ঞাত ছিলেন। পিতা ধন-পতির গৃহে বিবাহ দিয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার বিবাহ-কালে বক্কেশ্বরের পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন। তৎকালে

তাঁহাদিগের কোন বিষয়েই অভাব ছিল না. সময়ের ঘটনাস্রোতে এক্ষণে সমুদায় বিষয় হস্তান্তরিত হইয়াছে, বক্কেশ্বরের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি কন্যা-রত্ন লাভ করিয়াছেন, কুমারিকা অবস্থা হইতে এক্ষণে গৃহিণী হইয়াছেন; পূর্ব্বে দাসদাসীতে তাঁহার পরি-চর্য্যা করিত. এক্ষণে আর সে সকল সুখ কিছুই নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, এখনও তাঁহার রূপরাশি দর্শনে পূর্ণযৌবনা বলিয়া অনুভূত হয়। নাম কমলা. প্রকৃতই যেন নারায়ণজায়া বক্কেশ্বরের গৃহিণী হইয়াছেন। বক্কেশ্বর সঙ্গদোষে বিষয়াদি নষ্ট করিলে কমলার মুখ হইতে একটীও শোকদুঃখের কথা নিঃসৃত হয় নাই। পাছে স্বামী তাঁহার কথায় মর্ম্মপীড়িত হন, এইজন্য পতির সহস্র অপরাধও তিনি—অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। রাধা-মতির জন্মগ্রহণাবধি সংসারে দিন দিন অবনতির সূত্রপাত হয়; কিন্ত একমাত্র সাধ্বী সতী পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-পালনে সংযত থাকায়, কোন বিষয়েই অভাব ঘটিত না। এক্ষণে রাধামতির বিবাহোৎসব সমাধা হইয়া গিয়াছে। কিছুপূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষে কন্যার বিবাহ কারণ ভাবিত ছিলেন, দিবারাত্রি কোন কার্য্যেই তাঁহাদিগের স্ফূর্ত্তি ছিল না, কি উপায়ে কন্যাভার হইতে উভয়ে অব্যাহতি পাইবেন, অনুক্ষণ সেই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন; কিন্ত মহাত্মা দ্বারকানাথের অনুগ্রহে কন্যা এক্ষণে সৎপাত্রের হস্তে অর্পিত হইয়াছে; আর কোন

চিন্তা নাই। বিশেষতঃ এই সময়ে হুগলীর আদালতে বক্কেশ্বর একটী নকলনবিশি কার্য্য পাইয়াছিলেন, মাসিক বেতন বিশ টাকা; সংসারের কারণ আর হাহা ধাধা করিয়া দম্পতীযুগলকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। সুখে দিনাতিপাত হইতেছে। সময় যখন একবার ভাঙ্গিতে থাকে, উত্তরোত্তর বিকৃতভাবাপন্ন হয়; কিন্তু একবার আবার সুগ্রহের দিকে ফিরিলে আর কিছুই ভাবনা থাকে না। দুই এক মাসের পরেই বক্কেশ্বরের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। এদিকে তাঁহার পিতৃব্য পরলোক-গত হইলে সমস্ত বিষয়ের তিনিই উত্তরাধিকারী হইলেন। যেহেতু তাঁহার সন্তানসন্ততি অপর কেহই ছিল না। এক্ষণে প্রায় বিশ পঁচিশ সহস্র টাকা বক্কেশ্বরের হস্তগত হইল, যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার অবনতির অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিল, টাকার সংবাদ পাইয়া তাহাদের দুই একজন আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; কিন্তু এক্ষণে বক্কেশ্বর সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাদিগের প্রলোভন ও প্ররোচনা-বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। সুতরাং আর তাহাদিগকে পূর্ব্বের মত তাদৃশ সমাদর করিলেন না। বক্কেশ্বরের পূর্ব্বস্বভাব এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বুঝিয়া, তাহারা একে একে যে যাহার গৃহে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বক্কেশ্বরের পৈতৃক মান-সম্ভ্রম বজায় হইল। বাটীতে ক্রিয়াকলাপ, পৈতৃক

বন্দোবস্তানুসারে চলিতে লাগিল। এখন আর দুঃখের দিন নাই, বক্কেশ্বরের স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! তিনি দুঃখীকে ধনী, ধনীকে নির্ধনী করিতেছেন। অনেক দুঃখভোগ ও জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় বক্কেশ্বরের সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইতেছিল। নূতন জামাতাকে পাইয়া সাধ-আহ্লাদ চলিতেছিল; সময়ক্রমে কমলার শরীর অসুস্থ হইল। কমলার নিজের শরীরের প্রতি আদৌ যত্ন ছিল না, তিনি কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতিরেকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এই নিমিত্তই যৎসামান্য ভোজন ও পরিধেয় গ্রহণ করিতেন। অবস্থার উন্নতি ও অধোগতিতে তাঁহার হৃদয়ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই অধিকন্তু তিনি সাতিশয় দয়াবতী ছিলেন; এমন কি, দুঃখের দিনে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া যখন তাঁহার দিনাতিপাত হইয়াছে, সে সময়েও অভ্যাগত অতিথি আসিয়া তাঁহার গৃহ হইতে বিমুখ হয় নাই। হয় ত কোন দিন আহার করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, অকস্মাৎ অভুক্ত আগন্তুক দ্বারদেশে উপনীত হইলে, প্রসন্নচিত্তে তাহাকে আপনার নির্দ্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগাদি করিয়া দিনাতিপাত করিতেন পরের দুঃখে তিনি যেরূপ মর্ম্মপীড়িতা হইতেন, সেরূপ আর কোন কামিনীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারে তাঁহার সদৃশ নিঃস্বার্থ রমণী আর নাই।

সংসারে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যে ব্যক্তি একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, যতই কেন দুঃখে তিনি নিপতিত হউন না, পরিণামে তাঁহার সুখের ইয়ত্তা নাই। এতাবৎকাল বঙ্কেশ্বরের অবস্থা হীনভাবাপন্ন হইয়াও যে দুঃখে কষ্টে একপ্রকার সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল এবং সময়-ক্রমে পরিণামে যে উন্নতির অবস্থায় নীত হইল, সমুদায়েরই একমাত্র কারণ পতিপ্রাণা ধর্ম্মভীতা কমলা। বালিকা রাধামতির পিতামাতার দুঃখাবস্থাতেও সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি সুশিক্ষিত যুবকের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন, এদিকে আবার দিনে দিনে পিতার উন্নতি হইতেছে—সুখের সীমা নাই। কমলা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ভাবে দিন যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে সুখের অবস্থাতেও সেইভাবে দিনযাপন করিতেছেন। সংসারে দাস-দাসী পূর্ব্বের মত নিয়োজিত, আর কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু জগদীশ্বর যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, তদ্দণ্ডে সেইরূপই সাধিত হইয়া থাকে। তিনি সুখের সংসারকে দুঃখের সাগরে পরিণত করিতেছেন, পুনরায় দুঃখের তিরোভাবে সুখোদয় হইতেছে। মনুষ্যের দিন কদাচ একভাবে যায় না, ছায়াবাজীর দৃশ্যাবলীর মত নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে; কালে দুঃখভোগ করিয়াছি বলিয়া যে অবশিষ্ট সময় সুখে অতিবাহিত হইবে, এ কথা কে বলিতে পারে? আজ বঙ্কেশ্বরের গৃহে সংসারিক কোন বিষয়ের অপ্রতুল

নাই; কিন্তু এভাবে কয় দিন চলিবে? যদি একভাবে লোকের চিরকাল থাকিতে হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভিন্ন-ভাবাপন্ন কথার উৎপত্তি কোথা হইতে হইবে? জগতে এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া চিরকাল দুঃখভোগে ক্ষেপণ করিলেন, দিনেকের তরেও সুখী হইলেন না, কিন্তু সে ব্যক্তির বাহ্যিক দুঃখ দেখিয়া কি তাহাকে অসুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর; দিনান্তে তাহার আহার না মিলিলেও সংসারে সেই ব্যক্তি পরম সুখী। যেহেতু তাহার হৃদয় মধুর প্রেমরসে সদাই আপ্লুত, তাহার সহিত পার্থিব সুখের তুলনা হইতে পারে না। অধিকন্তু ঈশ্বর তাঁহার অনুগত ব্যক্তির মঙ্গল সাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকেন। যে সংসারে একমাত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তির সহানুভূতি আছে, তথায় যতই কেন বিপদরাশি উত্থিত হউক না, কোন আশঙ্কা নাই। সময়ে সময়ে সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া থাকে। নির্ব্বুদ্ধি বক্রেশ্বরের দোষে সংসার হতশ্রী হইয়াছিল। রাধামতি চঞ্চলা বালিকা, খেলা পাইলে আর কিছুই জ্ঞান থাকে না, প্রিয়সখী সুমতির সহিত মিলিত হইয়া কালক্ষেপ করে; এরূপ স্থলে একমাত্র কমলা ধর্ম্মপরায়ণা, জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কি

করিলে তাঁহার স্বামী ও পুত্রীর মঙ্গল হইবে, তাঁহার এইমাত্র নিঃস্বার্থ কামনা। দয়াময় জগদীশ্বরও ভক্তের আবেদন সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পতিব্রতার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে; রাধামতি ও বক্রেশ্বর সুস্থশরীরে মনের আনন্দে কালযাপন করিতেছেন! কমলার সুখ-দুঃখের ভেদাভেদ নাই, পূর্ব্বে সুখে কাটাইয়াছেন, মধ্যে দুঃখের দিন গিয়াছে, পরিণামে সুখোদয়! কমলা সকল অবস্থাতেই একভাবে আছেন; সে জীবনে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। একবার বাটীর দাসদাসীরা তাঁহাকে বেশভূষায় সুশোভিতা হইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন জগদীশ্বর যাহাতে সুখী হন, সে বেশভূষাপেক্ষা আর মনোরম কি আছে? প্রকৃতপক্ষে বাটীর সামান্য দাস-দাসী যেভাবে গ্রাসাচ্ছাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তিনিও সেই ভাবে দিনাতিপাত করিতেন; সুখস্বচ্ছন্দে, বিলাসভোগে সময় অতিবাহিত করিবেন, এরূপ প্রকৃতি কদাচ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। পতিপ্রাণা কমলা সাংসারিক কার্য্য সমাপন করিয়া অবশিষ্ট সময় ঈশ্বর আরাধনায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি যে কোন কার্য্য করিতেন, সকল বিষয়েই ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ধর্ম্মমূলক কার্য্য যতই দুরূহ হউক না কেন, প্রগাঢ় বিশ্বাস সেই ভগবানের প্রতি অর্পিত হইলে, অবশ্যই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সংসারে যে ব্যক্তি সাংসারিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, হয় ত সময়ে তাহার সুকৃতি লাভ হয়;

কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অবনতির সূত্রপাত হইয়া থাকে। অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থে বিশ্বাস নাই, যে ব্যক্তি হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া অজ্ঞানবশে সহসা কার্য্যে রত হইয়াছে, আপাততঃ তাহাতে শুভ ফল প্রদান করিলেও পরিণামে অনিষ্ট সংঘটনের পদে পদে সম্ভাবনা। সংকার্য্য সম্পাদনে প্রথমতঃ কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতেই অতুল প্রীতি অনুভূত হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া ইহজীবন কষ্টভোগে অতিবাহিত করিল, কিন্তু পরিণামে জগদীশ্বর তাহারই কারণ অনন্ত শান্তির সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ঐহিক সুখলাভ বাসনায় উন্মত্ত হইয়া, পারমার্থিক বিষয় কিছুই ভাবিয়া দেখি না; দেহান্তে পুনরায় যে অন্য দেহে আত্মার সঞ্চার হইবে, এ সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম, আচার-পদ্ধতির যে পরলোকে বিচার হইবে, সে সকল বিষয়ের কিছুই চিন্তা করি না। আপাততঃ যাহা কিছু মনোরম জ্ঞান করি, তাহাই সম্ভোগ করিবার কারণ ব্যগ্র হই, কিন্তু তাহা হইতে অবশেষে মহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, ক্ষণকালমাত্রও তাহা ভাবিয়া দেখি না; এই সকল কারণেই সংসারে পাপের বৃদ্ধি। কিন্তু জগদীশ্বরের সুদৃষ্টি ধর্ম্মাত্মার হৃদয়ে চিরবিরাজিত। তিনি ধার্ম্মিককে প্রাণপণে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি ইহকাল ধর্ম্মাচরণে ক্ষেপণ করিল, অনন্তকাল যে সেই ব্যক্তি পরম সুখে অতিবাহিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বক্রেশ্বরের সুখের

অবস্থা হইতে দুঃখের এবং দুঃখ হইতে পুনরায় সুখের উদয় হইয়াছে; কিন্তু সে সুখ কি চিরকাল তিনি উপভোগ করিলেন? জগতে এরূপ কে আছে যে, সুখে চিরকাল যাপন করিয়াছে, দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতে সংসার পরিচালিত, একভাবে বহুকাল যাপিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বক্কেশ্বরের এক্ষণে চরিত্রদোষ সংশোধিত হইয়াছে। পাপসংসর্গে লিপ্ত হইয়া কত যে দুঃখভোগ হইতে পারে, সে জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বের বন্ধুবান্ধব এক্ষণে আর তাঁহার নিকটে স্থান পায় না, সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এক্ষণে তিনি লোকের চরিত্র বুঝিয়াছেন, ধর্ম্মে মতি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেই কি তাহার চিরকাল সুখে যাইবে? সে সুখবিধান একমাত্র জগৎপাতা জগদীশ্বরের হস্তে নির্ভর করিতেছে, তিনি অনাথিনীকে রাজনন্দিনী, দুঃখীকে রাজ্যদান সমুদায়ই সঙ্ঘটন করিতেছেন। প্রকৃত ধর্ম্মপথে যে ব্যক্তি বিচরণ করিতে কৃতী হইয়াছে, তাহার বাহ্যিক দুঃখকষ্টে মনোবৃত্তি সচঞ্চলা হয় না। সে হৃদয়ে নিত্য আনন্দ বিরাজিত। আজ কমলার হৃদয় সাংসারিক অভাব ঘুচিয়াছে বলিয়া যে প্রসন্ন, তাহা নহে; সেই পবিত্র অন্তঃকরণে চিরশান্তি আধিপত্য করিতেছে। সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাতে কদাচ তাহা বিচলিত হইবার নহে। স্বামী ও দুহিতা কমলার কারণ যে সুখে যাপন করিতেছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বক্কেশ্বরের চরিত্রের

সংস্কার হইয়াছে। যজ্ঞেশ্বর সাংসারিক বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তথাচ তাঁহাকে বিশ্বাস কি? যে ব্যক্তির চরিত্রে একবার কলঙ্করেখা পাত হইয়াছে, আজীবন সে ব্যক্তি সৎপথগামী হইলেও লোকে তাহাকে বিশ্বাস করে না।

রাধামতি বালিকা, কিন্তু আমোদপ্রিয়া; সদা সর্ব্বদা সুখে থাকিব, তাহার এইমাত্র কামনা। যে ব্যক্তি আপনার সুখের কারণ সদত যত্নবান, তাহার উন্নতি কোথায়? বাহ্যিক দৃশ্যে তাহার সরলতা প্রকাশ পাইলেও আন্তরিক কপটতা সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। কমলার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই অন্তর্যামী ভগবান তাঁহাদিগের প্রতি কৃপানেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই আজ সাংসারিক বিষয়ে অপ্রতুল ঘুচিয়া গিয়াছে। কমলা নানাদুঃখে দিনযাপন করিয়া স্বামী ও কন্যাসহ কিছুদিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সাংসারিক আমোদ-প্রমোদ ক্ষণভঙ্গুর; এই আছে, এই নাই। ছায়াবাজী-প্রায় গতিবিধি, এরূপ অসার আমোদে উন্মত্ত হইয়া অবিবেক ব্যক্তিই কালক্ষেপ করে। যে হৃদয়ে সেই অবিনশ্বর হৃদয়মণির আরাধনা আশ্রয় পাইয়াছে, সে হৃদয় সাংসারিক স্বামী-কন্যার প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া সংসার-সম্বন্ধে কতকাল লিপ্ত থাকিবে? জগৎ-চিন্তামণি জগদীশ্বর সকলের মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন। অধিকন্তু যাঁহারা সেই দয়াময় পতিত-পাবনের উপাসনায় ও ধর্ম্মপথে অনুক্ষণ কালক্ষেপ করেন, তিনি তাঁহাদিগকে বহু-

কাল সংসারে আবদ্ধ রাখেন না; বস্তুতঃ ধরাতলে সাধুপুরুষের লীলাক্ষেত্র অল্পকাল, কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র অনন্তকাল-স্থায়ী, লোকে সেই পবিত্র নরনারীর চরিত্র আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকে এবং সেই সমুদয় চরিত্র অনুকরণ দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধন হয়। যে সকল নরনারী চরিত্রের উপর শাসন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, যাঁহারা কদাচ কোন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সাংসারিক ঘটনাস্রোতে পুনঃপুনঃ আন্দোলিত হইয়াও যাঁহাদিগের হৃদয়ে চঞ্চলতার উদ্রেক হয় নাই, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই সুখী। বক্কেশ্বর এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছেন। বিশ্বের কি মোহিনী শক্তি! যে মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া, তাহার বিষয়-আশয় সকল গিয়াছিল, পুনরায় সেই গঞ্জিকা সেবনে অনুরক্ত হইয়াছেন। মনে মনে ভাবিয়াছেন, আর অবোধের মত কার্য্য করিবেন না, পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন; কিন্তু সে ভাব তাঁহার কতক্ষণ থাকিতে পারে? দেখিতে দেখিতে তাঁহার চরিত্রও কলঙ্কিত হইল, পুনরায় তাঁহার পুরাতন দুই একজন অনুচর আসিয়া, পূর্ব্বকৃত গর্হিত কার্য্যাদিতে সহায়তা করিল।

এদিকে রাধামতি পূর্ণযৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সংসারের বিষয়-কার্য্যে তাহার তাদৃশ অনুরাগ নাই। ইতিমধ্যে দুই একবার স্বামীগৃহে বাস করিয়া

আসিয়াছে; কিন্তু তথায় তাহার মন তাদৃশ স্ফূর্ত্তি-লাভ করে নাই। নবধৃত পক্ষী যেরূপ শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ হইলে, অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে, রাধামতির সেই ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। গৃহস্থের বধূর সংসারের সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহাতে সংসারে শাশুড়ী ননদ থাকিলে, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতে ও চলিতে হয়, মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত নব-বধূর গুরুজনদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবারও অধিকার নাই। শ্বশ্রূঠাকুরাণী প্রভৃতি গুরুলোকে অন্যায় দুই এক কথা প্রয়োগ করিলেও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার তাহার ক্ষমতা নাই—লোকে যে তাহাকে মুখরা বলিবে! ক্ষুধার সময়ে ইচ্ছামত আহার পায় না, শাশুড়ীর যখন সাবকাশ হইবে, যখন তিনি পুত্রবধূর জলখাবার দেওয়া প্রয়োজন জ্ঞান করিবেন, সেই সময়ে খাইতে পাইবে, নতুবা ক্ষুধার সময়েও আহার প্রার্থনায় তাহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইবে। হিন্দুললনার পক্ষে বিবাহের পর যত দিন পর্য্যন্ত না গৃহিণী হইয়া নিজের সংসার নিজে বুঝিয়া কার্য্যসাধনে কৃতী হইতেছেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার আপনার অভিলাষানুযায়িক কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা আদৌ নাই। সদত তাহাকে লজ্জাশীলা হইয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। রাধামতি বাল্যাবধি পিতা-মাতার আদর পাইয়াছে; সংসারের কাজ-কর্ম্মের প্রতি আদৌ তাহার অনুরক্তি ছিল না। মাতা কর্ম্মিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী হইয়া তনয়ার এরূপ গৃহকার্য্যে অনবধানতা বশতঃ কোনরূপ

তিরস্কার করিতেন না। কন্যার আহার-বিহার সুখ-স্বচ্ছন্দে চলে, স্ত্রী পুরুষে উভয়েই তদ্বিষয়ে মনোযোগী থাকিতেন। রাধামতি বাল্যকালাবধি পিতা-মাতার এইরূপ আদরের সামগ্রী হওয়ায়, চিরকাল এই ভাবেই যাপিত হইবে, বোধ হয় মনে মনে অনুমান করিয়াছিল। এই নিমিত্তই গৃহকার্য্যের প্রতি তাহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না; সে সদা সর্ব্বদা আপনার বিলাসভোগেই সংযতা থাকিত। কিরূপ বেশভূষায় লোকের নিকট আদরিতা হইবে, কিরূপ করিলে লোকে তাহার রূপের প্রশংসা করিবে, এই সকল চিন্তায় দিবা-যামিনী চিন্তিতা থাকিত। সুতরাং রমণী গৃহকার্য্যে এককালে অকর্ম্মণ্যা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কার্য্যের মধ্যে সুমতির সহিত খেলা ও গল্প মাত্র ছিল।

সন্তানের কেহ নিন্দা করিলে পিতা-মাতার প্রাণে বজ্রশেল সম বিদ্ধ হইতে থাকে। সন্তান সন্ততি লোকের নিকট কিরূপে সুখ্যাতি লাভ করিবে, জনক জননী তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা উৎসুক থাকেন। অধিকন্তু পুত্র কন্যা গৃহে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলেও তাহা সাধারণের নিকট অপ্রকাশ রাখেন। রাধামতির সংসারে কাজের মধ্যে আহার ও বেশ বিন্যাস; মাতা তাহাকে সংসার ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিতে সচেষ্টিতা থাকিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পিতা মাতা সময়ে সময়ে যে পুত্র কন্যার দোষ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠেন, পরিণামে তাহাতেই শুভফল উৎপন্ন হইয়া থাকে; নতুবা তাঁহাদের অভি-

ন্যায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সন্তান সন্ততিকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অবশ্য পিতা মাতা যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, তাঁহারা আপনাদিগের মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়াও পুত্র কন্যার সুখ সম্পাদন ও মঙ্গল সাধনে সযত্ন থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে সেই পুত্র কন্যার দুরবস্থার পরিসীমা থাকে না। রাধামতি যদ্যপি বাল্যকালাবধি সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিত, তাহার জননীর উপদেশ মত কার্য্যের অনুগামিনী হইত, তাহা হইলে আর এক্ষণে শ্বশুরালয়ে যাইয়া কাজ কর্ম্মের কারণ গুরুজনের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত না। অধিকন্তু রাধামতি বাল্যকালাবধি আদরের ধন, এক্ষণে ভর্ত্তৃ-গৃহে যাইয়া অধীন ভাবে দিনাতিপাত করা তাহার পক্ষে কষ্টজনক হইয়াছিল। পিতার সংসারে যে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে রাধামতির মনোবৃত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; যেহেতু তাহার বেশ ভূষা ও আহারাদি কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অভাব উপ-স্থিত হয় নাই।

সংসারের দৈনন্দিন ঘটনা-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া যে ব্যক্তি কিছুকাল যাপন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সাংসারিক বিষয় কর্ম্ম সহজ বোধগম্য। অভাগিনী রাধামতি সংসার সম্বন্ধে এককালে অকর্ম্মণ্যা। যদি শিশুকালাবধি মাতাকে আদর্শ গ্রহণ করিয়া গৃহকার্য্যে মনোযোগী হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে পতি-গৃহে যাইয়া মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতে হইত না।

রাধামতির শ্বশুরালয়ে সুখ্যাতি হয় নাই, জনক জননী ইহা জ্ঞাত হইয়াও তনয়াকে কোন কথা বলেন নাই; যেহেতু জীবন সর্ব্বস্ব ধন একমাত্র দুহিতা রাধামতির মনে দুঃখের সঞ্চার হইবে!

লোকের অবস্থা চিরকাল একভাবে থাকে না, দেখিতে দেখিতে বক্কেশ্বরের পুনরায় দুঃখের সঞ্চার হইল। কমলা-চঞ্চলা, তাঁহার গতিবিধি একস্থানে সমভাবে চিরকাল স্থিত নহে। যে ব্যক্তি উন্নতির অবস্থায় আপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারই মঙ্গল ঘটিয়া থাকে; নতুবা নিশ্চয়ই কার্য্যজনিত ফল ভোগ করিতে হয়। জগদীশ্বর যে কাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বক্কেশ্বরের দুঃখে সুখ সম্মিলন করিয়াছিলেন, সে বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না করিলে, বুঝিবার সাধ্য কি? রাধামতির জননী একান্ত পতিপরায়ণা, পতির যাহাতে মনস্তুষ্টি হয়, স্বামী যে বিষয়ে সুখী থাকেন, সদত তদ্বিষয়ে যত্নবতী। দিনান্তে আহার করিয়াও পতির কৃতাপরাধের কারণ. তিনি ক্ষণেকমাত্র তাঁহার প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই। সংসারের কিরূপে দুঃখ ঘুচিবে, কি উপায়ে তিনি পতি ও কন্যার অভাব মোচন করিবেন, অনুক্ষণ সেই সমস্ত ভাবনাই তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে জাগরিত থাকিত। তিনি স্বামীর কুচরিত্র বশতঃ নিতান্ত দীনাবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াও জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি রাখিয়াছিলেন এবং কায়মনে পতি ও কন্যার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন;

বিধাতাও তাঁহার সদাচারে মোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন ; তজ্জন্যই বকেশ্বরের দুঃখের দিন ঘুচিয়া সুখোদয় হইয়াছিল। কিন্তু স্বভাব দোষে পুনরায় তাঁহার বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইল, সতী নারীর আর ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। সাধক পরমেশ্বরের নিদয়-সদয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কমলা জানিতে পারিলেন যে, একবার উন্নতির অবস্থা হইতে পতন হইয়া পুনঃ যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কার্য্যদোষে এক্ষণে দিনে দিনে যে হীনাবস্থা হইতেছে, জীবনে এ অবস্থার আর পরিবর্ত্তন ঘটিবে না ; উত্তরোত্তর অধোমুখেই ধাবিত হইবে। তিনি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে নিয়োজিতা আছেন বটে, কিন্তু গৃহকার্য্যের প্রতি আর পূর্ব্বের মত আস্থা নাই, এক্ষণে স্বামী ও দুহিতা জীবিত থাকিতে থাকিতে তাঁহার মৃত্যু হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন।

দয়াময় ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ! যে যথায় তাঁহার পতিতপাবন নাম স্মরণ করিয়া বিলাপোক্তি প্রয়োগ করে, সমুদায়ই তিনি শুনি[illegible] তাহার প্রার্থনানুসারে কার্য্য করেন। সংসারে পাপের স্রোত অবিরত প্রবাহিত, একটী জীবের ধর্ম্মাচরণে মুগ্ধ হইয়া দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার পরিবারবর্গের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, কিন্তু পুনঃপুনঃ তৎপরিবারবর্গ ভ্রম-পথের পথিক হইয়া ধাবমান হইলে, তাহাদিগকে উদ্ধারের কারণ আর তাঁহার কৃপা থাকে না। তথাচ যে ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাকে পাপসংসর্গ হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান

হন। যে ব্যক্তি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সৃজনকর্ত্তা, যাঁহার প্রতাপে রবি শশী প্রতিদিন নিয়মিতপথে বিচরণ করিয়া ভববাসীর সুখ সম্পাদন করিতেছে, সেই অনন্ত অচিন্ত্য বিধাতার অলৌকিক শক্তি! তিনি ভক্তের দুঃখ কদাচ সহ্য করিতে পারেন না, প্রকৃত ভক্তের মর্ম্মবেদনা তাঁহার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতে থাকে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দয়াময় হরির অলৌকিক কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাধামতির জননী হিন্দু-ললনার উজ্জ্বলমণি, তিনি সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়াও ধর্ম্মপথ হইতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিতা হন নাই। এক্ষণে দয়াময় হরি তাঁহাকে চিরকাল দুঃখে যাপন করিতে দেখিয়া আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন, না। আপনার দিব্যধামে তাঁহাকে স্থান দিবার অভিপ্রায় করিলেন; আদেশমাত্রে দেবদূত বিসূচিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বক্কেশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিল। ধর্ম্ম-জীবন—কোমল প্রকৃতি, উদারমতি ও ছলনাশূন্য! সেই প্রশান্ত হৃদয়েই দেবদূত আশ্রয় করিল। গৃহস্থ অন্যান্য পাপাত্মাদিগের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল না। সাধ্বীসতী পূর্ব্ব হইতেই সংসারের প্রতি বীতানুরাগিণী হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে পীড়া হইয়াছিল, তাহা হইতেও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নাই, তাহাতে অকস্মাৎ বিসূ-চিকা রোগাক্রান্তা হইয়া এককালে শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শয্যাশায়িনী হইলেন। তাঁহার দুইবার ভেদ ও বমন হইয়াছে, তথাপি স্বামী বা কন্যা, কাহারও নিকট কোন

কথা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু বিসূচিকারোগের বিকৃত গতি, ক্ষণেকে প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার এই ভেদ ও বমনের পরক্ষণেই হস্ত পদাদির সঞ্চালন শক্তির রোধ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হস্ত ও পাদদেশে খিল ধরিতেছে। তিনি তখনও মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যিক কষ্ট যদিও প্রকাশ পাইল বটে—তথাচ আভ্যন্তরিক ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য আজীবন করিয়া আসিয়াছেন, কদাচ ধর্ম্ম-বহির্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে মৃত্যু উপাদেয়। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া, তাঁহার অন্তরাত্মা অচিরে ঈশ্বর সমীপে নীত হইবে অনুভব করিয়া, তিনি প্রীতি-সাগরে ভাসমান হইতে থাকেন! এক্ষণে বঙ্কেশ্বরের সহধর্ম্মিণীর সেই আনন্দের দিন উপস্থিত হইয়াছে, তিনি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সেই দিব্যস্থানে যাইবার কারণ আশা-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চলৎশক্তিহীনা স্ত্রীকে শয্যায় শায়িতা দেখিয়া, বঙ্কেশ্বরের মনোবিকার উপস্থিত হইল। তখনও যে গৃহলক্ষ্মী অভাগা বঙ্কেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া জন্মের মত চলিয়া যাইবে, তাঁহার হৃদয়ে সে ধারণার সূত্রপাতও হয় নাই; পত্নীর মুখে পীড়ার কথা শুনিয়া, সত্বর জনৈক ভৈষজ্য-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। পতিব্রতা, স্বামী গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন

করিতেছেন, একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাঁহার কথা কহিবার শক্তি এককালে লোপ পাইয়াছে। রাধামতি এক্ষণে পূর্ণযৌবনা; কিন্তু বিষয় কার্য্যে অপটু। মাতাঠাকুরাণীর পীড়া যে উৎকট ভাব ধারণ করিয়াছে, সে বিবেচনা আদৌ তাহার হয় নাই। দুই একবার জননীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিল, কিন্তু তাহাতেও স্থির হইয়া বসিতে পারিল না। চঞ্চলস্বভাবা ক্ষণকাল মাতৃসমীপে থাকিয়াই গৃহ হইতে আপনার গৃহে চলিয়া গেল। অভাগিনী পতিপ্রাণা কামিনী একাকিনী পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গত হইল। বক্রেশ্বর জনৈক চিকিৎসক লইয়া বাটীতে আসিলেন, তৎকালে রোগ সঙ্কট অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। চিকিৎসক রাধামতির জননীর পীড়া সঙ্কটাপন্ন স্থির জানিয়া কোনরূপ ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতা ও কন্যার হৃদয়ে তখন শোকের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। তাহারা যে উভয়ে সংসারের গ্লানি স্বরূপ এবং একমাত্র উক্ত গৃহিণী দ্বারাই সুখ-দুঃখে সংসারের সকল কার্য্য সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের সেই চৈতন্য হইল; কিন্তু সে আক্ষেপ দূর করিবার আর সময় নাই! রাধামতির জননী যে সংসারে এক দিন মাত্রও সুখে কাটাইতে পারেন নাই, নিয়তই ভাবনা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং কি প্রকারে স্বামী ও কন্যার কোন বিষয়ে অভাব উপস্থিত না হয়—অহোরাত্র চিন্তা করিতেন, এক্ষণে সেই বিগত

ঘটনাবলী তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইল। কিন্তু সময়ে কিছুই করিতে পারেন নাই, একদণ্ড মাত্র তাঁহাকে সুখী করেন নাই—এই সকল চিন্তায় তাঁহারা মৌন-ভাব ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাধামতির জননীর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণ ভাব ধারণ করিল। নাড়ী পূর্ব্বেই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়া ছিল, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর-ভাবে বহিতে লাগিল, নয়ন-যুগলের প্রান্তদেশ হইতে জলবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। পিতা ও তনয়া কমলার এই ভাব দেখিয়া হৃদয়োদ্বেগ শান্ত করিতে অক্ষম হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তৎকালে কেহই জাগরিত ছিল না। ত্রিযামা গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলবাসী জীবের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। অর্দ্ধ জগৎ নিস্তব্ধমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে কেবলমাত্র পেচক, শৃগাল প্রভৃতি নিশাচর-দিগের বিকট চীৎকার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল; একে নিশাকালে ধরাতল তিমিরাবৃত, তাহাতে গগন-ভাগেও শশী বিকশিত হয় নাই; একমাত্র তারকাদল আকাশে বিকাশ হইয়া, মৃদুমন্দ কিরণধারা ভূলোকে বিকীর্ণ করিয়া আলোক প্রদান করিতে ছিল। পথ ঘাট লোক-শূন্য, জনমানবের সমাগম নাই; যে দিকেই দৃষ্টিপাত হয়—সমুদয় অন্ধকারময়! সম্মুখস্থ বৃক্ষ লতাদি সমূহে খদ্যোতপুঞ্জ মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া যেন হীরকের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু

সে রশ্মি ক্ষণস্থায়ী; এইমাত্র প্রতিভাত হইল, পরক্ষণে আর নাই! পিতা ও কন্যা পীড়িতার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইতে লাগিলেন। রোগীর পিপাসা বৃদ্ধি হইল। রাধামতি জননীর পাদদেশে উপবেশন করিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র চামচ করিয়া মুখে জল প্রদান করিতেছে। বিসূচিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পীড়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন ভাব ধারণ করিয়া থাকে, কখন বা কমলা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা পাইয়া পুনরায় সজোরে শয়নোপরি শায়িতা হইতেছেন, কখন বা গাত্রদাহে অস্থির হইয়া মৃত্তিকা ভাগে আশ্রয় লইবার চেষ্টা পাইতেছেন। পিতা ও কন্যা রোগীর নিকট নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে সেই পরম দয়ালু রায় মহাশয় বক্কেশ্বরের বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটনের নিমিত্ত বক্কেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। বক্কেশ্বর প্রথমতঃ তাঁহার স্বর আদৌ বুঝিতে না পারিয়া অপেক্ষা করিতে ছিল। অনন্তর বহির্দ্বারে পুনঃপুনঃ দরজা খুলিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে, সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইয়া ত্রস্তভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি মাদক দ্রব্য সেবনের উপাসক হইলেও পতিপ্রাণা কামিনীর স্বভাব সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে সেই সরল হৃদয়া, পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর আসন্ন মৃত্যু দর্শনে এককালে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আশাভরসা সমুদয়ই যে তাঁহার গৃহিণী এবং সেই সতী-

লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ইহ সংসার হইতে প্রস্থান করিতেছে, আর ইহজীবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; সংসারের সকল সুখ এককালে ঘুচিয়া যাইবে, এইরূপ ভাবনায় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বহির্দ্বারে যাইবার সময় অকস্মাৎ অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপ হইতে নিম্নভাগে পতিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পদে গুরুতর আঘাত লাগিল, কিন্তু তখন নিজের শরীরের প্রতি আর লক্ষ্য নাই। যদি কোন উপায়ে পতিপ্রাণা কামিনীর জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক হয়; নতুবা আর অসার দেহভার সংরক্ষণের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, এই ভাবিয়াই দারুণ আঘাতকে আঘাত জ্ঞান না করিয়া দ্বারোদ্ঘাটনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন এবং অতিকষ্টে দরজা খুলিয়া দিয়াই পরমবন্ধু রায়মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন। রায়মহাশয় জনৈক ভৃত্য লইয়া আসিয়াছিলেন, বক্কেশ্বর সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যের হস্তে একটী লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, তাঁহারা বাটীতে প্রবেশ মাত্রেই ভৃত্য আলো লইয়া অগ্রসর হইল। দ্বারকানাথ বক্কেশ্বর সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং যাইতে যাইতে বক্কেশ্বরকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কথায় কথায় রাধামতির জননীর মৃত্যু আসন্ন জ্ঞাত হইয়া এককালে হতাশ হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে গমনকালে যে স্থান হইতে বক্কেশ্বর পতিত হইয়া পাদদেশে আঘাত লাগাইয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই-

লেন। অনন্তর যে গৃহে পতিব্রতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, সেই গৃহে উদারচিত্ত রায় মহাশয় প্রবেশ করিলেন। পতিগত-প্রাণা কামিনী রায় মহাশয়কে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ একবার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ তাঁহার মলিন বদনে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল এবং তিনি যে অপেক্ষাকৃত পীড়ার যাতনা হইতে এক্ষণে কিঞ্চিৎ উপশম লাভ করিয়াছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ পাইল! কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে বিকৃত কণ্ঠস্বর ব্যতিরেকে তাঁহার বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা নাই। তিনি একবার মাত্র রায় মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া রাধামতি ও স্বামীর প্রতি তাকাইয়া, পুনরায় তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিলে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারি-ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই শোক-বিদারক দৃশ্য দর্শনে কোমল-হৃদয় রায়-মহাশয়ের হৃদয়ের শান্তি-ভঙ্গ হইল। তাঁহারও নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর এই ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে, অকস্মাৎ রাধামতির জননীর মুখ হইতে 'গ—ঙ্গা' এই কথাটী অতিকষ্টে অস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হইল। বুদ্ধিমান রায় মহাশয় ধর্ম্ম-পরায়ণা কমলার আসন্ন-কাল উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, পারলৌকিক মঙ্গল কামনায়—রোগী গঙ্গায় যাইতে বাসনা করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন।

সাধুজীবনের উদ্দেশ্য কদাচ বিফল হয় না, তাঁহার

সে কার্য্য স্বীয় সাধ্যাতীত হইলেও ভগবান সংঘটন করাইয়া দেন। পতিব্রতা এ নশ্বর দেহ জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জন দিবেন, গঙ্গার পবিত্র জলে অন্তরাত্মা ধৌত করিয়া ঈশ্বর-পদে বিলীন হইবেন। ভক্তের অভিপ্রায় ভগবান শ্রবণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। রাধামতির জননীর মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইতে না হইতে, বঙ্কেশ্বর তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার কথা রায় মহাশয়ের কর্ণগোচর করিলেন, কিন্তু রায় মহাশয় কমলার কথাতেই তিনি যে গঙ্গাতটে যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্কেশ্বরের আকিঞ্চন জানিয়া তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

কলিকাতা সহরে কোন জিনিসেরই অভাব নাই, অর্থ ব্যয় করিলে সকল অভাবই মোচন হইয়া থাকে। কিন্তু এ যে পল্লীগ্রাম, গঙ্গাতটে লইয়া যাইবার জন্য খাটের আবশ্যক হইয়াছে, বাঁশ কাটিয়া খাট প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে; তাহাতে গৃহে অপর কোন লোক জন নাই! রায় মহাশয় অবিলম্বে আপনার বাটীর দ্বারবানের শয়ন করিবার যে খাটিয়াখানি ছিল, সেইখানি আনিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। অনুচর আজ্ঞামাত্র তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক বাটীতে যাইয়া খাট লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে প্রভুর কনিষ্ঠ-পুত্রের নয়নগোচর হইল। সে রজনী লম্পট-স্বভাব হেমেন্দ্রনাথ স্থানান্তরে বার-বিলাসিনী গৃহে মদিরা সেবনে অচেতনাবস্থায় পড়িয়া ছিল, নিশা অবসান

প্রায় জানিয়াই, এইমাত্র লোক-লজ্জাভয়ে সত্বর বেগে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—গমনোন্মুখ রাত্রিতে যুবক জাগরিত! হেমেন্দ্রনাথের এক্ষণে উন্মত্তভাব দূর হইয়া গিয়াছে, অকস্মাৎ অন্ধকারে একজন লোক এক খানা খাটিয়া ঘাড়ে করিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইয়া, তাহার মনে তস্কর বলিয়া সন্দেহ হইল। অনন্তর হেমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল "কে ও?" "কে ও?" ভৃত্য, প্রভুপুত্র অন্ধকারে তাহাকে জানিতে পারে নাই, অপরিচিত ব্যক্তি মনে করিয়া এরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে বুঝিয়া উত্তর করিল, "আমি গোপাল, বক্কেশ্বর বাবুর পরিবারকে গঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য খাট লইয়া যাইতেছি।" পিতা যে বক্কেশ্বর মিত্রের বাটীতে কান্নার শব্দ শুনিয়া তথায় গিয়াছেন, এ সকল কথা হেমেন্দ্রনাথ কিছুই জানিত না; অকস্মাৎ গোপালের মুখে রাধামতির জননীর মৃত্যুকথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল এবং কি পীড়া হইয়াছিল, কই পূর্ব্বে ত তাঁহার কোন রোগের কথা শুনি নাই! ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া ভৃত্যের নিকট সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইল।

হীনপ্রকৃতি হেমেন্দ্রনাথ স্বভাবদোষে সকলের নয়ন-শূল, পিতা তাহাকে দেখিতে পারেন না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার নাম শ্রবণ করিলে বিরক্ত হন। হেমেন্দ্র উপযুক্ত পিতার পুত্র হইয়াও নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত সকলের নিকট হতাদৃত; হতভাগ্য যুবক রমণীর প্রেম ও মদ্যপানই জীবনে

উপাদেয় ভাবিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়াছে! গৃহে রূপবতী প্রণয়িণী, স্বামীকে জীবনের সর্ব্বস্বধন জানিয়া দিবারাত্রি তাহার মঙ্গলকামনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি হেমেন্দ্রের বিষদৃষ্টি। যুবক বারবিলাসিনীর কৃত্রিম প্রণয় ও কাঁচপাত্রস্থ আলোহিত জলীয় পদার্থ—পিতা মাতা, ভ্রাতা, সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা আদরের বস্তু ভাবিয়াছে! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহার স্বভাব চরিত্র ভদ্রোপযুক্ত নহে। ভগ্নী সুমতির সহিত রাধামতি একত্রে খেলা করে, বালিকাহৃদয়ে প্রণয়ের সূত্রপাতও হয় নাই; তথাপি দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া হেমেন্দ্র তাহার রূপে মুগ্ধ এবং সময়ে সময়ে তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই! রাধামতি পূর্ণযৌবনা, তাহাতে এক্ষণে ঘোর বিপদে নিক্ষিপ্তা হইয়াছে, তাহার বিপদের কথা শুনিয়া লম্পটের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এতাবৎকাল যে রমণীর প্রণয়প্রার্থী হইয়া ব্যাকুলচিত্তে কালযাপন করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহাকে করগত করিবার উপায় হইয়াছে। অনন্তর ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে ভৃত্যের সহিত বঙ্কেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইল। রায় মহাশয় পুত্রকে তথায় দেখিতে পাইয়াই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে ভাব ঘুচিয়া গেল; যেহেতু উপস্থিত বিপদে দুই চারিজন যুবকের সহায়তা ব্যতিরেকে উদ্ধার সাধন কঠিন ব্যাপার! গোপাল যখন খাট

লইয়া বক্কেশ্বরের বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন গৃহিণীর অবস্থা অতি শোচনীয় ভাবে পরিণত হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বেই রায় মহাশয় পল্লীস্থ দুই তিন জন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। কমলার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়; তদনুসারে সকলে পরামর্শ করিয়া সত্বর গঙ্গাযাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। বক্কেশ্বরের জীবন-সর্ব্বস্ব ধন—সংসারের আশ্রয়, গৃহশূন্য করিয়া পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী তীরে নীতা হইলেন। পল্লীস্থ অপর দুইজন, হেমেন্দ্রনাথ ও ললিতচন্দ্র রাধামতির মাতাকে লইয়া অগ্রসর হইল। রায় মহাশয় বাটী হইতে ইতিপূর্ব্বেই আপনার কন্যা সুমতি, ললিত ও জনৈক পরিচারিকাকে বক্কেশ্বর বাবুর বাটীতে আনাইয়াছিলেন।

কিঞ্চিৎক্ষণ পূর্ব্বে বক্কেশ্বরের পাদদেশে আঘাত লাগিয়াছে, এক্ষণে তাহার উত্থানশক্তি রহিত বলিলেই হয়; তাহাতে সহধর্ম্মিণী সংসার পরিত্যাগ করিয়া জন্মের মত চলিয়া যাইতেছে, সে ব্যক্তি এককালে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে রায় মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে, রাধামতিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার কোন আবশ্যক নাই, তদনুসারে কন্যা ও দাসীকে রাধামতির নিকট রাখাইয়া দিলেন। কিন্তু বক্কেশ্বর ব্যতিরেকে গঙ্গাতীরের কার্য্যাদি কিরূপে সমাধা হইবে? সুতরাং বক্কেশ্বরকে লইয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে, তজ্জন্য তিনি আপনার গাড়ী প্রস্তুত করিয়া বক্কেশ্বরের বাটীর সম্মুখে আনিবার কথা

বলিয়া পাঠাইলেন। আদেশ মাত্র শকট প্রস্তুত হইয়া বঙ্কেশ্বরের বাটীর সম্মুখে নীত হইল। অনতিবিলম্বে রায় মহাশয় বঙ্কেশ্বর সমভিব্যাহারে শকটারোহণে গঙ্গা-তীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে রাধামতি, সুমতি ও জনৈক পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই রহিল না।

কালের কি বিচিত্র গতি! দণ্ডের পর দণ্ডে, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে, জগতের অংশ বিশেষ বা সমুদায় বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া থাকে—পরিবর্ত্তন জগতের অখণ্ডনীয় নিয়ম। এই ধরাতল অন্ধকারে আবৃত ছিল, সন্নিকটের বস্তু নয়নগোচর হইতে ছিল না; সমগ্র মেদিনী-মণ্ডলে ভীষণ নিস্তব্ধতা একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিল; পথ ঘাটে জন-মানবের সমাগম ছিল না। মধ্যে মধ্যে দুই একটা কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি নিশাচর পশুর বিকট চীৎকারমাত্র শ্রুতিগোচর হইতেছিল; দেখিতে দেখিতে এখন আর সময়ের সে ভাব নাই। ত্রিযামার তিমির বসনে ধরাতল আচ্ছাদিত থাকিলেও স্থানে স্থানে মনোরম ঈষৎ আলোকের আভা বিকাশ পাইতেছে। যদিও তাহা দিবার আলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, তথাচ এক্ষণে পূর্ব্বের মত অন্ধকার নাই; দূর হইতে বৃক্ষ, গৃহাদির আবছায়া মাত্র দেখা যাইতেছে। পৃথিবীস্থ জীবজন্তুগণ এখনও নীরব, নিস্পন্দভাবে অবস্থিত থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে বিহঙ্গকুলের কলকল-নাদে সেই চির-নিস্তব্ধতা লোপ পাইতেছে; এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ধরাতলের যেরূপ ভীষণ স্তম্ভিতভাব দৃষ্ট হইয়া

ছিল, এক্ষণে তাহার বিনিময়ে সজীবত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে! এখনও পূর্ব্বগগনে লোহিত বর্ণের রেখা সম্পূর্ণ অঙ্কিত হয় নাই, নিশামণির কিরণ-মালা এখনও ধরাতলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে; নক্ষত্র-নিকর গগনভাগে প্রভা পাইতেছে; খদ্যোতপুঞ্জ বৃক্ষ-লতাদিতে আশ্রয় লইয়া এখনও আলোক দান করিতেছে। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে দুই একটী বিহঙ্গম সুমধুর তানে পরস্পর আলাপ করিতেছে। মৃদু-মন্দ পবন প্রস্ফুটিত কুসুমদামের সুরভিরাশি স্থানে স্থানে বহন করিতেছে। উষার প্রাক্কালে প্রকৃতি রাণী সুচারু-বেশে সজ্জিতা! যে দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, স্বভাব-সুন্দরীর মনোরম শোভা সন্দর্শনে হৃদয় পরিপ্লুত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমগগনে সুধাকর বিলীন হইলেন, করমালা নিষ্প্রভ হইল। তারকা-সমূহ আকাশভাগে মুখ লুকাইল, পশু-পক্ষীর কলকল-রবে জগৎ প্রতিধ্বনিত হইল, প্রকৃতি সুন্দরীর বদনমণ্ডলে যেন ঈষৎ হাসি বিকাশ পাইল; পূর্ব্বগগনে রঞ্জিত লোহিত বর্ণ উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হইল! ধরা-তল রজনীযোগে স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছিল, জীবজন্তু জাগরিত হওয়ায় পুনরায় কোলাহলে পূর্ণ হইল। অরুণ-দেব্ দিব্যমূর্ত্তিতে আকাশভাগে বিকসিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাবাহী রশ্মি-জাল মেদিনী-গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইল। নবালোকে জীবের যেন নবজীবন লাভ হইল।

কমলাকে গঙ্গায় দেওয়া বাহকদিগের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহারা প্রাণপণে সত্বরবেগে আসিয়া উষার প্রাক্কালেই গঙ্গাতটে উপনীত হইল। ইতিপূর্ব্বে পতিব্রতার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, বাহকগণ তাঁহাকে হুগলির ঘাটে লইয়া আসিবামাত্র অপেক্ষাকৃত তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। ব্যাধি যেন তাঁহার শরীরে আদৌ নাই, তিনি গঙ্গাভিমুখে বদন ফিরাইয়া যোড়করে নমস্কার করিলেন। ব্রহ্মমূর্ত্তিতে দিনমণি প্রকাশ পাইয়াছেন, সমস্ত জগৎ আলোকে পুলকিত; কমলাও যেন অন্যান্য লোকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রায়মহাশয়ও বঙ্কেশ্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। কমলার অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন দর্শনে তাঁহাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। হেমেন্দ্র ও অন্যান্য লোক, যাহারা কমলাকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সকলে একত্র মিলিত হইয়া অনতিদূরে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ সহকারে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। রায় মহাশয় ও বঙ্কেশ্বর ব্যগ্রচিত্তে কমলার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন। এই ভাবে ক্ষণকাল যাপিত হইল। দেবদূত ব্যাধিচ্ছলে কমলার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া কদাচ সম্ভব নহে! অকস্মাৎ কমলার শ্বাসরোধ হইল, নয়নযুগল নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। গোলাপ পুষ্প সদৃশ গণ্ডস্থলে পূর্ব্ব হইতে নীলবর্ণের আভা পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত গাঢ়ভাব লক্ষিত হইল। আর সে বদন-

মণ্ডলে পূর্ব্বের মত জ্যোতি নাই। রায় মহাশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, মৃত্যুকালে লোকের বাহ্যিক প্রক্রিয়াদি সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন। তিনি কমলার এই পরিবর্ত্তন দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; হেমেন্দ্র প্রভৃতি যাহারা বসিয়া স্থানান্তরে গল্প করিতেছিল, তাহাদিগকে তথায় আহ্বান করিলেন। আদেশমাত্র সকলে কমলা-সমীপে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ধীরে ধীরে গঙ্গার তট-দেশে লইয়া যাওয়া হইল। কমলার আর সংজ্ঞা নাই, গঙ্গা-জল স্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বঙ্কেশ্বর হতবুদ্ধি হইয়া মৃতা কমলার মুখপানে অনিমেষ লোচনে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, নেত্রদ্বয় হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সমস্ত সংসার তাঁহার পক্ষে শূন্যময় জ্ঞান হইল। দ্বারকানাথ সান্ত্বনা উদ্দেশে বন্ধুকে নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইতে লাগি-লেন। এদিকে হেমেন্দ্র ও অন্যান্য লোক কমলার সংকার-কার্য্য নির্ব্বাহের উদ্‌যোগ করিল। জন্মের মত সুখ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল জানিয়া, বঙ্কেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রানুসারে বঙ্কেশ্বরকেই পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর মুখাগ্নি করিতে হইল। তিনি স্বীয় হস্তে অগ্নি জ্বালিয়া প্রিয়তমার মুখে প্রদান করিতে যাইয়া এককালে এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পরিধেয় বস্ত্রের অগ্রভাগ অগ্নিস্পর্শে পুড়িয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চুলি জ্বলিল, বঙ্কেশ্বর উন্মাদের ন্যায় তাহার প্রতি অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়া রহিলেন। মুখে বাক্য নিঃস্বত

হইতেছে না, কিন্তু নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাঁহার বক্ষস্থল সিক্তিত করিতেছে। যথাসময়ে দাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল, সতীমূর্ত্তি ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইলেন; ইহসংসারে আর কমলার চিহ্ন-মাত্রও নাই! দ্বারকানাথ বন্ধুকে স্নানাদি করাইয়া আপনার শকটে করিয়া বাটী লইয়া গেলেন। হেমেন্দ্র, ললিত প্রভৃতি সকলে পদব্রজে বক্রেশ্বরের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

উদ্বিগ্নহৃদয়ে শান্তি নাই, আমোদের বস্তু নিকট পাইয়াও চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারিত হয় না। যে বিষয়ের নিমিত্ত মন উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার শুভাশুভ সংঘটন হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি, এরূপ উদ্বিগ্ন সময়ে যদি কেহ কোন বিষয়ে উপহাস করে, তাহাতেও বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে। আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, জীবনের প্রিয় সামগ্রী হইলেও সেই সমুদায় উপভোগে তাদৃশ আসক্তি থাকে না। এরূপ সময়ে লোকের কোলাহল-শূন্য নির্জ্জন প্রদেশই অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ! গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া যতই সেই আকা-ঙ্ক্ষিত বিষয় চিন্তায় হৃদয় অভিভূত হইতে থাকে, ততই যেন সেই চঞ্চলচিত্তের শান্তি! জননীকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে, জন্মের মত তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, সংসারে বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট জ্ঞাপন করিয়া পরিতৃপ্তা হইবেন? প্রাণাপেক্ষা

প্রিয়তম ভাবে কে আর তাহার প্রতি করুণনয়নে দৃষ্টি-পাত করিবে? ভোগ-বিলাসে গর্ভধারিণীর মত কে আর তাহার যত্ন করিবে? ক্ষুধায় আহার, পীড়িতাবস্থায় শুশ্রূষা, আপনার প্রাণকেও তুচ্ছ ভাবিয়া স্নেহময়ী জননীর তুল্য কে আর তাহাকে স্নেহ করিবে—রাধামতি এই সকল বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এদিকে তাহার নয়নযুগল হইতে বিগলিত অশ্রুধারায় ধরাতল ভিজিয়া যাইতেছে; যুবতী এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় শোক-বিহ্বল-চিত্তে বসিয়া রোদন করিতেছে। সুখবিলাসিনীর শরীরের প্রতি এক্ষণে আর যত্ন নাই, ধূলারাশিতে লুণ্ঠিত কুন্তলভাগ ধূসরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানির স্থান স্থান কর্দ্দমাক্ত; সে সকলের প্রতি এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। এক মনে বসিয়া পরমারাধ্য জননীর প্রেম-ময়ী মূর্ত্তি ভাবিতেছে এবং মাতার সেবা শুশ্রূষা তাহার দ্বারা কিছুমাত্র হয় নাই, অভাগিনী দিনেকের নিমিত্তও তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারে নাই—উল্লেখ করিয়া রোদন করিতেছে। সুমতি রাধামতির বাল্যসখী, চিরকাল সহোদরার মত উভয়ে উভয়ের প্রতি ব্যবহার করিয়াছে; এক্ষণে রাধামতির নিকটে বসিয়া তাহার শোকাতুর চিত্তের সান্ত্বনা প্রদানে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। কামিনী বিপদকালে হতবুদ্ধি হইয়া গৃহান্তরে বসিয়া আছে; বহুকালাবধি এক প্রভুর অন্নে প্রতিপালিতা বৃদ্ধাও গৃহিণীর কারণ এক্ষণে ভগ্নহৃদয়ে বিলাপ করিতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ললিতচন্দ্র দে দ্বারকানাথ রায়ের জনৈক কর্ম্মচারী; রায় মহাশয়ের নিকট মোহরারের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষায় আদৌ মনোযোগী হয় নাই, তাহাতে পিতার তাদৃশ সঙ্গতি না থাকায়, অল্প বয়সেই লেখা পড়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। দুই এক বৎসর অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অতিবাহিত হইলে, অবশেষে জনৈক ভদ্রলোকের অনুরোধে রায় মহাশয় তাহাকে মাসিক আট টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ললিতচন্দ্র দেখিতে কৃষ্ণাকৃতি, বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চবিংশতি মাত্র, বিষয় কার্য্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও বাজারের খরিদ বিক্রয় কার্য্যে যুবক বিশেষ পারদর্শী ছিল; তাহাতেই তাহার সময়ে সময়ে পাঁচ সাত টাকা অতিরিক্ত লাভ হইত। কিন্তু ললিতচন্দ্র উদারপ্রকৃতি পুরুষের আশ্রয় পাইয়াও কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারে নাই, কুসুমে কীট সংযোগ হইলে যেরূপ পুষ্প স্বাভাবিক শোভায় কদাচ বিকসিত হয় না, সেইরূপ ললিতচন্দ্রের দুশ্চরিত্র বশতঃ শ্রীবৃদ্ধির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। দরিদ্র-সন্তান দুঃখে কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করিলে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে; কিন্তু সেই অর্থ অসৎ কার্য্যে ব্যয়

করিলে, তাহার আর উন্নতি কোথায়? ললিতচন্দ্র, বাবুর কনিষ্ঠপুত্র সুরা ও বেশ্যায় আসক্ত, আমোদ প্রমোদে কাল-যাপন করে দেখিয়া, তাহারই সহিত মিলিয়া মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। কিন্তু সেই সহবাস হইতেই তাহার জীবনের উন্নতির আশা চিরদিনের নিমিত্ত নির্ম্মূলিত হইল। হতভাগ্য ললিত কাজ-কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী না হইয়া, অসার আমোদ প্রমোদই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় জ্ঞান করিয়া, তাহাতেই আসক্ত হইল। রায় মহাশয় তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন এবং একাদিক্রমে চারি পাঁচ বৎসর ললিতচন্দ্র তাঁহার নিকট কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, দুষ্টস্বভাব জন্য তিরস্কার করিয়াও কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। ললিতচন্দ্র প্রভুর আদেশানুসারে সুমতি ও পরিচারিকাকে বক্কেশ্বরের বাটীতে লইয়া আসিবামাত্র দ্বারকানাথ তাহাকে হেমেন্দ্র সমভিব্যাহারে রাধামতির জননীকে গঙ্গাতটে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছিলনে. বাবুর কথায় ললিত ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে।

সুমতি ও রায়মহাশয়ের পরিচারিকা বক্কেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ কামিনী ভূতলশায়িনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে দেখিতে পাইল, তাহার সহিত দুই একটী কথা কহিয়াই রাধামতির অনুসন্ধানে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক অনুসন্ধানের পরে রাধামতি তাহাদিগের নয়নগোচর হইল। সুমতি প্রিয়সখী রাধামতির মুখের প্রতি বারেক

মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অধোবদনা হইলেন। বাল্যকালাবধি রাধামতির সহিত সুমতির আলাপ পরিচয়; একের সুখ দুঃখে অপরে সমভাগী। রাধামতি জননীর শোকে একান্ত কাতরা. নয়নযুগল অশ্রুজলেপূর্ণ, বদনমণ্ডল আরক্তিম—দেখিলে উন্মাদিনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুমতি প্রিয়সখীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়া, তাঁহার নয়নাসারের সহিত আপনার অশ্রু মিলিত করিলেন। বহুক্ষণ রোদনের পর, সুমতি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থা হইয়া রাধামতিকে শান্ত্বনা করিতে সযত্না হইলেন। তিনি বলিলেন—সংসার অনিত্য, পিতা মাতা কাহারও চিরস্থায়ী নহে; জন্ম হইলেই মৃত্যু নির্ণীত রহিয়াছে; পরিতাপ বৃথা, মাতার সহিত ইহ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনার আত্মীয় স্বজন লইয়া লোক ইহ সংসারে আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে সত্য বটে, কিন্তু তাহা কয় দিনের জন্য? জগতে বিরহতাপে তাপিত হয় নাই, এমন কে আছে? এইরূপ নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে রাধামতির শোকাবেগ সম্বরণার্থ সুমতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারের দৈনন্দিন ঘটনা-স্রোতে, হাস্য রোদন অবিরত জীবের হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া থাকে। রাধামতি একাকিনী জননীর বিরহ জনিত শোকে নিমগ্না; যতই মাতার বিষয়ে চিন্তা করে, উত্তরোত্তর তাহার শোক-বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সুমতির পুনঃ পুনঃ উপদেশ বাক্যে যুবতী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল; কিন্তু নবীন শোক এককালে বিদূরিত হইবার নহে। রাধামতি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। যে সুমতি রাধামতির জীবন-সঙ্গিনী, ক্ষণেক অদর্শনে যাহার জন্য যুবতী উৎকণ্ঠিতা; বাল্যকালাবধি যাহার সহিত একত্র আহার বিহার; মনোগত অভিপ্রায় যাঁহার নিকটে অকপট চিত্তে প্রকাশ করিয়াছে আজি সেই সুমতি রাধামতিকে শান্তনা কারণ সচেষ্টিতা— তথাপি তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইতেছে না। অপার শোকসাগরে নিমগ্না থাকিয়া রাধামতি সময় অতিবাহিত করিতেছে। সুমতি প্রিয়সখীর নিকটে বসিয়া আছেন, পরস্পর কথাবার্ত্তা নাই; উভয়েই নয়নজলে ধরাতল সিক্তি করিতেছেন। এমন সময়ে রায় মহাশয় ও বক্রেশ্বর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। অনতিবিলম্বে হেমেন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগণও আসিয়া পৌছিল; তাহাদের আগমনে বাটীতে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদনের রোল উঠিল। সকলেই যেন কমলার শোকে অভিভূত, ম্রিয়মাণ;—কাহারও মুখে একটী কথা নাই, সকলেই নিস্পন্দ ও সজল নয়ন! রোদন-ধ্বনিতে বক্রেশ্বরের বাটী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুই একজনের অশ্রুধারা বিগলিত না হইলেও কমলার সচ্চরিত্রতা ও অন্যান্য সৎকার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিল। নিরানন্দ যেন পূর্ণ মূর্ত্তিতে তৎকালে মিত্রজা মহাশয়ের গৃহে

প্রবেশ করিয়াছে, সকলেই ক্ষুন্নমনে. অধোমুখে বসিয়া আছে। দ্বারকানাথ রায় বিজ্ঞ পুরুষ, ক্ষণকাল অন্যান্য লোকের মত পরিতাপ করিয়া, যে সকল লোক সৎকার করিতে গঙ্গাতীরে যাইয়া ছিল, গোপালকে তাহাদিগের জল খাবারের উদ্যোগ করিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞামাত্র তাহাদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। পল্লীস্থ যে দুই তিন জন ব্যক্তি কমলার সৎকার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা মিষ্টমুখ করিয়া যে যাহার গৃহে যাইল; রায় মহাশয় হেমেন্দ্রকেও বাটী পাঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে তথায় রায় মহাশয়, ললিত, গোপাল ও বক্কেশ্বর মাত্র উপস্থিত আছে। মিত্রজা মহাশয়ের বামপদে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, এক্ষণে ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িলেন; প্রিয়তমার বিরহ শোকে সে জ্বালা যন্ত্রণা তাঁহার এতক্ষণ উপলব্ধি হয় নাই। মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও কমলার কারণ দুঃখ করিতে ছিলেন, রায় মহাশয় বন্ধুর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, ললিতকে জনৈক চিকিৎসক আনিতে বলিয়া বন্ধুকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইলেন। রাধামতি তখনও মধ্যে মধ্যে বিলাপ করিতেছে, সুমতি পুনঃ পুনঃ প্রবোধিত করিয়াও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে রায় মহাশয়ের প্রবোধ বাক্যে রাধামতি স্নান করিয়া এক বাটী চিনিরজল পান করিল। রাধামতিকে সুস্থ দেখিয়া রায়মহাশয় মিত্রজাকে জল খাইবার নিমিত্ত

অনুরোধ করিলেন এবং উভয়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টসামগ্রী ভক্ষণ করিয়া বহির্বাটীতে আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে ললিতচন্দ্র জনৈক ডাক্তার সহ তথায় উপস্থিত হইল। চিকিৎসক বক্কেশ্বরের আহতস্থান পরীক্ষা করিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও দুই চারি দিবসের মধ্যেই বেদনার উপশম হইবে বলিয়া, দর্শনী গ্রহণানন্তর প্রস্থান করিলেন। বক্কেশ্বরের মনে এক্ষণে রাধামতির কারণ ভাবনার উদ্রেক হইয়াছে। রায়মহাশয় তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া জামাতা-গৃহে এই শোচনীয় সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করি-লেন। রায় মহাশয়ের যুক্তিমত বক্কেশ্বর রাধামতির শ্বশুর চন্দ্রনাথ বসুকে একখানি পত্র পাঠাইলেন।

সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যে কমলা এক-মাত্র বক্কেশ্বরেব অবলম্বন ছিল, যাহার সদাচারে দুঃখ কষ্টে পতিত হইয়াও মিত্রজা মহশয়ের এক দিনের নিমিত্ত কোন কষ্ট হয় নাই, আজ সেই গৃহলক্ষ্মী আর নাই; বক্কেশ্বরকে অনন্ত বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাতেও মিত্রজার সংসারের প্রতি আশক্তির হ্রাস হয় নাই। কি উপায়ে রাধামতির কোন কষ্ট না হয়, সংসারের কাজ কর্ম্ম চলিতে পারে, পতি-প্রাণা সহধর্ম্মিণীর শোক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি চিন্তিত হইলেন। রায় মহাশয় রাধামতি ও বক্কেশ্বরের আহারাদির যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া গোপালকে তথায় রাখিয়া দাসীসহ সুমতিকে লইয়া গৃহে যাইলেন। বকেশ্বর ও রাধামতি একত্রে বসিয়া

কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কামিনী রাধামতির শ্বশুরালয়ে পত্র লইয়া গিয়াছে, ললিত ডাক্তারের অনতিবিলম্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের সংসারের সহিত সম্বন্ধ। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া সুখে দুঃখে দিনাতিপাত হইয়া থাকে। নয়ন মুদিলে আর কেহই নাই, সংসারের সহিত যে কিছু সম্বন্ধ এক কালে রহিত হইল! পরিবারবর্গ মৃত্যুকালে একবার শোকধ্বনি করিয়া উঠিল, হয়ত তাহাদিগের স্নেহমমতা প্রযুক্ত তাহার পরেও দুই দশদিন ম্লানভাবে যাপন করিল: কিন্তু ক্রমে সে শোকের হ্রাস হইয়া গেল! সময়ে সময়ে যদিও প্রিয়জনের বিরহ জনিত শোকে হৃদয় সন্তাপিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও ক্ষণ-স্থায়ী। যখন তাহার কথা মনে হয়, সেই সময়েই একবার আক্ষেপ করে; দুইদণ্ড পরে আর সে ভাব থাকে না। যদি লোকে প্রিয়জন বিরহে কাতর হইয়া বহুকাল শোকাচ্ছন্নাবস্থায় যাপন করিত, তাহা

হইলে সৃষ্টি-কর্ত্তার সংসার লোপ পাইত। বিধাতা জীবের অন্তরে যে মায়ামোহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই মায়াবিনী মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আদরের বস্তুকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া পুনরায় সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার পাতিতে প্রবৃত্ত হই।

বক্কেশ্বরের সহধর্ম্মিণী পতিগতপ্রাণা; স্বামীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া লোকে কমলাকে কত তিরস্কার করিয়াছে, কিন্তু সে তিরস্কার পতিপ্রাণা প্রশংসা ভাবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যাহাতে পতির মনে কোন প্রকারে কষ্টের উদ্রেক না হয়, সাধ্বী-সতী তদ্বিষয়ে সদত যত্নবতী ছিলেন। এক্ষণে সেই সতী-লক্ষ্মী কমলা গৃহশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বক্কেশ্বর আপনার অবস্থা সবিশেষ জানিয়াও দিনে দিনে তাহার কথা বিস্মৃত হইতেছেন। রাধামতি কমলার আদরের নিধি, একমাত্র মাতার স্নেহেই যুবতী আমোদ প্রমোদে এতাবৎ কাল যাপন করিয়াছে। সংসারে গৃহস্থালী-শিক্ষা রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য—কিন্তু রাধামতি জননীর স্নেহমমতায় এক দিনের নিমিত্তও সাংসারিক কাজ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে নাই; মাতা প্রাণপণে খাটিয়া কন্যার সুখ সম্পাদন করিয়াছিলেন। লোকে রাধামতির নিন্দা করিলে কমলার হৃদয়ে শক্তিশেল বিদ্ধ হইত। কন্যা মনঃক্ষুন্না হইবে—তিনি এই ভাবিয়া কখন রাধামতিকে এক দিনের নিমিত্তও তিরস্কার করেন নাই। এক্ষণে রাধামতি ইহসংসারে শান্তিসদন সেই স্নেহময়ী জননীকে জন্মের-

মত ভাগিরথী-সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছে, যে মাতার অকৃত্রিম প্রেম ব্যতীত তাহার জন্মাবধি এতাবৎকাল এক দিনও চলে নাই, আজি সেই জননীকে চিরকালের মত হারাইয়াছে; মনুষ্যের প্রাণ বড়ই কঠিন, শোক তাপ সকলই সহ্য হয়, তাই রাধামতি এখনও জীবিত!

দেখিতে দেখিতে আজ দুই দিবস গত হইল, কমলা ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পিতা ও কন্যা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কারণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া মৌন ভাবে ক্ষেপণ করিতেছে; পুনরায় সেই চিন্তা ত্যাগ করিয়া সাংসারিক ভাবনায় তাহাদিগকে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে। জীবনের সহিত দেহের যতকাল সংযোগ থাকে, অহোরাত্র আহার বিহার ও লোকাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। মাতা এক মাত্র অন্ধের নয়নমণি সর্ব্বস্বধন পুত্ররত্নকে কালের কঠোর হস্তে নিক্ষেপ করিয়াও সংসারে নিদারুণ পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। যে গেল সেই গেল; বিলাপ, আক্ষেপ, পরিতাপ ক্ষণকালের নিমিত্ত। এক যায় আর আসে, এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার চলিতেছে। ঈশ্বর জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যখন যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করিতেছেন, তদ্দণ্ডেই তাহা সাধিত হইতেছে। তাঁহার নিয়মের উল্লঙ্ঘন কখনই হইবে না। তিনি যাহা করিবেন, অবশ্যই তাহা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; এইমাত্র স্থির জানিয়া আমরা জীবনের প্রিয়তম বস্তুকেও জন্মের মত বিদায় দিয়া, দুইদিন পরে সে শোক তাপ

ভুলিয়া যাইতেছি। রাধামতি গৃহকার্য্যে এককালে অকর্ম্মণ্যা হইয়াও এক্ষণে যথাসাধ্য রন্ধনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছে; বক্রেশ্বর কন্যার সহায়তা করিতেছেন; এই ভাবে দিন অতিবাহিত হইতেছে। পিতা ও দুহিতা এক্ষণে কমলার শ্রাদ্ধশান্তি বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন, কয়েকটী ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে রাধামতি শুদ্ধা হইবে না. আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিবর্গকেও আমন্ত্রণ করিতে হইবে: আর দিন নাই, দেখিতে দেখিতে দুই দিবস কাটিয়া গেল। রাধামতিকে চতুর্থী করিতে হইবে; রাত্রি প্রভাতেই তৃতীয় দিবস—পর দিবস ক্রিয়া। নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপের আর সময় নাই। বক্রেশ্বর ও রাধামতি উভয়ে এই সকল কথার উত্থাপন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে সুদীর্ঘ সময় যাপন করিল। অবশেষে রায় মহাশয়ের পরামর্শানুসারে কার্য্য হইবে, স্থির হইল। ইতিমধ্যে খলসিনী হইতে কামিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে মিত্রজা মহাশয় জামাতা ও বৈবাহিকের শুভ সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, অন্যকার্য্যে মনযোগী হইলেন। রাধামতি কামিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

উদার প্রকৃতি দ্বারকানাথ আদালতে কার্য্যাদি সমাপন করিয়া গত দিবসও অপরাহ্নে বক্রেশ্বরের বাটীতে আসিয়াছিলেন, অদ্যও যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। মিত্রজা রায় মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার সহিত অন্যান্য দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিয়াই শ্রাদ্ধের বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রায় মহাশয় অবস্থা মতব্যয় করাই

বিধেয়, পরামর্শ দিয়া পল্লীস্থ অপর দুই এক জনকে তথায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কামিনী রায় মহাশয়ের আদেশ মত দুই জন প্রবীণ প্রতিবেশীকে প্রভুর বাটীতে আসিবার জন্য বলিয়া আসিল। মিত্রজা ও রায় মহাশয় একত্রে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন, তথায় আর কেহই নাই; এই সুযোগে রায় মহাশয় জামার পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বক্রেশ্বরের হস্তে প্রদান করিল। বক্রেশ্বর দশ টাকা হিসাবে পনর খানি নোট গুনিয়া রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দেড়শত টাকা কি করিব?" রায় মহাশয় বন্ধুর মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইতে না হইতে, মৌন ভাবে উত্তর করিলেন "এই টাকাতেই শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিতে হইবে।" রায় মহাশয়ের এরূপ বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া মিত্রজা অনিমেষ লোচনে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দ্বারকানাথ বন্ধুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন "ভাই বক্রেশ্বর! তুমি ইহার জন্য কিছু মাত্র বিচলিত হইও না, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি। তোমাতে আমাতে কিছুই প্রভেদ নাই; জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রাধামতি তোমার দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পতিপুত্র সহ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুক। অমাদিগের সখ্যতা যেন চিরকাল এই ভাবেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পতিপ্রাণা তোমার সহধর্ম্মিণী ইহসংসার ত্যাগ

করিয়া দিব্যধামে গিয়াছেন, তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত এই টাকা ব্যয় করিও।" বক্কেশ্বর রায়মহাশয়ের কথা শুনিয়া এককালে বিস্মৃত হইলেন; কন্যাভারগ্রস্থ হইয়া যখন অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও নিস্ফল হইয়াছিলেন, একমাত্র দ্বারকা নাথের আনুকূল্যেই সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন এবং উপস্থিত বিপদে তিনিই পুনরায় সহায়তা করিলেন; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি জগদীশ্বরের নিকট রায় মহাশয় ও তাঁহার সন্তান সন্ততির মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় মিত্রজার স্তুতিবাদে বিরক্ত বোধ করিলেন এবং তিনি কর্ত্তব্যকার্য্যই করিয়াছেন, ইহাতে আর প্রশংসার বিষয় কি আছে? এইরূপ বাক্যে মিত্রজা মহাশয়কে প্রবোধিত করিলেন।

রায় মহাশয় বক্কেশ্বর সহ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে পল্লীস্থ দুই জন বিজ্ঞ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। মিত্রজা তাঁহাদিগের সাদর সম্ভাষণানন্তর উপস্থিত ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা চারিজনে মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন যে, "তিলকাঞ্চন" করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে এবং পল্লীস্থ ব্রাহ্মণ, স্বজাতিবর্গ ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব মাত্র নিমন্ত্রণ করা যাইবে; তদনুসারে একখানি ফর্দ্দ করা হইল, রায়মহাশয় মিষ্টান্নের ভার গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে বক্কেশ্বর একখানি ঠিকাগাড়ী

ভাড়া করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বাগ্রে রাধামতির শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ করিতে যাইলেন। তথা হইতে আসিয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও পল্লীস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সময় কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, নিত্য নিয়মিত ভাবে আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। যখন যে কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাই ক্রমে কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। যে কমলা, বঙ্কেশ্বর ও রাধামতির জীবনের এক মাত্র অবলম্বন ছিলেন, আজ তিন দিবস সেই সাধ্বী সতী মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জীবদ্দশায় বঙ্কেশ্বর ও রাধামতি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অলস প্রকৃতি হইয়া দিনাতিপাত করিয়াছে। এই কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে যথাসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দুঃখে কষ্টে সংসার চালাইতেছে। লোকের উপর যতক্ষণ না কোন কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হয় না। যখন দেখিল যে সে কার্য্য তাহাকেই করিতে হইবে, অন্য কেহ তাহার জন্য সাহায্য করিবে না; তখন সে অনন্যোপায় হইয়া তৎসাধনের উপায় চিন্তনে অগ্রসর হয়। চেষ্টা ও উদ্যম থাকিলে জগতে কোন কার্য্যই দুরূহ বলিয়া জ্ঞান হয় না। উদ্যমশীল ব্যক্তি যে কোন উপায়েই হউক কার্য্যক্ষেত্রে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। রাধামতি ও বঙ্কেশ্বরের তাদৃশ উদ্যম ও চেষ্টা না থাকিলেও, দায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে কতক কতক

বিষয়ে সক্ষম হইতে হইয়াছিল। দিন কাহারও নিমিত্ত স্থায়ী নহে, উভয়ের কয়েক দিনই যোগেযাগে অতিবাহিত হইয়াছে। সংসারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন বস্তুর অভাবে আপনার অনিষ্ট হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লোক সহজে কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে না। যে বঙ্কেশ্বর ও রাধামতি একদিনের নিমিত্তও সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই, একমাত্র কমলার উপর নির্ভর করিয়া বিলাসভোগে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিয়াছে, আজি তাহারা উভয়েই সংসারী, শ্রাদ্ধক্রিয়ার কারণ ব্যস্ত; সাংসারিক অভাবের প্রতি এতদিনে তাহাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে, ইতি মধ্যেই কতক পরিমাণে গৃহস্থালীও বুঝিয়াছে। জগদীশ্বরই জীবের উপায় করিয়া দেন, তাঁহার অলৌকিক কৌশলে অক্ষম ব্যক্তিও সক্ষম হয়। এক্ষণে রাধামতি পিতার সহিত মিলিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বাটীতে অন্য কেহ গৃহিণী নাই যে তাহার সহায়তা করিবে। রায় মহাশয়ের আদেশ মত গোপাল এই কয়েক দিন মিত্তজা মহাশয়ের বাটীতেই আছে, মধ্যে মধ্যে ললিত আসিয়া বাজারের দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করে। দিন সংকীর্ণ, অদ্য সমস্ত উদ্যোগ না করিলে কল্য প্রভাতেই গোলযোগ বাধিবে। তাহাতে রায় মহাশয় বিবেচক ব্যক্তি, তিনি যাহা যাহা প্রয়োজন, সমুদায়ই বঙ্কেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রমে ক্রমে পাঠাইয়া দিতেছেন। এক্ষণে আর কমলার কারণ পরিতাপ করিবার সময় নাই; বঙ্কেশ্বর কন্যাসহ

গৃহস্থালী-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া সহধর্ম্মিণীর কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছে। দুই একস্থল হইতে অদ্যই আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া বক্কেশ্বরের গৃহে উপনীত হইয়াছে, যাহাতে তাহাদিগের কোন প্রকারে কষ্ট না হয়, এই সকল বিষয়ে মিত্রজা মহাশয়ের বিশেষ মনযোগ। বিশেষতঃ বক্কেশ্বর পায়ের ব্যথায় যথাইচ্ছা যাতায়াত করিতে অক্ষম হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ঔষধ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বেদনায় শরীর অস্থির। তথাপিও দেশাচার রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা লোকে যে নিন্দা করিবে; এই আশঙ্কায় আপনার প্রাণকে তুচ্ছ ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত। লোক জনে বাটীতে জনরব বৃদ্ধি হইয়াছে রায় মহাশয় নিজের বাটীতে কার্য্য উপস্থিত ভাবিয়া সবরবাহ করিতেছেন। সকলেই ব্যস্তভাবে কার্য্যে নিযুক্ত।

আজ কমলার আদ্য শ্রাদ্ধের দিন। রাধামতি জননীর চতুর্থী করিবে। চন্দ্রনাথ বসু পুত্র সমভিব্যাহারে বৈবাহিকের বাটীতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইয়াছেন। রায় মহাশয় রজনীর শেষ ভাগেই মিত্রজার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সতরঞ্চ, জাজিম প্রভৃতি বিছাইয়া বহির্ব্বাটীতে সভা সজ্জিত করিয়াছেন। যে পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শূন্য হইল. তাহাদিগেরই গেল; অন্যের তাহাতে ক্ষতি কি? প্রভাতের সূর্য্য গগনভাগে উদিত হইতে না হইতে, দরিদ্র অগ্রদানি, ভাট প্রভৃতি কতকগুলি অনাহুত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আগমনে বক্কেশ্বরের বহির্ব্বাটী পুরিয়া

গেল। শকুনি যেরূপ মৃতদেহের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় ; এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও সেইরূপ। লোকের সর্ব্বনাশে তাহাদিগের আনন্দ, শ্রাদ্ধশান্তি উপলক্ষে দান পাইব, এই আশয়ে তাহারা দিবারাত্রি কোথায় কে কাল-কবলে পতিত হইল, অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যথাসময়ে তিলক।ঞ্চন ব্যবস্থানুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল ; উপ-স্থিত ভাট ফকীরগণও যথাযথ বিদায় পাইল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ভোজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বের জলপান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আহারাদি হইবার পরে, রায়মহাশয় বক্কেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিলেন। চন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে আহারাদি করিয়া বৈঠক-খানায় বিরাম করিতে ছিলেন। ফণীন্দ্র বিদ্যানুরাগী যুবক, বাল্যকালাবধি পাঠাধ্যয়নেই সময় অতিবাহিত করি-য়াছে। আধুনিক যুবকদিগের মত না পড়িয়া সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন নাই ; তাহাতে তিনি নিরীহ প্রকৃতি ; কাহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা বা বিবাদ হাঙ্গাম বাধাইবার লোক নহেন। তিনিও আহারাদি করিয়া পিতার নিকটে বসিয়া আছেন। ললিত, হেমেন্দ্র ও পল্লীস্থ কয়েকজন যুবক একত্র মিলিত হইয়া সেই গৃহের অন্যস্থানে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে, কখনবা কথাচ্ছলে বিকট হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ফণীন্দ্রের সে সকল বিষয়ে কিছুই লক্ষ্য নাই। তাহাতে তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, তিনি গ্রাম সম্পর্কে জামাতা। পূর্ব্বে দুই তিনবার মাত্র আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অদ্য

যে সকল যুবক শ্বশুরের গৃহে বসিয়া গল্পাদি করিতেছে, তাহাদিগের সহিত তাঁহার আদৌ আলাপ পরিচয় নাই। যদিও কখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া থাকেন, তাহাও এক্ষণে স্মরণ নাই; যেহেতু তিনি প্রায় এক বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে আসেন নাই এবং তাহার বিবাহ মোট আড়াই বৎসর মাত্র হইয়াছে। অন্তঃপুর মধ্যে নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত দুই এক ঘর আত্মীয় স্বজন ব্যতিরেকে আর সকলেই যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছে, সুমতি রাধামতির সহিত আহার করিতে বসিয়া, ফণীন্দ্র নাথের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিতেছেন। এখন শোকচিহ্ন বক্কেশ্বরের বাটীতে নাই বলিলেই হয়, সকলেই যেন কোন উৎসব কার্য্যে ব্যস্ত!

দুষ্ট লোকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; তাহারা অপরকে কিরূপে বিপদ-জালে নিক্ষিপ্ত করিবে, সর্ব্বদাই সেই উপায় চিন্তনে চেষ্টিত থাকে। বিষধর যেরূপ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য, সুবিধা পাইলেই দংশন করে; সেইরূপ বক্কেশ্বরের গৃহে যে কয়েকটী যুবক বসিয়া একত্রে গল্পাদি করিতে ছিল, তাহারা কোন উপায়ে ফণীন্দ্রকে দুর্ব্বিপাকে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাইল। অসৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া লোকে না করিতে পারে, জগতে এমন কাজই নাই! ফণীন্দ্র নিরীহ ভাল মানুষ, সরল মতি, সংসারের পাকচক্রে তাদৃশ বিজ্ঞতা লাভ করে নাই, কেহ কোন কথা বলিলে তাহার কুটার্থ ত্যাগ

করিয়া সরল ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন। হেমেন্দ্র রাধামতির বাল্য-রূপলাবণ্যে একান্ত মোহিত; এক্ষণে আবার রাধামতির রূপ মাধুরী অধিকতর বিকাশ পাইয়াছে, রমণী যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে; স্ত্রী পুরুষের পবিত্র প্রণয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। হেমেন্দ্র এক সময়ে গৃহে পাইয়া তাহার প্রতি মনোগত ভাব প্রকাশ করায়, রাধামতি বালিকা বশতঃ কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, তথা হইতে সুমতির নিকট চলিয়া গিয়াছিল; এক্ষণে হেমেন্দ্রনাথ স্থির ভাবিয়াছিল, রাধামতির নিকট হৃদয়গত অভিলাষ ব্যক্ত করিলে কদাচ যুবতী অগ্রাহ্য করিবে না। রাধামতির হৃদয়ে নব প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, অবশ্যই বহু কালের বাসনা এতদিনে পূর্ণ হইবে! মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া হেমেন্দ্র তাহার দলভুক্ত উপস্থিত যুবকবর্গের সহিত ফণীন্দ্রনাথকে বিপদ-জালে নিক্ষিপ্ত করিবার উপায় উদ্ভাবনে এতাবৎকাল চিন্তিত ছিল। তিনি দ্বারকানাথের পুত্র, রায় মহাশয় হুগলির আদালতে বাক্‌বিতণ্ডার সম্যক পরিচয় দেখাইয়া, বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দশ টাকা সংস্থানও হইয়াছে। তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বংশধর পুত্রদ্বয়েরই হস্তগত হইবে। সুকৃতি সন্তান বংশের গৌরব স্বরূপ, উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার দ্বারা বংশের সুখ্যাতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে! অকৃতি সন্তান বংশের গ্লানি, তাহা হইতে খ্যাতি কীর্ত্তি

লোপ হয়। হেমেন্দ্র দ্বারকানাথের কুলাঙ্গার সন্তান, রায় মহাশয় এত যে ক্লেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহার জীবন-বায়ু বহির্গত হইতে না হইতে বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ হতভাগ্য হেমেন্দ্রের হস্তগত হইবে। ভাবি বিষয়ের উত্তরাধিকারী হেমেন্দ্রনাথের বন্ধুর অভাব নাই। স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশে দলে দলে লোক আসিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে, উপস্থিতে কিছুই পাইবার আশা নাই; পরিণামে দুই পয়সা হস্তগত হইবে, এই মাত্র ভাবিয়া সদাসর্ব্বদা হেমেন্দ্রের মনযোগাইয়া কার্য্য করিতেছে। মিত্রজা মহাশয়ের গৃহে হেমেন্দ্রের সহিত যে সকল যুবক একত্রে বসিয়া গল্পাদি করিতেছে, ইহারাই সেই শ্রেণীভুক্ত; হেমেন্দ্রর চিত্ত-বিনোদনই তাহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মূর্খের অশেষ দোষ, হেমেন্দ্র পিতার অর্থোপার্জ্জন ও ভ্রাতার বিদ্যালাভের প্রতি নির্ভর করিয়া, শৈশবাবধি আমোদপ্রমোদে সময় অতিবাহিত করিয়াছে, লেখা পড়ায় একদিনের নিমিত্ত মনোযোগী হয় নাই। কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি মাতার সমধিক স্নেহ প্রদর্শীত হইয়া থাকে। পিতা অথবা জ্যেষ্ঠের নিকট গর্হিত কার্য্য বশতঃ তাড়না খাইয়া হেমেন্দ্র মাতার কাছে আদর পাইত, মাতৃস্নেহই হেমেন্দ্রের সর্ব্বনাশের মুল হইয়াছে। লেখাপড়া না শিখিলে জ্ঞানের উন্নতি হয় না, অজ্ঞান-তিমিরে হৃদয় পরিপুর্ণ থাকে। হিতাহিত বিবেচনা-প্রভা জ্ঞানালোক ব্যতীত বিকীর্ণ হয় না! মনুষ্য বিবেচনা শক্তির বশ-

বর্ত্তী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। জ্ঞানী সৎপথে থাকিয়া দিনে দিনে সুকৃতিলাভ করেন; মূঢ় কাণ্ড জ্ঞান রহিত, মনে যখন যাহা উদিত হয়, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই রত হইয়া থাকে। পরিণামের প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। বিশেষতঃ বুদ্ধিহীনের হৃদয়ে সদাই সৎঅ প্রবৃত্তি বলবতী। স্বভাবের প্রতি সম্যক লক্ষ্য না রাখিলে অজ্ঞাত সারে কুনীতি আসিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। মনের প্রবল-শত্রু ছয় রিপু সুযোগ বুঝিয়া অসচ্চরিত্র ব্যক্তির উপর আধিপত্য করিতে থাকে। মূর্খের নিকট শঠ প্রবঞ্চক বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হয়, অসৎ সঙ্গের সংশ্রবে দিনে দিনে আচার ব্যবহার কলুষিত হইতে থাকে, তৎকালে আর ভদ্রাভদ্র ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। হেমেন্দ্রেব রাধামতির প্রতি একান্ত লক্ষ্য, গুরুজনের গঞ্জনা ও আত্মীয় স্বজনের অবমাননা আশঙ্কায় অদ্যাবধি মনের আশা মনেই রাখিয়াছে, উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কিন্তু ফণীন্দ্র যে সেই যুবতীকে লইয়া শয্যায় একত্রে নিশি যাপন করিবেন, তাহা দুষ্টমতি হেমেন্দ্রের অসহ্য। ফণীন্দ্র শাস্ত্রানুসারে রাধামতির স্বামী; রাধামতির রূপলাবণ্য সম্ভোগের তিনিই একমাত্র অধীশ্বর। সহধর্ম্মিণীর প্রতি পতির অনুরাগ শাস্ত্রসঙ্গত, কিন্তু হেমেন্দ্রের পক্ষে ফণীন্দ্র নয়নের কণ্টক। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি হেমেন্দ্রের মুখে হাস্য নাই, নিরানন্দভাবে কালক্ষেপ করিতেছিল। নষ্টবুদ্ধি লোক অস্থির প্রকৃতি, যখন যাহা মনে উদয় হয়, অগ্র-

পশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। হেমেন্দ্র ফণীন্দ্র নাথকে পিতার নিকটে মৌন-ভাবে বসিতে দেখিয়া, মনে মনে তাহার প্রতি বিরক্ত হইল। যে ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র লোকের মনস্তুষ্টিকর নহে, তাহার চক্ষে অপরের সচ্চরিত্রতা কোন কালেই ভাল বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে কোন প্রকারে হউক, সে তাহাকে আপনার দলভুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহাতে হেমেন্দ্র রাধামতির রূপলাবণ্যে বাল্য কালাবধি বিমুগ্ধ। ফণীন্দ্রনাথকে দেখিয়া হেমেন্দ্রের হৃদয় ঈর্ষানলে বিদগ্ধ হইতেছে; সেই জন্য বন্ধুগণ সহ হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রের অনিষ্টসাধনে এতক্ষণ স্থানান্তরে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল।

হেমেন্দ্রের বন্ধুগণ সকলেই ইতর প্রকৃতি, হেমেন্দ্র যে কার্য্যে আহ্লাদিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলে উদ্‌যোগী; তজ্জন্য অপরের অনিষ্ট সাধনেও তাহারা বিমুখ নহে। এক্ষণে অহোরাত্র হেমেন্দ্রের সহিত মিলিয়া তাহারই তোষা মোদ করিতেছে; পবিশেষে রায়মহাশয়ের অবর্ত্তমানে হেমেন্দ্র বিষয়াধিকারী হইলে সকলে দুই দশ টাকা হস্তগত করিবে, এই মাত্র আশার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এই নীচ কার্য্যে নিযুক্ত। তাহাতে আপাততঃ হেমেন্দ্রের নিকট সর্ব্বদা কালাতিপাত করায় গ্রাসাচ্ছা-দনের কষ্ট নাই, সময়ে সময়ে হেমেন্দ্রই তাহাদিগের সেই অভাব পূর্ণ করে। প্রকৃতপক্ষে সংসারে সেই খোসামোদী সম্প্রদায় হেমেন্দ্রকে উপাস্য দেবতা

স্বরূপ জানিয়াছে। ললিত চন্দ্র যেরূপ ভাগ্যদোষে আপনার উন্নতির পথে কণ্টক দিয়া হেমেন্দ্রের বৈঠকখানাতেই অধিক ক্ষণ কাটাইয়া থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট বেতন রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আদায় করে; সেই প্রকার হেমেন্দ্রের বন্ধুগণের মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও, কোন মতে তাহা আদায় করিয়া লয়। বস্তুতঃ হেমেন্দ্র যে সকল কার্য্য ললিতচন্দ্রের হস্তে নির্ভর করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহার তোষামোদীগণ 'বন্ধু' বলিয়া মনকে প্রবোধিত করিয়া, তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধম কর্ম্ম অম্লান বদনে সম্পাদন করে। এক্ষণে হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রকে দুর্ব্বিপাক-জালে নিক্ষিপ্ত করিবার উপায় উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। যে কোন উপায়েই হউক ফণীন্দ্রের সহাস্য বদন নিরানন্দময় করিতে না পারিলে, হেমেন্দ্রের মন পরিতৃপ্ত হইবে না। উপস্থিত যুবকবৃন্দের মধ্যে যাহার যে যুক্তি মনে হইল, অম্লানবদনে সে তাহাই বলিতে লাগিল। তাহাতে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। হিতাহিত বিবেচনারহিত অজ্ঞ ব্যক্তির কাহারও কথায় আপত্তি উত্থাপনের শক্তি নাই! বহুক্ষণের পর হেমেন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, বিনোদিনী নাম্নী তাহার যে স্থানান্তরে এক উপপত্নী আছে, কৌশল পূর্ব্বক তথায় ফণীন্দ্রকে লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ; কিন্তু ফণীন্দ্রের সহিত তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকবর্গের কাহারও আলাপ পরিচয় নাই। ভদ্রলোক অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত অকস্মাৎ কোন

কথা বার্ত্তার সূত্রপাত করিতে মনে মনে কিছু অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হন। যে লোকের সহিত আলাপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিবেন কি না, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়! কিন্তু যাহারা চিরকাল লোকের সহিত কুব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, সভ্যসমাজে এক দিনের নিমিত্তও স্থান পায় নাই, জীবনে লোকের সহিত বিবাদবিসম্বাদই সার বলিয়া জানিয়াছে; তাহাদের পক্ষে এ কার্য্য খৎ সামান্য। ফণীন্দ্রের সহিত কোন সুযোগে আলাপ করিতে হইবে, সেই যুবকদিগের মধ্যে এই কথার সূত্রপাত হইবামাত্র, কৃষ্ণ নামক জনৈক যুবক তৎক্ষণাৎ যে স্থানে ফণীন্দ্র নাথ বসিয়া ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া বসিল। ক্ষণকাল পরেই কৃষ্ণ ফণীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম কি ?"

ফণীন্দ্র। আমি আপাততঃ হুগলি কলেজে বিঃ এ, ক্ল্যাসে পড়িতেছি। মহাশয়ের নাম ?

কৃষ্ণ। আমার নাম কৃষ্ণলাল শীল, আমার উপস্থিত কোন কাজ কর্ম্ম নাই, বাটীতেই আছি। পৈত্রিক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি।

এইরূপ ক্ষণকাল কথোপকথনে পরস্পর আলাপ পরিচয় হইল। উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। হেমেন্দ্র অন্যান্য বন্ধুবর্গ সহ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, এক একবার উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

ফণীন্দ্রনাথ সরল মতি, বদান্য ও শান্ত প্রকৃতি। সংসারের জটিলতা এখনও তাঁহার সরল হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে নাই। পৃথিবীর যাহা কিছু সমুদায়ই তাঁহার নয়নতৃপ্তিকর। নরনারীর চরিত্রের ইতর বিশেষ ভেদাভেদ সে হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সংসারে সকলকেই আপনার মত তাঁহার ধারণা আছে। তিনি সকলের সহিত সরল ভাবে ব্যবহার করেন এবং অপরের ব্যবহার স্বয়ং সরল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের লেশ মাত্র স্পর্শ করে নাই। বাল্যকালাবধি পিতা মাতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতেছেন, বিদ্যাধ্যয়নই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যশোলাভ করিতে পারেন, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রশংসা লাভ হয়, তদ্বিষয়েই সর্ব্বক্ষণ মনোযোগী। পার্থিব ভোগ-বিলাস তাঁহার চিত্তে এককালেই স্থান পায় নাই। কৃষ্ণ তন্তুবায়ের পুত্র, লেখা পড়ায় একদিনের নিমিত্তও মনঃসংযোগ করে নাই; পিতার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল না। স্বজাতি ব্যবসায় শিক্ষা করিলেও লোকের গলগ্রহ হইয়া তাহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত না। মৃত্যুকালে পিতা দুই একখানি ভাড়াটিয়া বাটী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই মাসিক ভাড়ায় মাতা ও পরিবারবর্গের এক প্রকার দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত হইতেছে। যে দুই এক হাজার নগদ টাকা ছিল, তাহা পিতার অবর্ত্তমানে নিজ দোষে

সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। অর্থ ব্যয়ে স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অর্থ হস্তগত হইলে মদিরা সেবন, বেশ্যা-গমন প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত পৈত্রিক ধন নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে হাতে পয়সা নাই, কিন্তু স্বভাবের একবার অধোগতি হইলে, তাহার সংস্কার সহজ ব্যাপার নহে; এক্ষণে আপনার অর্থ না থাকি-লেও ধনাঢ্য অসচ্চরিত্র যুবকের আশ্রয়ে দিনাতিপাত করে। যোগেযাগে আমোদপ্রিয় ধনশালী যুবক-দিগের সহিত আলাপ করিয়া সুরাপান প্রভৃতি বিলাস-ভোগ সম্পন্ন হয়। মনে মনে এরূপ অমোদ প্রমোদ অসার জানিয়াছে, তথাচ স্বভাব-দোষে তাহাতেই রত; সময়ে নিজ ব্যয়ে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, এক্ষণে পরের গলগ্রহ হইয়া তোষামোদ প্রভৃতি দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য। কৃষ্ণ কথায় কথায় ফণীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছে, কিন্তু আপনার প্রকৃত অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশ করে নাই। সরলপ্রকৃতি ফণীন্দ্রনাথ সেই অভাগা কৃষ্ণ-লালকেই আপনার মত সজ্জন জ্ঞান করিয়াছেন।

যে সময়ে তাহাদিগের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা। চন্দ্রনাথ আহারাদি করিয়া পুত্রের নিকটে একটী তাকিয়ায় মস্তক রাখিয়া বিরাম করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছেন, গৃহে অপর লোক আর কেহ নাই। গ্রীষ্মকাল, বৈঠকখানা গৃহের দক্ষিণ দিকে জানালা গুলি উন্মুক্ত। গৃহের দক্ষিণ

ভাগে বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ শোভিত বিস্তৃত ভূখণ্ড। মৃদু মন্দ সমীরণ প্রস্ফুটিত কুসুম দামের সুবাস বহন করিয়া গৃহস্থিত ব্যক্তি বর্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছে। আকাশে তারকা দল বেষ্টিত সুধাকর দেদীপ্যমান, জ্যোৎস্না রাশি জানালার মধ্য দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কৃষ্ণলাল ফণীন্দ্র নাথের সহিত নানাবিধ কথোপকথনের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় বিদেশী পুরুষ, যদি অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, একবার আমাদের পথ ঘাট দেখিবেন না?"

ফণীন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিয়া এ পর্য্যন্ত গৃহ মধ্যেই আবদ্ধ আছেন। মধ্যে দুই একবার পরিবেশনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন স্নানাহার ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। তিনি প্রতিদিন পুস্তক পাঠেই দিবার অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া থাকেন, সুতরাং এখানে অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকায় কতক পরিমাণে আপনাকে অসুস্থও বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজ পৌর্ণমাসীর পূর্ব্ব রাত্রি। চন্দ্রের রশ্মিজালে ধরাতল আলোকিত, পথ ঘাট সমুদায়ই যেন দিবা ভাগের ন্যায় দীপ্তিমান; নিবিড় বৃক্ষরাজি ভিন্ন অন্ধকার কোথাও নাই। তিনি কৃষ্ণলালের কথায় স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু পিতা নিদ্রিত, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে রাত্রিকালে বাটীর বাহিরে যাইতে তাঁহার তাদৃশ মন সরিল না। তিনি কৃষ্ণলালকে বলিলেন "কৃষ্ণ বাবু! আমার বেড়াইতে

যাইবার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু পিতা জাগরিত না হইলে আমার যাওয়া হইবে না।" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইবা মাত্র, হেমেন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল। দ্বারকানাথ রায় মহাশয় যে শ্বশুরের প্রধান সহায়, ফণীন্দ্রনাথ তাহা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন। প্রভাতে আসিয়াই তাঁহার সহিত রায় মহাশয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এক্ষণে হেমেন্দ্রের সহিত দুই একটী কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিয়াছেন যে, হেমেন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র; হেমেন্দ্র. তাঁহাকে বেড়াইতে যাইবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিতেছেন; তাঁহার কথা রক্ষা না করিলে, শ্বশুর মহাশয় মনে মনে বিরক্ত হইতে পারেন, পিতাও হয়ত তিনি যাইতে অসম্মত হইয়াছেন শুনিলে, তিরস্কার করিবেন; কিন্তু তিনি নিদ্রিত, কখন যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই যে তাঁহার অনুমতি লইয়া হেমেন্দ্রের কথা রক্ষা করিবেন। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া অগত্যা ফণীন্দ্র হেমেন্দ্রের সহিত ভ্রমণ করিতে যাইতে সম্মত হইলেন। হেমেন্দ্রনাথ সানন্দে ফণীন্দ্রের হস্ত ধরিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল; তাহার বন্ধুবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে রেলওয়ের সৃষ্টি হয় নাই। নবাবগণ প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সুদীর্ঘ পথ নির্ম্মাণ, মধ্যে মধ্যে কূপ খনন, পথিকদিগের শান্তি কারণ পান্থ-নিবাস ও সরাই আদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। দিল্লীর সম্রাট সুরবংশীয় সেরসার রাজত্ব সময়ে উল্লিখিত রূপ একটী সুদীর্ঘ পথ নির্ম্মিত হয়, এই পথটীর নাম গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্করোড্, ইহা বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এক্ষণে রেলওয়ের দ্বারা লোকের গতি বধি হইয়া থাকে, তজ্জন্য এই পথটীর স্থানে স্থানে অপরিষ্কার হইয়াছে। হুগলির মধ্যভাগে এই পথ প্রসারিত আছে। স্থানে স্থানে ইহার যে কত শাখা, প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হুগলিতে এই পথের একটী চৌমাথায় একখানি পর্ণকুটীর। উহা নয়ন-গোচর হইলেই দরিদ্রের আবাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বহির্ভাগ হইতে শয়ন গৃহে দৃষ্টিপাত হইলে, সহসা তথায় দরিদ্রের বসতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে না, মনে মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়। বাটীর বহির্দ্বার রাত্রি কালে উন্মুক্ত রহিয়াছে, লোক জন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; ইহাতেও মনের ভাব বিকৃত হইতে পারে। অথবা এখানে কি কোন ধনাঢ্য

পুরুষ সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ একাকী এই নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেছেন? কিন্তু সে ধারণা অচিরে বিদূরিত হইল। কুটীরের পথ-পার্শ্বস্থ গবাক্ষে একটী রমণী মুখ বাড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দৃষ্ট হইল। অকস্মাৎ কামিনী জন সাধারণের গতিবিধির স্থূল-বর্ত্মের প্রতি কি কারণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? হিন্দু-ললনা বাটীর অন্তঃপুর সুশোভিনী; গৃহলক্ষ্মী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে কি নিমিত্ত উপস্থিত! রমণীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সে যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে অনুমান হয়! বঙ্গমহিলা পথপ্রান্তে কাহার অপেক্ষা করিতেছে? ললনাকে দেখিয়া কিছুই বুঝা গেল না, সংশয়ে হৃদয় পূর্ণ হইল। বারম্বার তাহার প্রতি নয়ন-পাত করিতেও লজ্জা হয়। ভদ্রকুল-কামিনী না জানি হয়ত কি বিপদে পড়িয়া আত্মীয় স্বজনের আগমন প্রতীক্ষায় গবাক্ষে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! সে দিকে পুনঃপুনঃ চাহিলে আমার প্রতি লোকের যে সন্দেহ হইবে; কিন্তু এ ভাব দেখিয়া হৃদয় যে আকুলিত হইল! মনে করিতেছি দেখিব না, তথাপি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুনরায় নয়ন সেই দিকেই পতিত হইল! এখনও কামিনী সেই ভাবেই রহিয়াছে। অধিকক্ষণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না; তথাপি যাহা দেখিলাম, গৃহস্থের গৃহে কদাচ সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহস্থিত আলোক কামিনীর গণ্ডস্থলে পতিত হওয়াতে স্পষ্ট দেখা

গেল, ললনার বদনমণ্ডল গোলাপি গুঁড়ায় রঞ্জিত; বয়সো-পযুক্ত বেশ ভূষায় সজ্জিত থাকিলে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপিত হইত না। কিন্তু যে ভাব দেখিলাম, তাহাতে যেন অকপটতা পূর্ণ। যতই দেখি, সমুদয়ই যেন অতি রঞ্জিত বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। গৃহস্থের বাটীতে কন্যা বা বধূরা সাধারণতঃ দুই একখানা অলঙ্কারে ভূষিতা থাকে, পরিধান মোটা কাপড়; এ যে রঞ্জিত সুচারু সূক্ষ্মবাস, তাহাতে যেরূপ অলঙ্কারে ভূষিতা, দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন অতুল ঐশ্বর্য্যাধি-কারিণী বসিয়া রহিয়াছেন, এ কি বিষম চিত্র! ধন রত্না-ধিশ্বরী কি নিমিত্ত পর্ণ কুটীরে বাস করিবেন? তাঁহার কি আর থাকিবার স্থান নাই? মনে মনে সন্দেহের সাতিশয় বৃদ্ধি হইল। কিন্তু দেখিতেদেখিতে রমণী বহি-র্দ্বারে উপনীত হইল। গাত্রাভরণ দর্শনে এক্ষণে ধন-শালিনী বলিয়া আর বোধ হইল না; যেহেতু মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ভূষণাদি শোভা পাইতেছে—দৃষ্ট হইল। বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে অঙ্গরাখা। ভদ্র হিন্দুকামিনী কদাচ কূর্ত্তি পরি-ধান করে না। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া, যদিও কোন কোন ধনাঢ্য পত্নী বা কন্যা কূর্ত্তির ব্যবহার করে, সত্য বটে; কিন্তু সে সকল এরূপ নহে। অঙ্গ-রাখায় কামিনীর বক্ষঃস্থলস্থিত উন্নত পয়োধরযুগল আবৃত রাখিয়াছে মাত্র! যাহা হউক, তাহার প্রতি ভদ্রকুল জাতা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।* নিশ্চয়ই সে কুলটা রমণী। যুবক মন-কুরঙ্গ বদ্ধ

করিবে, বলিয়া মায়া-জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, উপলব্ধি হইল। স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে তাদৃশ সুন্দরী নহে। কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, লোকের মনোহরণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। পথিকের তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হউক না হউক, তাহার বাহ্যিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সে যেন প্রত্যেকেরই মনোমোহিনী। রমণী পথের ধারে—দ্বারদেশে এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হেমেন্দ্র ফণীন্দ্র সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইল। ফণীন্দ্রনাথ স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কথাবার্ত্তায় উন্মত্ত হইয়া আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ সেই স্থানে সকলের গতি রহিত হইল দেখিয়া, তিনি সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই খানেই কি আমাদিগের বেড়ান শেষ হইল?" হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রের কথা শুনিয়া, স্মিতমুখে সেই রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অসতী স্ত্রীলোকের কুটিল অভিসন্ধি, লোকের মন মুগ্ধ করাই তাহাদিগের সারব্রত! এই নিমিত্তই কামিনী রূপের পাসোরা বিকাশ করিয়া, পথের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। হেমেন্দ্রের কথার অঙ্কুর মাত্রেই সে সুললিত বচনে বলিল "কেন মহাশয়, জলে পড়িলেন না কি? আসুন, পান তামাক খান; অধিনীর প্রতি কি অনুগ্রহ হইবে না?" ফণীন্দ্রনাথ সেই রমণীর কথা শুনিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না; তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নীরবে রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে,

ভাবিতে লাগিলেন, পর পুরুষ দর্শনে হিন্দু-রমণীগণ লজ্জায় কুণ্ঠিতা হন, তাঁহাদিগকে অন্তঃপুর হইতে কদাচ বহির্গত হইতে দেখা যায় না! এই কামিনী বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, পথের ধারে কি নিমিত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আমরা যে এত গুলি লোক আসিয়া ইহার সম্মুখীন হইলাম, আমাদিগকে দেখিয়াওত ইহার কিছু মাত্র লজ্জা সম্ভ্রম হইল না। এস্থান হইতে প্রস্থান দূরে থাকুক, সকলের সম্মুখে অম্লান বদনে আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিল; পুনশ্চ তাহার বাটীতে যাইতে আকিঞ্চন করিল। একি বিচিত্র লীলা! হিন্দু-ললনার ত এরূপ রীতি নীতি কদাচ দৃষ্টি-গোচর হয় নাই! এই সকল ভাবনা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। এ দিকে আমোদমত্ত হেমেন্দ্রনাথ সেই রমণীকে প্রিয় সম্ভাষণানন্তর পরিহাসাদি করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে হেমেন্দ্রের বন্ধুবর্গ রমণীর অনুগামী হইয়া, কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্র ফণীন্দ্র নাথের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে বাটীর মধ্যে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। ফণীন্দ্র রমণীর ব্যবহারে এককালে হতবুদ্ধি হইয়া ছিল; মুখে কথা নাই, হেমেন্দ্রের আকিঞ্চনে কোন অসম্মতি ভাব প্রকাশ করিলেন না। হেমেন্দ্র প্রফুল্লচিত্তে ফণীন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বন্ধু-বর্গের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

গৃহটীর বহির্ভাগ মৃত্তিকাবৃত হইলেও অভ্যন্তরের শোভা সন্দর্শনে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এক পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক

প্রসারিত, তদুপরি দুগ্ধফেণ-নিভ সুউচ্চ শয্যা বিস্তারিত রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশে আনালায় নানাবিধ রঙ্গের বস্ত্রাদি শোভা পাইতেছে। দেউলে পাঁচ ছয় খানি হিন্দু-দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত চিত্র শোভা করিয়া রহি-য়াছে। তলদেশেও পালঙ্গসদৃশ একটী পরিচ্ছন্ন বিছানা, তদুপরি পাশাপাশি চারি পাঁচটা তাকিয়া সজ্জিত আছে; রমণী নিয়তলস্থ শয্যার মধ্যভাগে উপবেশন করিল, পার্শ্বে হেমেন্দ্রনাথ; ফণীন্দ্র ও অন্যান্য সকলে তাহাদিগের চারিপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। জনৈক প্রাচীনা আসিয়া রূপাবাঁধান একটী হুঁকায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। রমণী হুঁকাটী বৈঠক হইতে লইয়া হেমেন্দ্রের হস্তে প্রদান করিল। হেমেন্দ্রনাথ সেই রমণীকেই প্রথম ধূমপান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। কামিনীর লজ্জা সম্ভ্রম কিছুই নাই, অম্লান বদনে সকলের সম্মুখে তামাক খাইতে লাগিল। তাহার ধূমপান শেষ হইলে, হুঁকাটী এইবার হেমেন্দ্রের হস্তে না দিয়া, ফণীন্দ্রনাথের দিকে ধরিল। ফণীন্দ্রনাথ তাম্রকূট সেবন করেন না, কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে হুঁকাটী হস্তে লইয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ কৃষ্ণলালের হস্তে দিলেন। এইরূপে ফণীন্দ্র ব্যতীত গৃহের সকলেই একে একে ধূমপান করিল। কামিনী ইত্যবকাশে বাটা হইতে কয়েকটী পান লইয়া সকলকেই এক একটী করিয়া প্রদান করিল। অনতি-বিলম্বে হেমেন্দ্র আপনার পিরাণের পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া সেই বৃদ্ধাকে আহ্বান পূর্ব্বক সুরা

ও তদুপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি আনিতে বলিল। বেশ্যা-লয়ের এই সকল বৃদ্ধা বিবিধ রঙ্গরসে পূর্ণা, বাবুর নিকট হইতে টাকা লইবার সময়ে সেই বৃদ্ধা কতই রসিকতা জানাইল। হেমেন্দ্র বৃদ্ধাকে বাজারে পাঠাইয়া বন্ধুবর্গ ও স্ত্রীলোকটী সহ নানাভাবের রসালাপ করিতে আরম্ভ করিল। শান্তপ্রকৃতি ফণীন্দ্রনাথ এতক্ষণ একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাহাদিগের রঙ্গ তামাসা দেখিতে ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই; দুশ্চরিত্র লোকের সহবাসে পড়িয়া কোন কথাবার্ত্তা না কহিলেও ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। তিনি এই ভাবে বসিয়া আছেন দেখিয়া, হেমেন্দ্র সেই রমণীর প্রতি নয়ন ফিরাইয়া বলিলেন "বিনোদ! আমরা তোমার নিকটত নিত্য আদর পাই, আমাদের প্রতি তোমার খাতির যত্ন যথেষ্ট; কিন্তু ভাই, আজ আমাদের সঙ্গে এই যে নূতন বাবুটী আসিয়াছেন, ইনি কাঠের পুতুলের মত এক পাশে বসিয়া আছেন, আজ উঁহাকে লইয়া আমোদ কর। লোকটা বড় পণ্ডিত, মহাগুণী পুরুষ। কলকৌশলে ওঁকে হস্তগত করিতে পারিলে, তোমার আর সুখের সীমা থাকিবে না। পুরাতনের প্রতি সমাদরে কিছুই নূতনত্ব নাই, নতনের প্রতি সোহাগ জানাইতে পারিলে, তোমার আরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

রমণী হেমেন্দ্রের কথায় কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া ফণীন্দ্র সমীপে সরিয়া বসিল এবং রসালাপে তাঁহাকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফণীন্দ্র গৃহস্থিত যুবক-বৃন্দ ও কামিনীর ভাব ভক্তি দর্শনে ইতিপূর্ব্বেই মনে মনে

সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ছিলেন; কিন্তু এস্থলে সেরূপ কোন কথা প্রকাশ করিলে হাস্যাস্পদ হইবেন ভাবিয়া, এতক্ষণ মৌনভাবে যাপন করিতে ছিলেন। এক্ষণে স্ত্রীলোকটীর অনুনয় ও আকিঞ্চনে বিষম গোলযোগে পড়িলেন। কি বলিবেন, কিছুই যুক্তি করিতে পারিলেন না; অথচ কোন কথা না কহিলেও কুহকিনীর হস্ত হইতে সহজে মুক্তিলাভ বিষম শঙ্কট বিবেচনা করিলেন। অব-শেষে বহুক্ষণ কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া, আরও নীরবে থাকিলে পরিহাসাদি সহিতে হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি উত্তর করিলেন "আজ আমার বড় মাথা ধরিয়াছে, সেই-জন্য আপনার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। সময় মতে একদিন আপনার সহিত দেখা সাক্ষাতে আলাপ পরিচয় করিয়া সুখী হইব।" ফণীন্দ্রনাথের উত্তর প্রতীক্ষায় সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কথায় গৃহমধ্যে বিকট হাস্যের উদ্দীপনা হইল। কামিনীর আর হাসির পরিসীমা রহিল না। ইতিমধ্যে বৃদ্ধা জলীয় পদার্থ-পূর্ণ একটী কাঁচের পাত্র ও এক ঠোঙ্গা কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পুনরায় বৃদ্ধার আগমনে বিকট হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। বৃদ্ধা সেই বোতলটী রাখিতে না রাখিতে, হেমেন্দ্র মহোৎ-সাহে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দরজার উপরিস্থ তাক হইতে একটী কাঁচের গেলাস পাড়িয়া বোতলটীর ছিপি উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সেই তরলপদার্থে পাত্রের প্রায় অর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিয়া, ফণীন্দ্রকে সেবন করিবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিল।

ফণীন্দ্র জন্মাবধি মদিরা চক্ষেও দেখেন নাই. তাহার স্বাদ আস্বাদন কিছুমাত্র অবগত নহেন। হেমেন্দ্র গেলাস লইয়া তাঁহাকে পান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এপাত্রে কি আছে? আমাকে খাইবার নিমিত্ত আপনি কেন এত অনুরোধ করিতেছেন।"

হেমেন্দ্র। ফণীন্দ্র বাবু, আপনি নিস্তেজ ভাবে বসিয়া আছেন, মনে স্ফূর্ত্তি নাই; আপনাকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিবার জন্য আমরা ইহা আনাইয়াছি, পান করুন; কোন কষ্ট হইবে না। আপনার এই ক্ষণেই সকল অসুখ দূর হইবে, আমাদের মত আমোদ প্রমোদ করিতে থাকিবেন। দেখুন, জগতে মানুষ কয় দিনের জন্য। যদি আমোদ আহ্লাদে দিন না অতিবাহিত হইবে, তবে আর পৃথিবীতে জন্ম ধারণের প্রয়োজন কি? খাও ভাই! ধর, আর বিলম্ব কর না!"

ফণীন্দ। হেমেন্দ্র বাবু! আমি জন্মেও মদ খাই নাই; মদের স্বাদ গন্ধ কিছুই জানি না; শুনিয়াছি লোকে মদ খাইয়া বড় উৎপাত করে। সুস্থ শরীরে ইচ্ছা করিয়া পীড়ার সঞ্চার কখন কর্ত্তব্য নহে; আপনারা আমোদ আহ্লাদ করুন, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমাকে মদ্যপানের নিমিত্ত পুনরায় অনুরোধ করিবেন না। আপনি যাহা আমাকে সেবন করিতে দিতেছেন, যদি ইহা প্রকৃত সুরা হয়, তাহা হইলে মহাশয় আমাকে বিদায় দিন, আমি বাটী চলিয়া যাই।

হেমেন্দ্র। ফণীন্দ্র বাবু, এ কেমন কথা! আমরা কি মদ্যপায়ী যে, আপনাকে মদ খাইবার জন্য অনুরোধ করিব? আপনি একবার মাত্র এই ঔষধ অল্প মাত্রায় পান করুন। যদি কষ্টবোধ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ইহা সেবন করিতে আর কখন অনুরোধ করিব না; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। আপনার ভালর জন্যই বলিতেছি, একবার খাইয়া দেখুন! কোন কষ্ট হয় আর খাইবেন না।

ফণীন্দ্রনাথ সেই পানীয় দ্রব্য কোন মতেই সেবন করিবেন না এবং হেমেন্দ্রনাথ যে কোন প্রকারেই হউক তাহা ফণীন্দ্রনাথকে পান করাইবেন. উভয়েরই মনে মনে এইরূপ স্থির সংকল্প! কিন্তু যেস্থলে দুর্বৃত্তের প্রতাপ অধিক, তথায় সাধু ব্যক্তির যুক্তি কোন ফলপ্রদই নহে। ফণীন্দ্র অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও পিশাচ-দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন না, তাহারা পরিশেষে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রায় তিন গেলাশ মদ খাওয়াইল। ফণীন্দ্র সুরার আস্বাদন কিছুমাত্র অবগত নহেন, মনে মনে তখনও ভাবিতেছেন যে, ইহাঁদিগের সহিত আমার শত্রুতা নাই; অদ্য মাত্র আলাপ পরিচয় হইয়াছে, কথায় সকলকেই ভদ্র বলিয়া জানিতেছি, ইহাঁরা কি আমাকে কোন দুর্ব্বিপাকে ফেলিবার উদ্দেশে যথার্থই মদ্যপান করাইবে! তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দো-লন করিতেছেন, এদিকে হেমেন্দ্র বন্ধুবর্গ ও বারবিলাসিনী সহ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে

লাগিল। তাহাদিগের বিকট চীৎকারে গৃহ পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইল। লোকে ক্ষণিক আমোদ লাভ বাসনায়, সুস্থ শরীরে সুরা-গরল পান করিয়া স্বাস্থ্য ও চরিত্র বিনষ্ট করে; আজীবন ভঙ্গুর দেহে কষ্ট পাইতে থাকে। হেমেন্দ্র বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে কয়েক দিবস মাত্র এই কদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে, জীবনে বারবিলাসিনীর প্রণয় ও সুরাই সার বলিয়া জানিয়াছে। মদোন্মত্ত অবস্থায় জ্ঞান শূন্য, কাহার প্রতি যে কিরূপ ব্যবহার প্রয়োজন, তাহার কিছুই স্মরণ নাই; কথায় কথায় হয়ত কাহাকে প্রাণপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে, কখন বা সামান্য কথায় বিবাদ বাধাইয়া দাঙ্গা হাঙ্গাম উপস্থিত করিতেছে। শরীরের আবলা, বমন প্রভৃতি সুরাশক্ত লোকদিগের নিত্যক্রিয়া! হেমেন্দ্রের বন্ধুবর্গ সকলেই বহু দিবসাবধি মদিরা পানে অভ্যস্থ, তাহাদিগের ন্যক্কারাদি না হইলেও পানের সময় উচ্চনাসিক হইতে হয়। কিন্তু এরূপ হইলেও, আমোদের সীমা নাই; অদ্য সকলে সুরাপান করিয়া কোলাহলে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। অভাগা ফণীন্দ্রনাথের আজি কি দুর্দ্দশার দিন! শ্বশুরালয়ে আমোদ হইবে ভাবিয়া, পিতার সহিত নিমন্ত্রণে আসিয়া, আজি কি ঘোর পাতকেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন! পিশাচ সদৃশ দুরাত্মা হেমেন্দ্র তাঁহার আজ সর্ব্বনাশ করিয়াছে নিরপরাধী, সরলমতি ফণীন্দ্র পাপাচারী কৃষ্ণলালের কথা সরল ভাবে গ্রহণ করিয়া, রজনী যোগে সুশীতল চন্দ্রকিরণাসিক্ত পথ ঘাটে বেড়াইতে স্বীকৃত হইয়া, আজ

মহাবিপদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। জন্মে কখনও তামাক পর্য্যন্ত সেবন করেন নাই, মাদক দ্রব্যের লেশমাত্র তাঁহার পবিত্র দেহে সঞ্চারিত হয় নাই; বারাঙ্গনার কুহক-জাল যে কি ভয়ঙ্কর সামগ্রী, তাহা আদৌ তাঁহার অনুভব-শক্তির অগম্য; সুরা ও বেশ্যা তাঁহার চিরকালের নিমিত্ত ঘৃণিত, আজ হেমেন্দ্রনাথের কৌশলে তিনি বার-বিলাসিনীর গৃহে উপবিষ্ট; ঔষধ-ভ্রমে মদ্যপানে এক-কালে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, মুখে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না; দেহ মধ্যে হৃদয় যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। কখন বা বমন করিয়া কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিতেছেন; কিন্তু সে শান্তি ক্ষণকালের নিমিত্ত! পরক্ষণে মাথার যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন। তিনি কে এবং কোথায় বসিয়া আছেন, কাহাদের সংস্রবে মিলিত হইয়া এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। সংসার তাঁহার পক্ষে শূন্যময় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; কখন বা উঠিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, পরক্ষণে বসিয়া থাকা দূরে থাক, শয়ন করিয়াও যন্ত্রণার উপশম পাইতেছেন না। শান্ত-প্রকৃতির স্থিরভাবে ক্ষণকাল ক্ষেপণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! হয়ত কখন আপন মনে প্রলাপ বকিতেছেন, চৈতন্য এককালে লোপ পাইয়াছে।

রাত্রি সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময়ে হেমেন্দ্র ফণীন্দ্রকে লইয়া নরককুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে, এক্ষণে প্রায় দ্বি-প্রহর অতীত, পথ-ঘাটে লোকের কোলাহল আর শ্রুতি-

গোচর হইতেছে না; গৃহস্থগণ যে যাহার আবাসে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী ধরাধামে জীব-জন্তুর উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সকলেই নিস্পন্দ ও নীরবে গভীর-রজনী-নিদ্রায় যাপন করিতেছে। একমাত্র তারকাদল-পরিবেষ্টিত শশধর সুবিমল কর-ধারায় দীপ্তি পাইয়া, লম্পট নিশাচরদিগের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রজনীই দুশ্চরিত্র লোকদিগের মনোগত অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার প্রকৃত সময়; তাহাদিগের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতে জগতে জনেক-মাত্রও জাগরিত নাই, সকলেই স্ব স্ব আবাসে সুখে নিদ্রা যাইতেছে।' লোকের অগোচরে পাপাত্মাগণ পরম উৎসাহে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে। পাপমতি হেমেন্দ্র বারাঙ্গনা ও বন্ধুগণ সহ যে সুরাপানে মত্ত হইয়া শরীর নষ্ট করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই; কিন্তু নিরপরাধী নিষ্কলঙ্ক যুবক ফণীন্দ্রের আজ কি অধোগতি হইয়াছে। অভাগার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, না জানি, সঙ্গদোষে লোকের কি গুরুতর অপকারই সংঘটিত হইতে পারে।

হেমেন্দ্র কোন সুযোগে ফণীন্দ্রনাথকে অপদস্থ করিবে, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াই তাঁহাকে বেশ্যালয়ে লইয়া আসিয়া মদ্যপান করাইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে নেশায় অচৈতন্য দেখিয়া পাপাত্মার আর আনন্দের সীমা নাই—লোকে মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া রিপু প্রভৃতির

উদ্দীপনা করিয়া থাকে। হেমেন্দ্র নেশায় ভরপুর, বন্ধুগণ তাহার আজ্ঞাবাহী; তাহার অধরে হাস্যের সঞ্চার হইতে না হইতে বীণার তন্ত্র যেরূপ অঙ্গুলি স্পর্শে ঝঙ্কার করিয়া উঠে, সেইরূপ তাহার বন্ধুগণ সকলেই বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। ফণীন্দ্র জ্ঞানশূন্য, অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলের এক স্থানে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে চন্দ্রনাথ নিদ্রাভঙ্গে পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইলেন। ভাবিলেন, হয় ত, অন্তঃপুরে ফণীন্দ্রনাথ শয়ন করিতে গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সে সংস্কার অচিরে দূর হইল। যেহেতু অনতিবিলম্বে বক্কেশ্বর তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিল যে, ফনীন্দ্রনাথ কোথায় গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বৈবাহিকের এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ভয় ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বক্কেশ্বর বাবু! এ কেমন কথা? আমার পার্শ্বে ফণীন্দ্র যে বসিয়া ছিল; আমি তাকিয়া ঠেস দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। গৃহ হইতে সে কোথায় যাইল—তাহার কিছুই সন্ধান নাই?"

বক্কেশ্বর। চন্দ্রবাবু! আমিও ত তাই আশ্চর্য্য

হইয়াছি! ফণীন্দ্র নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়, তাহাতে তাহার স্বভাব-চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।

চন্দ্রনাথ বক্কেশ্বরের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যখন বিশ্রাম করি, সেই সময়ে কয়েকজন যুবা এই গৃহের স্থানান্তরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এখন তাহারা বা কোথায়? তাহার সঙ্গে কি ফণীন্দ্র গিয়াছে? সে যেরূপ সুবোধ ছেলে, আমার অনুমতি ভিন্ন ত কোথাও যায় না, এও ত আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে না। আমি দেখিতেছি, বড় বিপদেই পড়িলাম; এখন উপায় কি?"

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ ফণীন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে রায় মহাশয়ের ভৃত্য গোপাল আসিয়া সংবাদ দিল যে, ফণীন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভৃত্যের মুখে সংবাদ শুনিয়াই চন্দ্রনাথ জামার জেব হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন এবং সত্বর ফণীন্দ্রকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। গোপাল সহাস্যবদনে দুইটী টাকা গ্রহণানন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিল। বক্কেশ্বর ও চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাধামতিও দুই একজন আত্মীয় স্ত্রীলোক সহ অন্তঃপুরে জাগরিতা থাকিল। বক্কেশ্বরের গৃহস্থিত নরনারীদিগের কাহারও সে রাত্রি নিদ্রা হইল না; ভাবনা চিন্তাতেই সারা রজনী কাটিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সংসারে সুখী কে? দরিদ্র গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দিবারাত্রি চিন্তাকুল; মধ্যবিত্ত, অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধনে লোলুপ; ধনশালী বিলাসভোগ-বাসনায় চিত্তসুখ বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর উৎকণ্ঠিতভাবে দিন যাপন করিতেছে! প্রকৃত সুখ জগতে দুর্লভ; মনুষ্যের অভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পূর্ণ হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই। মায়াবিনী আশাদেবী নরনারীর জীবন-সঙ্গিনী; লোকে অসার আশার বশবর্ত্তী হইয়া সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাতেও কার্য্যক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়। সুখ-দুঃখ-বিজড়িত এই ধরাধামে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিয়া দিনাতিপাত করে। একমাত্র জনক-জননীর স্নেহ নিঃস্বার্থ। তাঁহারা পুত্র-কন্যার নিকট হইতে আবশ্যকমতে সহায়তা পাইব, এই আশায় বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করেন না। জগদীশ্বর-প্রদত্ত অকৃত্রিম বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া অহোরাত্র প্রাণপণে সন্তান-সন্ততির লালন পালন ও মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। ভাই, বন্ধু, দারা, সুত আর যে কেহ আপনার বলিয়া ভাবিয়া থাকি, তাহারা সকলেই আমার নিকট উপকৃত হইবার আশায় উপকার করে; পিতা মাতা ব্যতিরেকে, প্রকৃত পক্ষে জগতে আর কেহই আপনার নাই।

প্রত্যক্ষে যদিও তাঁহারা আমার নিকট উপকৃত হইতে-ছেন না, তথাচ মনে মনে তাঁহাদিগের ধারণা আছে যে, সন্তান সচ্চরিত্র ও সাধু হইলে অবশ্যই পরিণামে ভবিষ্য অভাব হইতে মুক্তি পাইবেন, কিন্তু কেবলমাত্র সেই আশাতেই তাঁহারা বাৎসল্য প্রদর্শন করেন না। আশা সংসারীর আসক্তি, আশাশূন্য হইলে নর-নারী ক্ষণকাল ইহজীবন যাপন করিতে পারে না। আজ আমার এই ভাবে দিন কাটিতেছে, সময়ে সুদিন হইবে; আমিও জনসমাজে গণ্যমান্য ধনাঢ্য লোকের মত আদরিত হইব, এইমাত্র আশায় নির্ভর করিয়া, জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল যাপিত হইতেছে। আশায় থাকিয়া, উপস্থিত কোন অভাব না থাকিলেও কল্পিত অভাবে আমরা হৃদয়কে আকুলিত করি। ইহ-জীবন সুখ-দুঃখ-বিজড়িত। কেহ যে অনন্তকাল এক-ভাবে ক্ষেপণ করেন, পরমেশ্বরের বিধান সেরূপ নহে। তিনি যেন তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া নরনারীর সুখ-দুঃখ বিধান করিয়া দিয়াছেন। ভরণ-পোষণের কষ্ট নিদূরিত হইলে, অন্য দুঃখ আসিয়া সুখের লোপ করে। আহার ব্যবহার, লোকাচার প্রভৃতি সামাজিক বন্ধন-স্রোতে অবিরত জীবন ভাসমান, বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। আসক্তির বশবর্ত্তী হইয়া নরনারী সংসারে আবদ্ধ। একের নিমিত্ত অপরের হৃদয় চিন্তাকুল, নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও প্রিয়জনের মনস্তুষ্টি করিব! কেমনে সে আমার

সুখে থাকিবে, কিরূপ করিলে তাহার সাংসারিক অভাব নিবারিত হইবে; সদা-সর্ব্বদাই এই ভাবনায় ভাবিত! তাহার প্রফুল্লবদন দর্শনে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে; সে সময়ে জগতের যাবতীয় সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সংসারের ভাল-মন্দ কিছুরই প্রতি লক্ষ্য থাকে না, হৃদয়-মন্দিরে যে প্রিয়মূর্ত্তির অধিষ্ঠান হইয়াছে, তাহারই সুখের নিমিত্ত অনুক্ষণ ব্যগ্র হই! প্রণয়ের বিচিত্র গতি! মনে মনে যাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সেই আমার সুখ-দুঃখের সমভোগী। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে; মনে মনে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতেও নর-নারী প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিতেছে।

হেমেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। পিতা বর্দ্ধিষ্ঠ পুরুষ; ধনশালী ব্যক্তির পুত্র। লেখাপড়ায় সবিশেষ পারদর্শী না হইলেও তাহার বিবাহের নিমিত্ত ভাবনা চিন্তা নাই। কন্যা সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবে, ভরণপোষণের কখনও কষ্ট পাইবে না, লোকে এই ধ্রুব বিশ্বাসে ধনাঢ্য লোকের পুত্রকে জামাতা করিবার জন্য লোলুপ। বরকর্ত্তা পরম রূপবতী কন্যা পুত্রবধূ করেন, এই মাত্র কামনা! বিষয়ের অভাব নাই, সুন্দরী বধূমাতা গৃহে আনিবেন, তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবেন; এই অভিপ্রায়ে পুত্র যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিতে না করিতে, বিবাহের কারণ উৎসুক হইয়া থাকে। রায় মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া, মনের

মত সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পরম রূপবতী কন্যাকে কনিষ্ঠ পুত্রবধূ করিয়াছেন। তিনি মোক্তারী পরীক্ষা প্রদানের অনতিবিলম্বেই মহেন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল না; পুত্রও মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। দ্বারকানাথ সে সময়ে গৃহস্থের কন্যা দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠবধূ তাদৃশ রূপবতী হয় নাই। মহেন্দ্র বিদ্যানুরাগ বশতঃ দিনে দিনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু পিতার অবস্থার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বিষয় চিরস্থায়ী নহে, জ্ঞানোপার্জ্জনই মহাধন বলিয়া তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। পিতার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দিনেকের নিমিত্তও ভাবিত হইতে হইবে না, এরূপ ধারণা এক দিনের নিমিত্তও তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। তিনি আপনার অক্ষমতার প্রতিই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন এবং কি প্রকারে নিজ ব্যয়ে সংসার চালাইতে সক্ষম হইবেন, নিরন্তর সেই বিষয়েই চিন্তিত থাকিতেন। সংসারে গণ্য মান্য হইয়া দিনাতিপাত করিবেন, কখনও কাহার পলগ্রহ হইয়া থাকিবেন না, ইহাই তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প ছিল। যাবজ্জীবন পিতার দরিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অবস্থার পরিবর্ত্তনজনিত বিলাস ও ভোগবাসনায় তাঁহাকে আসক্ত করিতে পারে নাই। তিনি পিতার দীনাবস্থায় যে ভাবে কালক্ষেপণ

করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইভাবে কালযাপন করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয় আলোকিত। তিনি সংসারের গতিবিধি সমস্তই অবগত হইয়াছেন; তাহাতে দুঃখ-জীবনে তিনি বিশেষ ভুক্তভোগী; অকস্মাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার হৃদয়গত উন্নতভাব ভিন্ন-ভাবে কদাচ পরিণত হইবার নহে।

পিতার উন্নতির সূত্রপাতে হেমেন্দ্র জন্ম গ্রহণ করে। দাসদাসীগণ আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাহাকে লালন পালন করিয়াছে। অধ্যয়নকালে বাটীতে শিক্ষক। যাহাতে কোন বিষয়ের অভাব না হয়, পিতা ও ভ্রাতা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাহার মুখ হইতে কোন বিষয়ের কথা উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই, আবশ্যকীয় বস্তু তাহার হস্তগত হইত। অভাগা হেমেন্দ্রনাথ মনঃ-সংযোগ করিয়া অধ্যয়নে রত থাকিলে অবশ্য মহেন্দ্র অপেক্ষাও উন্নতি লাভ করিতে পারিত। জ্যেষ্ঠের পাঠ্যা-বস্থায় যে সকল অভাব ঘটিয়াছিল, এক দিনের নিমিত্ত হেমেন্দ্র তাহা জানিতে পারে নাই। অধ্যয়নকালে আবশ্যকীয় পুস্তকাদি ও গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত ছাত্র-দিগের আর কোন অভাব নাই। কেহ কেহ বা দুঃখে কষ্টে, পরের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া, এই সকল সংগ্রহ করিয়া তদ্গতচিত্তে বিদ্যোপার্জ্জন করে। আর কেহ বা সঙ্গতি সত্ত্বেও হীনবুদ্ধি বশতঃ ক্রীড়া ও আমোদে মত্ত হইয়া উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করিয়া থাকে। মহেন্দ্রনাথ দুঃখে কষ্টে বিদ্যালাভ করিয়াছেন,

অভাগা হেমেন্দ্র কোন বিষয়ে অভাব না থাকিলেও, কল্পিত অভাবের অনর্থক ভাবনা চিন্তায় জ্ঞানোপার্জ্জনে বিমুখ হইয়াছে।

সংসারে গুণেরই আদর হইয়া থাকে। গুণবান লোকের প্রতি সকলেই সস্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত করে। জগতে যে ব্যক্তির কোন গুণ নাই, পিতার মান-সম্ভ্রম বশতঃ অনুগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাহার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার সমাজে নাম নাই। মহেন্দ্রনাথ ধনাঢ্যের সন্তান, তাহাতে সুপণ্ডিত; দিনে দিনে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেমেন্দ্রনাথ বাল্যকালাবধি অসার আমোদ-প্রমোদে দিনাতিপাত করিয়াছে, যৌবনাবস্থায় সংসর্গ-দোষে দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে, লোকে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে; কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র গতি! তিনি যে কি ভাবে বিশ্বকার্য্য চালাইতেছেন, ক্ষণেকমাত্র চিন্তা করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। মৃণালে কণ্টক, কুসুমে কীট, বিষধর ফণীর মস্তকে মণি, ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার ক্ষণেকমাত্র চিন্তা করিলেও ভাবুকের হৃদয় এককালে মোহিত হইয়া যায়। সমাজে মহেন্দ্রনাথের সুখ্যাতির সীমা নাই। পুত্রের পরিচয়ে পিতামাতার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল; কিন্তু মহেন্দ্র সকল গুণে বিভূষিত হইয়াও মনের সুখ লাভ করিতে পারেন নাই; সহধর্ম্মিণীর কুৎসিত প্রকৃতির জন্য মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী সাতিশয় কলহপ্রিয়া ও আপনার গর্ব্বে সদাই গর্ব্বিতা; মহেন্দ্র তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, এক্ষণে পরি-

ত্যাগ করিলে সমাজে সকলেই তাঁহার নিন্দা করিবে; তাহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছে। এ অবস্থায় কি প্রকারেই বা তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে পারেন। অধিকন্তু হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ কোন বিধান নাই যে, তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিবাদে দিনাতিপাত করিবেন! কেহ তাঁহার কারণ মনে দুঃখিত হয়, মহেন্দ্রনাথ আবার সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি পৃথিবীর সকলকেই ভাই ভগ্নীর মত জ্ঞান করিতেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকায়, তিনি সেই মুখরা রমণীকেই বিশেষ আদরের সামগ্রী ভাবিয়া যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন। অভাগিনী আপনার দোষ কিছুই দেখিত না। সে আপনি নির্দ্দোষী, আর সকলকেই স্বার্থপর বলিয়া জানিত। শ্বশুর শাশুড়ী সরলহৃদয় হইলেও তাহার তাঁহাদিগের প্রতিও স্নেহ-মমতা বা বিশ্বাস ছিল না; অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আপনি যাহা করিত, তাহাই ভাল বলিয়া জানিত। সংসারে আপনার পুত্র-কন্যাকেই কেবলমাত্র আপনার বলিয়া জানিত। হেমেন্দ্র তাহার কথামত কার্য্য করিতেন না বলিয়া, রমণী সদাই অসন্তুষ্টা; দিনে দিনে মহেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার এরূপ বিদ্বেষভাব হইয়াছিল যে, হিন্দু-রমণী হইয়া স্বামীর মৃত্যুকামনা করিত। সরলমতি মহেন্দ্রনাথ তাহাকে কত যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কত যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই। সে আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী

বলিয়া জানিত, লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপও করিত না। তদ্ব্যতীত সেই রমণী ধনশালী লোকের পুত্রবধূ, স্বামীরও এক্ষণে মাসিক পাঁচ ছয় শত টাকা আয়; ইহাতে এককালে অহঙ্কারে মত্তা হইয়া কাহারও কোন কথায় সে কর্ণপাত করিত না। বাটীর গৃহিণী হইতে পরিচারিকা পর্য্যন্ত সকলের সহিত তাহার বাদ-বিসম্বাদ হইত; স্বামী দিবাভাগে পরিশ্রম করিয়া রজনীযোগে যে সুখে নিদ্রায় ক্ষেপণ করিবেন, তাহারও সে কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। রাত্রিকালে স্বামীসহ গৃহে শয়ন করিয়া সংসারের কথা নিত্য নিত্য পতির কর্ণগোচর করিত, মহেন্দ্রনাথের সে সকল কথা শ্রবণে অনিচ্ছা থাকিলেও পত্নীর গঞ্জনাভয়ে শুনিতে বাধ্য হইতেন। পর দিবস প্রভাতে সহধর্ম্মিণীর কথামত কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে, মহা গোলযোগে পতিত হইতেন। বালক যেরূপ আদৌ পাঠাভ্যাস না করিয়া বিদ্যালয়ে যাইয়া, শিক্ষক মহাশয়ের গঞ্জনা বা প্রহার আশঙ্কায় আকুলিত হয়, মহেন্দ্রনাথেরও সেইরূপ গতিক দাঁড়াইয়াছিল! রাত্রি—লোকের বিরামদায়িনী। প্রকৃতিদেবী এই সময়ে সুচারু শোভায় ভূষিতা হইয়া ধরাবাসী জীবজন্তুদিগের হৃদয় হইতে চিন্তা আকর্ষণ করেন; নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতে থাকে। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের পক্ষে এই শান্তিময়ী রজনী যাপন গুরুতর ব্যাপার; তিনি বনিতার আশঙ্কায় শয়নঘরে যাইবার পূর্ব্বক্ষণ হইতেই মনে মনে ইষ্টদেবের নাম

স্মরণ করিতেন। বিবাহ দিবসাবধি সহধর্ম্মিণীর প্রতি মহেন্দ্র একান্ত আসক্ত, একদিনের নিমিত্তও স্ত্রীর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই, চিরকালই তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার সোহাগেই এক্ষণে পত্নী মুখরা ও গর্ব্বিতা হইয়াছে, এখন প্রতিকারের আর উপায় নাই। পত্নী তাঁহাকে যাহা করিতে বলিত, কথামত কার্য্য না হইলে আর তাহার ক্ষোভের সীমা থাকিত না। এইরূপ প্রশ্রয় দিয়া মহেন্দ্রনাথ নিজের দোষে নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। এমনকি সময়ে সময়ে স্ত্রীর কথামত কার্য্য করিতে যাইয়া, পিতা মাতার প্রতিও অসন্তোষভাব প্রকাশ করিতেছেন। এক্ষণে মহেন্দ্রনাথ ভার্য্যার চরিত্র সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু নিজ হস্তে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, তাহার ফল আস্বাদনে কটু হইলেও তাঁহার আদরের সামগ্রী ভাবিয়া উৎপাটন করিতে অশক্ত। জগতে সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত লোক অতি বিরল; মহেন্দ্র নাথের কোন বিষয়েই দোষ নাই, লেখাপড়া বা চরিত্র সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য সকলের আদর্শ স্থল; সমাজে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীর আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহে তাঁহার ভিন্ন মূর্ত্তি। পরমারাধ্য জনক জননীও দিনে দিনে তাঁহার নয়ন-শূল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্নেহ নীচগামী। মহেন্দ্রনাথের লোকের নিকট যশ আছে, সকলেই মহেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি করিয়া থাকে, ইহাই মাতা পিতার পরম লাভ। তাহাতে তাঁহারা উভয়েই প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছেন, আর কত কালই বা এ সংসারে থাকি-

বেন ?. নয়ন মুদিলে মহেন্দ্র ও হেমেন্দ্রই তাঁহাদিগের বিষয়ের অধিকারী হইয়া বংশ রক্ষা করিবে; এই ভাবিয়া তাঁহারা মহেন্দ্রনাথের কোন কথাই দূষণীয় ভাবে গ্রহণ করিতেন না।

হতভাগ্য হেমেন্দ্র লেখাপড়া ও চরিত্রে হীন হইলেও, পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহারা যখন তাহার চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করিতেন, হেমেন্দ্র কোন কথায় দ্বিরুক্তি উত্থাপন না করিয়া অবনতমস্তকে সমুদয় শ্রবণ করিত; কিন্তু স্বভাব দোষে পুনরায় সেই সকল অপরাধে অপরাধী হইত। পিতার উন্নত অবস্থার সূত্রপাতেই তাহার জন্ম হইয়াছে এবং দিনে দিনে পিতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত তাহার বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। একদিনের নিমিত্তও সাংসারিক অভাব যে কি ভয়ঙ্কর, সে ধারণা তাহার হৃদয় মধ্যে উদয় হয় নাই! বাল্য-কালাবধি বিলাসভোগে ক্ষেপণ করিয়াছে এবং চিরকাল এই ভাবেই অতি বাহিত হইবে, মনে স্থির জানিয়াছে। অবস্থার যে নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তন, সে ধারণা তাহার মনে একবার মাত্রও উদয় হয় নাই। তাহাতে কতকগুলি ইতর-প্রকৃতি সঙ্গীদিগের সহবাসে স্বভাব চরিত্র এককালে নষ্ট করিয়াছে। চরিত্র অধোমুখে অগ্রসর হইলে, অকস্মাৎ তাহার গতিরোধ বিবেচক মনুষ্যের পক্ষেও সুলভ সাধ্য নহে। মূর্খ হেমেন্দ্র তদ্বিষয়ে কি প্রকারে প্রতিকার করিবে? বয়স্য সঙ্গীদিগের সহিত সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ, কুস্থানে গমন এবং মদিরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদি সেব-

নের বশবর্ত্তী হইয়া, সামাজিক কার্য্যে এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পিতার তাড়নায় সময়ে সময়ে স্বভাব সংশোধনে উদ্যোগী হইলেও, তদ্বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। যে সময় বন্ধুবর্গ বিহীন হইয়া গৃহ মধ্যে হেমেন্দ্র একাকী থাকিত, সে ক্ষণ তাহার পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ বোধ হইত। কোন সুযোগে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই, সে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। হেমেন্দ্র গুরুজনের লাঞ্ছনা, লোকাপবাদ কিছুই গ্রাহ্য করিত না। সর্ব্বদা সঙ্গীগণের সহিত বিলাস ভোগে মত্ত থাকিয়া সময় ক্ষেপণ করিবে—এই মাত্র তাহার অভি-সন্ধি। সংসারে সুরা ও বারাঙ্গনাই পরমবস্তু বলিয়া জানি-য়াছে। এক মাত্র জননীর বাৎসল্য ভাবই এই সর্ব্ব-নাশের মূল কারণ; নতুবা মধ্যে মধ্যে রায় মহাশয় যে রূপ তিরস্কার করিতেন, তাহাতে ফলদর্শিতে পারিত।

রায় মহাশয়ের গৃহিণী স্বামীর অজ্ঞাতসারে হেমেন্দ্র নাথকে আবশ্যক মত দুই দশ টাকা প্রদান করিতেন। রমণী কোমল প্রকৃতি, তাহাতে হেমেন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র! মাতার ছোট ছেলের প্রতিই অপেক্ষাকৃত অধিক যত্ন প্রদর্শিত হয়। হেমেন্দ্রনাথ টাকার আবশ্যক হইলেই মাতার নিকট জানাইত, মাতা পুত্রের যে সর্ব্ব-নাশ করিতেছেন, দত্ত টাকায় যে পুত্রের অধোগতি হইতেছে—বারেক মাত্রও ভাবিয়া দেখিতেন না; হেমেন্দ্র নাথের যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তৎক্ষণাৎ, ঋণ পরি-শোধের ন্যায়, অম্লান বদনে প্রদান করিতেন। বিশেষতঃ

কর্ত্তা ও, গৃহিণী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, হেমেন্দ্র নাথের স্বভাবের আর কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইবে না, উত্তরোত্তর অধোগতি হইতেছে; তখন আর তাহাকে তাদৃশ তির-স্কারও করিতেন না। তাহাতে তাঁহারা উভয়েই সরল মতি, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবার—তাহাই ঘটিবে; এক্ষণে, তাঁহাদিগের জীবদ্দশায়, অভাগা কষ্ট পায়—সে দুঃখ, অসহ্য জ্ঞান করিয়া সময়ে সময়ে অভাব পূরণ করিয়া দিতেন। রায় মহাশয় এসময়ে এরূপ সঙ্গতিপন্ন হইয়া ছিলেন যে, তিনি দুই শত টাকা পুত্রদ্বয়ের মাসিক ব্যয় হিসাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া ছিলেন। হেমেন্দ্র এই এক শত মুদ্রা ব্যতি-রেকে জননীকে দুই চারিটী মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, তাঁহার নিকট হইতেও প্রতিমাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা হস্তগত করিত; কিন্তু সেই সমস্ত অর্থ অসৎ কার্য্যেই ব্যয় হইত।

এরূপ ইতর প্রকৃতি হেমেন্দ্র নাথের ভাগ্যেও পরম গুণবতী রমণী লাভ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া ছিলেন; তাহা তাঁহার সার্থক হইয়াছিল। ভাগ্য-দোষে পুত্র দুশ্চরিত্র হইলেও তাঁহার কনিষ্ঠা বধূ-মাতা সাতিশয় গুণবতী। তিনি শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। গৃহে দাস দাসীর অভাব ছিল না, তথাচ তিনি গৃহিণীর মত গৃহকার্য্যে একান্ত অনুরক্তা! সামান্য ভৃত্য হইতে পরিবারভুক্ত গুরুজন সকলের সহিত এরূপ ভাবে তিনি ব্যবহার করিতেন যে, জগতে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন কথার উত্থাপন করে

নাই। সংসারে তিনিই যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—দেখিতে পরম রূপবতী, তাহাতে স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকিলে নারী-সমাজে আদর হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল! কাহাকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রয়োজন; সমুদয় বিষয়েই তিনি সম্যক বিদিতা ছিলেন। একদিনের নিমিত্ত কেহ তাঁহার নিন্দা বা কুৎসা করে নাই। তিনি লজ্জাশীলা, পতিপ্রাণা, কর্ম্মিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রা রমণী ছিলেন। ভাশুরকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন, ভাশুর-জায়াকেও বয়োধিকা ভগ্নীর সমান ভক্তি করিতেন। মহেন্দ্রের স্ত্রীর পৈত্রিক বিষয়াদি কিছুই ছিল না; তাহাতেও কিন্তু স্বামীর বিদ্যা ও শ্বশুরের ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিতা হইয়া, রমণী দীন দুঃখী দূরে থাকুক, আত্মীয় স্বজন দিগেরও সহিত মিষ্টালাপ করিত না। হেমেন্দ্রের সহ-ধর্ম্মিণীর পৈত্রিক সম্পত্তির অভাব নাই, মাসে মাসে তিনি পিতার নিকট হইতে ২০।২৫ টাকা জল খাবার হিসাবে পাইতেন। দেখিতে পরম সুন্দরী, অঙ্গসৌষ্ঠব মনোমুগ্ধ-কারী, মিষ্ট-ভাষিণী—সকল কার্য্যেই দক্ষা; সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া হিন্দুরমণীর যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য, তিনি তৎসমুদায় সম্যকরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, অধিকন্তু কিছুতেই গর্ব্ব নাই। অন্যায় কারণে মধ্যে মধ্যে ভাশুর-পত্নী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কটূক্তি প্রয়োগ করিলেও, তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বহির্গত হইতনা। তিনি সাতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও ধীরস্বভাবা ছিলেন; বাটীর গুরুজন

বর্গের আহারাদি সমাপ্ত না হইলে, আপনি জল গ্রহণও করিতেন না। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের দুশ্চরিত্রের জন্য রমণী একান্ত মর্ম্মাহতা, পতির মঙ্গল-কামনা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা! যাহাতে পতির সুমতি হয়, চরিত্রের সংশোধন হইয়া সংসারধর্ম্মে মতিগতি ফিরে, তদ্বিষয়ে সদত চিন্তা করিতেন।

হিন্দু-ললনার স্বামীই এক মাত্র উপাস্য দেবতা। রমণী স্বামীর ভালবাসা ও স্নেহ স্বর্গীয় সুখাপেক্ষাও পরম বস্তু বলিয়া জানে। যাহাতে স্বামী সুখস্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে দিবা নিশি অতিবাহিত করে, তদ্বিষয়ে যত্নবতী; এক মাত্র স্বামীই তাঁহার বিরামস্থল! সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে মনোবেদনা উপস্থিত হইলে, পতির নিকট সেই সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া সতী নারী হৃদয়কে সান্ত্বনা করে। স্বামীই সতীর ইহ জীবনের সম্বল, ছায়া যে প্রকার কায়ার অনুগামিনী; সেইরূপ পতিপ্রাণা হিন্দুললনা স্বামী-সঙ্গিনী! স্বদেশ বিদেশ, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই পতির নিকটে থাকিয়া সাধ্বী সতী পরম আনন্দ অনুভব করে। পতিগতপ্রাণা কামিনী পতি ভিন্ন এজগতে আর কিছুই জানে না। ইষ্টদেবতাপেক্ষাও পতিকে ভক্তি করিয়া থাকে। পতির প্রফুল্ল চিত্ত সন্দর্শনে সতীর হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, পার্থিব কোন সুখই তাহার সমতুল্য নহে। পতির নিকটে থাকিয়া দিনান্তে আহার পাইতেছে, দুঃখ কষ্টে সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাতেও সতী নারী কদাচ পতিগৃহ ত্যাগে সম্মতা নহে। স্বামীই সতীর ঈশ্বর, স্বামী ব্যতিরেকে তাঁহার

আরাধ্য দেবতা জগতে আর কেহ নাই। রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্র-বধূ পতিপ্রাণা! পতির কি প্রকারে সুমতি হইবে, তিনি সমাজে গণ্য মান্য হইবেন, লোকের নিকট আদর পাইবেন, তাঁহার স্বভাব চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সৎ ও সাধু পুরুষ হইবেন, বিষয়কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিবেন, এই বাসনাই তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরিতা। তিনি হেমেন্দ্র নাথের স্বভাব সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, তাহার সংশোধনের বিধি মতে চেষ্টা পাইয়াছেন; অনুনয় বিনয় করিয়া পতির চরণে কত অশ্রু পাত করিয়াছেন; কিন্তু পাপাত্মার কঠিন হৃদয় কিছুতেই কোমল হইবার নহে। আজন্ম কাল সঙ্গদোষে হেমেন্দ্র যে সকল দোষাসক্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে অপরিহার্য্য! হয়ত কোন দিন রাত্রি শেষে বাটী আসিল, কোন কোন সময়ে স্থানান্তরে রজনী যাপন করিল: অভাগিনী রমণী সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা হইয়াও, অসৎচরিত্রের হস্তে পড়িয়া এক দিনও মনের সুখ পান নাই, উত্তরোত্তর পতিনিন্দা যথায় তথায় শুনিয়া থাকেন; সতীর হৃদয়ে পতিনিন্দা বজ্রাঘাতাপেক্ষাও গুরুতর ও কষ্টপ্রদ। কোথাও বসিয়া আছেন, কথাচ্ছলে স্বামীর কথা উত্থাপিত হইবামাত্র, তিনি তথা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। পতি পরম গুরু, গুরুনিন্দায় কর্ণপাত করিলে মহাপাতক হইবে; সংসারে তিনি পাতকী পতিকেই পরম যত্নের বস্তু বলিয়া জানিয়াছেন। তিনি হেমেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় জাগরিতাবস্থায় সারারাত্রি ক্ষেপণ করেন। হেমেন্দ্র

সতীর মনে যে এরূপ দারুণ ব্যথা প্রদান করিতেছে, তদ্বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। পাপমতি আপনার আনন্দ হইলেই সংসারের সকল কার্য্য হইল—স্থির জানিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে গৃহে আসিয়া পত্নীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে; অভাগিনী—পতি-প্রেম-পাগলিনী! স্বামী বিকৃতাবস্থায় বাটীতে আসিলেও তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি সেই মদোন্মত্ত লম্পট স্বামীকেই প্রীতি সম্ভাষণে আলিঙ্গন করিয়া চরিতার্থ হন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে রজনী হেমেন্দ্রের কুহকে মুগ্ধ হইয়া ফণীন্দ্রনাথের দুর্গতি হয়, সে রাত্রি বক্কেশ্বরের গৃহে সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করে। নিদ্রাদেবী জীবের বিরামদায়িনী হইয়াও, সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ফণীন্দ্রনাথ নিরীহ, শান্তপ্রকৃতি ও সুবোধ মতি, রাত্রি কালে শ্বশুরালয় হইতে কোথায় যাইল? পিতার নিকটে ছিল—কোথায় গিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই! যে যুবক পিতা মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, ইহজীবনে কখন কোন কার্য্য করে নাই, সম্মুখস্থিত পিতার আদেশ গ্রহণে উপেক্ষা করিয়া অপরিচিত স্থানে কোথায় গমন করিল? এইরূপ বিবিধ ভাবনা চিন্তায় সকলেই জাগরিতাবস্থায়

নিশি ক্ষেপণ করিল। ক্ষণ কালের নিমিত্তও কাহার চক্ষু মুদিত হয় নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর রায় মহাশয়ের ভৃত্য গোপালের নিকট যদিও তাহারা ফণীন্দ্রের সংবাদ পাইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাহাদের অধৈর্য্য হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হয় নাই। অনন্তর ফণীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রতীক্ষায় সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসিয়াছিল। ফণীন্দ্রনাথ নিশাবসানে গোপাল সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে উপনীত হইলে, সবিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত সকলেই উৎসুক ভাবে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করায়, নিদ্রাদেবী মিত্রজা মহাশয়ের গৃহে আধিপত্য লাভে বিমুখ হইয়া ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। পশু পক্ষী গণের সুমধুর তানে ধরাতলী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকার লোকস্থান হইতে নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইল। চন্দ্রনাথ পুত্রের অদর্শনে বহুক্ষণ কাতর ভাবে যাপন করিতে ছিলেন ফণীন্দ্রের সাক্ষাতে তাঁহার হৃদয়োদ্বেগ দূর হইয়াছে। কিন্তু অরুণদেব আকাশে বিকাশ হইবামাত্র তিনি বৈবাহিকেব নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর পুত্রকে লইয়া খল্‌সিনী প্রস্থান করিলেন। বঙ্কেশ্বর তাঁহাদিগকে থাকিবার জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিলেন, কিন্তু চন্দ্রনাথ কোন ক্রমে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না।—

দ্বারকানাথ প্রভাতে পুত্রের কীর্ত্তির সবিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হইয়া একান্ত অনুতাপিত হইলেন ও মনে মনে আপনাকে যথেষ্ট ধিক্কার প্রদান করিলেন। মহেন্দ্রনাথ নির্ব্বি-

রোধী পুরুষ, অকারণ কাহারও মনে কষ্ট প্রদান করিতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন। তিনি পিতার মুখে কনিষ্ঠের ঈদৃশ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া, একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। ভ্রাতার অসৎ সঙ্গ বশতঃ অধোগতি হইয়াছে, নতুবা এরূপ কার্য্যে কদাচ সে প্রবৃত্ত হইত না; মনে মনে চিন্তা করিয়া তিনি পরিতাপ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। হেমেন্দ্রের লজ্জা সম্ভ্রম এক্ষণে কিছুই নাই, সমাজিক বন্ধন তাহার পক্ষে শিথিল হইয়া গিয়াছে। আপনি যে এরূপ কলুষিত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছে, অকারণ জনৈক নির্দ্দোষী যুবকের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, তজ্জন্য বিষণ্ন হওয়া দূরে থাকুক, প্রফুল্ল বদনে পিতার আদেশানুসারে তাঁহার সম্মুখীন হইল। রায় মহাশয় পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অধোমুখ হইলেন।

সারা রাত্রি হেমেন্দ্র অসৎ সংসর্গে, জঘন্য আমোদ প্রমোদে ক্ষেপণ করিয়াছে; এক্ষণেও তাহার মুখ হইতে মদিরার দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে; চক্ষুদ্বয় লোহিত বর্ণ, ব্যভিচার দোষে মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র ভ্রাতাকে সম্মুখে পাইয়া কোন কথা না শুনিয়া, যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। উগ্রস্বভাব হেমেন্দ্রের সে তিরস্কারে ক্রোধের সঞ্চার হইল, তখনও তাহার সুরাপানের উন্মত্ততা এককালে লোপ প্রাপ্ত নাই! না ভাবিয়া চিন্তিয়া দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্র মহেন্দ্র নাথকে যথেচ্ছা ভাবে কটূক্তি প্রয়োগ করিল। রায় মহাশয় পুত্রের এরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া, গোপালকে হেমেন্দ্রের গলা টিপিয়া বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দিতে

আদেশ করিলেন। গোপাল, রায় মহাশয়ের বাটীতে বহুকালাবধি চাকুরী করিতেছে, প্রভু-পুত্রের গায়ে হস্ত প্রদান করিতে তাহার সাহস হইল না। সে রায় মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে হেমেন্দ্রের নিকটে যাইয়া প্রভুর সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য নিবেদন করিল। হেমেন্দ্রকে লইয়া রায় মহাশয়ের বাটীতে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। এক দিকে রায় মহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ, অন্য পক্ষে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হেমেন্দ্র ; কথায় কথায় উভয় পক্ষেই অনেক বাক্ বিতণ্ডা হইতে লাগিল। এ তাবৎ কাল রায় মহাশয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে মহেন্দ্রনাথ ক্রোধে কম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে বক্কেশ্বর আসিয়া হেমেন্দ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে তাহাকে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন।

এদিকে চন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্র মিত্রজা মহাশয়ের বাটী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার অন্তঃপুরে মহা গোল-যোগ উঠিয়াছিল। মিত্রজা মহাশয় হেমেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে বসাইয়া, অন্তঃপুরে যাইলেন ও তত্রস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সমস্ত ঘটনার বিষয় সবিশেষ বুঝা-ইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছে, নতুবা এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। হেমেন্দ্র বয়স-সুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ করিয়াছে ; নতুবা সে আমাকে পিতৃব্যের মত সম্মান করে। আমার জামাতার যে প্রকৃত অপকার করিবে, এরূপ

ভাবিয়া কদাচ সে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। যাহা হউক যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অকারণ সে সকল কথার আন্দোলন করিয়া সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন নাই। রায় মহাশয়ের নিকট হেমেন্দ্রের যথেষ্ট তিরস্কার হইয়াছে, অতএব আর ও সকল কথা মুখে আনিবারও আবশ্যক নাই। আর এক দিবস বৈবাহিক ও জামাতাকে আনাইয়া আমোদ আহ্লাদ করা যাইবে। চন্দ্র বাবুও সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত আছেন, তিনিত আর বালক নহেন যে, আমাদের প্রতি কুপিত হইবেন। তিনি অবশ্যই সময়ে এ সকল কথা ভুলিয়া যাইবেন? এক্ষণে আর এ সকল কথার আন্দোলন করিয়া মনোবেদনা পাইবার প্রয়োজন কি?" এইরূপ নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে তিনি আত্মীয় স্বজন যে দুই চারি জন রমণী বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, একে একে তাঁহাদিগের সকলকেই বুঝাইলেন। মিত্রজা মহাশয় আরও বলিলেন যে, রায় মহাশয় তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন। যখন যে দায় ঘায় উপস্থিত হয়, রায় মহাশয় বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সমুদয় আপন মস্তকে বহন করিয়া থাকেন, হেমেন্দ্র তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। একথা অপরের নিকট ব্যক্ত হইলে, রায় মহাশয়ই যে মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হইতে পারেন। এইরূপে নানাবিধ কাথাবার্ত্তায় তিনি অন্তঃপুরস্থ কামিনী দিগকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর বহির্ব্বাটীতে হেমেন্দ্র একাকী বসিয়া আছে, তাহার সহিত আবার দুই চারিটী কথাবর্ত্তা না কহিলে, মনে মনে বিরক্ত

হইতে পারে; এই ভাবিয়া বক্কেশ্বর হেমেন্দ্র সমীপে অবিলম্বে উপনীত হইলেন।

রায় মহাশয় পুত্রের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিয়া বাটীতে ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে ছিলেন, কিন্তু সে ভাবেও সুখ বোধ করিলেন না। মিত্রজা মহাশয় তাঁহার পরম বন্ধু, বন্ধুর জামাতা ও বৈবাহিকের অবমাননা হইয়াছে, তাঁহার কুলাঙ্গার সন্তানই এই অনিষ্ট ঘটিনার মূল-কারণ; বক্কেশ্বর চক্ষুলজ্জা বশতঃ মুখে কিছু না বলিলেও, মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন; এই-রূপ ভাবিতে ভাবিতে মিত্রজা মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেমেন্দ্র বক্কেশ্বরের সহিত বাক্যা-লাপ করিতেছিল, পিতাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। এক্ষণে কি উপায়ে চন্দ্রনাথ বাবু সন্তুষ্ট হইবেন, বিগত রজনীর ঘটনাবলী অবগত হইয়া অবশ্যই তাঁহার বৈবাহিকের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে—বন্ধুদ্বয়ে এই সমস্ত বিষয় ভাবনা চিন্তায় অভিভূত হইলেন।

হিন্দুগৃহে কন্যা লইয়া বিষম দায় ভোগ করিতে হয়, দশম বর্ষ অতীত হইবার অগ্রেই পিতা মাতা দুহিতার বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত; যোগেযাগে তনয়ার বিবাহ হইলেও তাঁহাদের নিস্তার নাই; কিরূপে জামাতা সন্তুষ্ট থাকিবে? কি করিলে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে না, এই সকল ভাবনা চিন্তায় তাঁহারা সদত ব্যাকুলিত। কন্যার আজন্মকাল চরিত্রের প্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া জনক জননীকে দিনাতিপাত করিতে হয়। রায় মহাশয়—পাপাত্মা পুত্রের জন্য বক্কেশ্বরের বৈবাহিকের সহিত গোলযোগ বাধিল ভাবিয়া, কি উপায়ে তাঁহা-দিগের আত্মীয়তা-বন্ধন শিথিল না হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে মিত্রজা মহাশয়ের কিছু মাত্র অপরাধ নাই, তাঁহার অজ্ঞাত সারে পাপমতি হেমেন্দ্র এই মহানিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু পুত্রের পিতা কোন সূত্রে বৈবাহিকের বিন্দুমাত্র অপরাধ দেখিলেই, তিলকে তাল প্রমাণ করিয়া থাকে। না জানি চন্দ্রনাথ গত রাত্রির দুর্ঘটনা স্মরণ করিয়া মনে মনে কতই অসন্তুষ্ট হইবেন, হয়ত রাধা-মতিকে তথায় লইয়া যাইয়া আর পাঠাইতে সম্মত হইবেন না। এক্ষণে মিত্রজা মহাশয়ের সংসারে রাধা-মতিই একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার এক মুষ্টি তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া দিবে, এরূপ লোকও কেহ নাই। রায় মহাশয় ও বক্কেশ্বর এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতে করিতে, উভয়েই প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে রায় মহাশয় মিত্রজাকে বৈবাহিক সমীপে একখানি পত্র পাঠাইবার যুক্তি প্রদান করিলেন। মিত্রজ মহাশয় সংসারের দৈনন্দিন-ঘটনাবলী সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, বহুকালাবধি রায় মহাশয়ের চরিত্রের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য রহিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য আপনার স্বভাবের উন্নতি সাধনে সঙ্কল্প করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এক্ষণে একমাত্র দ্বারকানাথই তাঁহার পরামর্শদাতা

এবং সমস্ত বিপদ আপদে ত্রাণকর্ত্তা। রায় মহাশয় প্রমুখাৎ পত্রের বিবরণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়া, বক্কেশ্বর অবিলম্বে সবিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। কামিনী বহুকালের পুরাতন দাসী, সকল কার্য্যেই চতুরা বটে; কিন্তু যাহাহউক স্ত্রীলোক, রমণী সংসারের কূটাভিসন্ধি সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এই বিবেচনায় রায় মহাশয়ের কথামত পত্র খানি তাঁহারই ভৃত্য গোপালের হস্তে—চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট প্রেরিত হইল।

অনন্তর এক দিবস জামাতাকে আনাইয়া সাধ আহ্লাদ করিতে হইবে, এই বিষয়ে রায় মহাশয় ও বক্কেশ্বর বাবুর কথাবর্ত্তা হইতেছে। এমন সময়ে খল-সিনী হইতে পতের মা নাম্নী জনৈক পরিচারিকা এক খানি পত্র লইয়া বক্কেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইল। মিত্রজা মহাশয় বৈবাহিকের দাসীকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ বাবু কুপিত হইয়া এই পত্র লিখিয়াছেন। শোক তাপে তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু মনোগত ভাব গোপন পূর্ব্বক দাসীকে সকলের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রীতি সম্ভাষণে অন্তঃপুরে যাইতে বলিলেন। পতের মা, মিত্রজা মহাশয়ের সহিত দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিয়াই, চন্দ্রনাথ প্রদত্ত পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বক্কেশ্বর পত্রখানি রায় মহাশয়ের সমীপে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পত্র মর্ম্ম

জ্ঞাত হইয়া উভয়ে এককালে বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হই-লেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা সহধর্ম্মিণী গৃহশূন্য করিয়া চলিয়া যাইলেও বক্কেশ্বরের হৃদয়ে এরূপ প্রবল শোক-বেগের সঞ্চার হয় নাই; তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। রায় মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে কহিতেই উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। সুবিজ্ঞ রায় মহাশয় তাঁহাকে নানাবিধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু, পত্রে বক্কেশ্বরকেই গত রজনীর দুর্ঘটনার মূল কারণ এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারেই হেমেন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ ফণীন্দ্রনাথকে বেশ্যালয়ে লইয়া যাইয়া মদিরা সেবন করাইয়াছে—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে তিনি আর তথায় বধূমাতাকে রাখিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতে রাধামতি এক্ষণে পূর্ণ যুবতী। স্ত্রীলোক স্বামীর নিকটে না থাকিলে এ অবস্থায় চরিত্রসম্বন্ধে বিবিধ দোষ স্পর্শিতে পারে, ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রোধসূচক বাক্যে পত্রখানি পূর্ণ ছিল। বক্কেশ্বর নিরপরাধী হইয়াও তাঁহাকে সকল দোষ মস্তক পাতিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যেহেতু তিনি কন্যার জনক, তাঁহার কোন বিষয়ে কোন কথা কহিবার সাধ্য নাই; তাহা হইলে রাধামতিকে যে চিরকাল গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। তিনি কেবল মাত্র অশ্রু-বারি বর্ষণ করিয়া হৃদয়গত শোকাবেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় চন্দ্রনাথকে বিজ্ঞ বলিয়া জানিতেন, সকি-

শেষ বিবরণ না জানিয়া, তিনি বক্কেশ্বরকে অপরাধী করিয়াছেন, পত্রপাঠে জ্ঞাত হইয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

অনেক সংসারেই হিন্দু-ললনার আজি কাল অশেষ দুরবস্থা; একদিনের নিমিত্তও মনের সুখে তাহাদিগের সময় ক্ষেপ হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত না গৃহ-ধর্ম্মে-দীক্ষিতা হয়, আপনার ঘর সংসার আপনি বুঝিয়া লইতে না পারে, তৎকাল পর্য্যন্ত—শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজবনর্গেব বশতাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হয়; এক দিনের নিমিত্তও তাহারা সুখে কাটাইতে পারে না; ভয়ে ভয়ে তাহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, পদে পদে গুরুজনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভাবিয়া চিন্তিয়া অহোরাত্র উদ্বিগ্ন চিত্তে তাহারা কালাতিপাত করে। কিন্তু এইরূপ দুঃখে কষ্টে কাল ক্ষেপ করিয়াও সংসারের প্রতি হিন্দু-ললনার শৈথিল্য ভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। শাশুড়ী ননদিনী প্রভৃতি গুরুজনের তাড়না সহ্য করিয়াও, তাহারা এক কালে হতাশ্বাস হয় না; মনে মনে—সময়ে আপনি গৃহিণী হইবে, সে সময়ে আব গুরুজনদিগের পীড়ন ও তিরস্কার ভোগ করিতে হইবে না; এইরূপ আশায় আশ্বাসিত হইয়া, একমাত্র পতির আদরের প্রতি নির্ভর করিয়া, তাহারা আনন্দে কালাতিপাত করে। পতি-প্রাণা হিন্দু-ললনা একমাত্র স্বামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের সুখ দুঃখেও প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করে—আমাদিগের সামাজিক বন্ধন এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। ভাগ্যদোষে পতি যাহার প্রতি

বিরূপ, অধিকন্তু যাহাকে শ্বশুরালয়ে শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনবর্গের বিষম বাক্যযন্ত্রনা সহ্য করিতে হয়; তাহার পক্ষে সংসার বিষময়! সে রমণী প্রতিক্ষণেই আপনার মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর শোক তাপে ব্যথিতা হইয়া জাতি-ধর্ম্ম-পালনেও বিমুখ হইয়া উঠে। এই যে এক্ষণে পথ ঘাটে অসংখ্য বারবিলাসিনী দেখিতে পাওয়া যায়, সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, অনেকেই এই রূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রায় মহাশয় অনেকক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া থাকিয়া বক্কেশ্বরের উপস্থিত বিপদের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে একমাত্র জগদীশ্বরই বক্কেশ্বরের সহায়। তিনি যাহার অদৃষ্টে যেরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, অবশ্যই সেইরূপ ঘটিবে; তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন মনুষ্যের সাধ্যাতীত। উপস্থিতে অকারণ ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করা মাত্র—জানিয়া, মিত্রজা মহাশয় অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাধামতি একাকিনী রন্ধন-শালায় রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছে। আত্মীয় স্বজন যে দুই চারিজন স্ত্রীলোক কমলার শ্রাদ্ধ দিবসে উপনীতা হইয়া ছিল, ইতিপূর্ব্বেই যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছে। একমাত্র কামিনী গৃহকার্য্যে নিযুক্তা। পতের মা রাধামতির নিকটে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছে। বক্কেশ্বর রাধামতি সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মা! তোমার শ্বশুর তোমাকে

লইয়া যাইবার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" রাধামতি পিতার মুখের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পিতা পুত্রী কাহারও মুখ হইতে একটীও কথা বহির্গত হইল না; উভয়েই উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দারুণ শোকোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উথলিয়া উভয়েরই নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মুখে কথা নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উভয়েরই যেন নিষ্পন্দ! রাধামতি আজন্ম কাল পিতা মাতার একমাত্র আনন্দের সামগ্রী; সংসারে কন্যা সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, তাহার কোন বিষয়ে এক দিনের নিমিত্ত আন্তরিক বা বাহ্যিক কিছুমাত্র কষ্ট না হয়—বক্কেশ্বর ও কমলা অবিরত তদ্বিষয়ে সযত্ন ছিলেন। ভাগ্যদোষে জননী সংসারের মায়া দয়া কাটাইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন, রাধামতির একমাত্র জুড়াইবার ঠাঁই—পিতা। এক্ষণে সেই পিতার আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, মাতৃশোকানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে, পিতাকে একাকী রাখিয়া রাধামতি ভর্ত্তৃগৃহে যাইবে—এই সকল ভাবিয়া যুবতীর হৃদয়ে শোকের বেগ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। রাধামতি আর দুর্নিবার শোকতাপ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "মা গো!" "কোথায় গো!" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিল। তনয়াগতপ্রাণ বক্কেশ্বর পুত্রীকে সাদর সম্ভাষণ ও সান্ত্বনাবাক্যে রোদনে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাধামতি এই ভাবে বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া পিতার আহারাদির উদ্যোগ করিতে যাইল।

কাল—সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। নিত্য নিয়মিত ভাবে আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব আকাশের মধ্য-ভাগে উপনীত হইয়াছেন, প্রখর কিরণে ধরাতল উত্তা-পিত। এ সময়ে গৃহস্থ অনেকেরই বাটীতে আহারাদি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বক্কেশ্বরের আজ দুঃখের দিন, তাই এখনও তাঁহার বাসিমুখে জল পড়ে নাই। রায় মহাশয় বক্কেশ্বরের প্রকৃত বন্ধু—বিপদ আপদে বুক দিয়া সহায়তা করিয়া থাকেন; কিন্তু নিজ কাজ কর্ম্মে সদত ব্যস্ত, অকর্ম্মণ্য ভাবে বক্কেশ্বরের নিকট বসিয়া থাকিবেন, এরূপ তাঁহার সময় কোথায়? রাধামতি ব্যতি-রেকে মিত্রজা মহাশয়ের জন্য কে আর ব্যথিত হইবে? রাধামতির বক্কেশ্বর, বক্কেশ্বরের রাধামতি। পিতা কন্যাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছানু-সারে দুহিতাকে আপনার নিকটে রাখিবার অধিকার নাই। শ্বশুরালয়ে রাধামতির শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমান! তাঁহারা যত কাল জীবিত থাকিবেন, কন্যাকে আপনার গৃহে রাখিতে হইলে তাঁহাদিগের অনুমতি বিনা বক্কেশ্বরের রাখিবার ক্ষমতা কোথায়? তাঁহাদের অবর্ত্তমানে জামাতার অনু-মতি লইতে হইবে। রাধামতি শ্বশুর গৃহে দুইবার মাত্র যাইয়া ছিল। বিবাহের পরেই একবার যায়, সে সময়ে রমণী শাশুড়ী ননদিনীর ভাব ভক্তি বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। নূতনবধূ গৃহে আসিল, দুইতিন দিবস মাত্র থাকিবে, এই ভাবিয়া সকলেই তাহার প্রতি সমাদর করিয়া

থাকে। রাধামতিরও সেইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বারে প্রায় এক মাস তথায় তাহাকে কালক্ষেপ করিতে হয়; এই সময়ে রাধামতি তাঁহাদিগের প্রকৃত ব্যবহার সবিশেষ বুঝিয়াছিল। গৃহস্থের বধূকে যে ভাবে থাকিতে হয়, রাধামতি সে সকল রীতি নীতি কিছুমাত্র শিক্ষা করে নাই' কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইয়াছিল। রাধামতি পিতা মাতার একমাত্র কন্যা। বক্কেশ্বরের অপর সন্তান সন্ততি আর কেহই ছিল না; সুতরাং জনকজননীর স্নেহ যত্নে অনুক্ষণ সুখে কালযাপন করিয়াছে। শ্বশুরালয়ে সেরূপ যত্ন তাহাকে কে করিবে? বিশেষতঃ গৃহস্থালী কাজ কর্ম্মে রাধামতি এককালে অপটু। শাশুড়ী কোন কাজের কথা বলিলে, রাধামতি মনে মনে বিরক্ত হইত। সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা ভয়ে কার্য্য করিতে যাইয়া, অসাবধানতা প্রযুক্ত তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিত না। শাশুড়ী দুই এক দিবস দেখাইয়া দিতেন, তৃতীয় দিবসে তাঁহার অভিলাষানুযায়িক কার্য্য না হইলে, তিরস্কার করিতেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর ভৎসনা বধূদিগের পরিণামে হিতকর, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পিতামাতা যেরূপ পুত্রের লেখাপড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন; কিরূপে তাহার বিদ্যালাভ হইবে, স্বভাব চরিত্র ভাল থাকিবে, অনুক্ষণ এই সকল বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী! সেইরূপ নবাগতা বধূকে গৃহস্থালী কার্য্যে সুদক্ষা করিবার উদ্দেশেই শাশুড়ী বধূদিগের প্রতি সময়ে সময়ে তিরস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র বাল্যকালাবধি জনক জননীর প্রতি ভক্তি করিয়া তাঁহা-

দিগের আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ যে সকল বধূ, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের উপদেশানুসারে কাজ কর্ম্মে যত্নসহকারে মনঃসংযোগ করে, পরিণামে তাহাদিগেরই সুখ্যাতি ঘোষিত হয়। বাল্যাবস্থা শিক্ষার সময়, কিন্তু রাধামতি পিতৃ মাতৃ স্নেহে—সুখ সম্ভোগেই কালাতিপাত করিয়াছে। এক দিনের নিমিত্ত কোন বিষয়ের জন্য তাহাকে কষ্টোভোগ করিতে হয় নাই। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে যুবতী এককালে অক্ষমা; এ অবস্থায় শ্বশুর গৃহে বাস তাহার পক্ষে সাতিশয় কষ্টকর। তাহাতে যে স্নেহময়ী জননীর একমাত্র বাৎসল্যে দিনেকের নিমিত্তও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই, সেই দয়াবতী এক্ষণে আর নাই! অভাগিনীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চিরকালের নিমিত্ত প্রস্থানকরিয়াছেন। এ অবস্থায় রাধামতি শ্বশুরালয়ে নীতা হইলে, অকালেইবা কাল-কবলে নিক্ষিপ্তা হইবে! দুহিতা পিতার মুখ দেখিয়া মাতৃশোক সময়ে সময়ে বিস্মৃতা হইয়া থাকে, কিন্তু সেখানে সেরূপ বাৎসল্যভাবে কে আর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? হিন্দু কুলবধূ ভর্ত্তৃগৃহে কারাবদ্ধ বন্দীস্বরূপা! তাহার ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই। গুরুজন যখন যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। সুখ অসুখেও সদা শঙ্কিত ভাবে রমণীকে থাকিতে হয়। রাধামতির যেরূপ উপস্থিত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাকে

ভর্ত্তৃগৃহে পাঠাইয়া বক্কেশ্বরই কি প্রকারে শান্তহৃদয়ে কালক্ষেপ করিতে পারেন? বিশেষতঃ এক্ষণে রাধামতি বক্কেশ্বরের একমাত্র অবলম্বন, মিত্রজা মহাশয় রাধামতিকে পাঠাইয়া কি প্রকারে একাকী শূন্য গৃহে থাকিবেন? এ সময়ে রাধামতি স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার সংসারবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। বক্কেশ্বর এই সকল ভাবিয়া বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

যথাকালে সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে, বক্কেশ্বর রায় মহাশয়ের নিকটে পরামর্শ উদ্দেশে গমন করিলেন। অনেক কথবার্ত্তার পর উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন যে, এ সময়ে পাঠানে৷ কান ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অনন্তর মিত্রজা মহাশয় বৈবাহিকের দাসীর হস্তে সবিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। দাসী সেদিন তাঁহারই বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পরদিবস প্রাতেঃ খল্‌সিনী যাত্রা করিল। গোপাল ও ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথকে পত্র দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। মিত্রজা মহাশয় এতাবৎ কাল বিষম সংশয়ে কালাভি-পাত করিতেছিলেন, এক্ষণে যেন তাঁহার শরীর কতক পরিমাণে সুস্থ হইল। মিত্রজা মহাশয় গোপালের নিকট চন্দ্রনাথের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, অকস্মাৎ ক্রোধ-বশতঃ ইযে চন্দ্রনাথবাবু রাধামতিকে লইয়া যাইবার কথা লিখিয়াছিলেন, সিদ্ধান্ত করিলেন। অনন্তর পিতা পুত্রী— উভয়ের আপাততঃ মনের আনন্দে একত্রে যাপন হইতে লাগিল।

বক্রেশ্বরের পাদ-দেশে কমলার মৃত্যু দিবসে যে দারুণ আঘাত লাগিয়া ছিল, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে! কিন্তু বেদনা এককালে যায় নাই, যষ্ঠি ব্যতিরেকে তিনি এখনও এক পা চলিতে পারেন না। লোকের বিপদ সময়ে জ্ঞান রহিত হইয়া থাকে, তিনি এই পায়ে যথায় তথায় গমনাগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে মনের উৎকণ্ঠা একপ্রকার দূর হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পতিপ্রাণা হিন্দুললনা স্বামীর সুখ দুঃখের সমাধিকারিণী। পতি সুখে থাকিয়া সংসার কার্য্যে সংযত থাকিলেই, সতী সংসারের ঘাত প্রতিঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিয়া প্রফুল্লচিত্তে দিনাতিপাত করে। স্বামীই হিন্দুনারীর উপাস্য দেবতা, স্বামীর মঙ্গল বিধানেই রমণী অনুক্ষণ যত্নবতী। জনসমাজে পতির সুখ্যাতি ঘোষিত হইলে হিন্দুনারী আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। বস্তুতঃ হিন্দুললনার সুখ দুঃখের পতিই মূল। সাংসারিক কার্য্যে পতি যেরূপ পরিচয় প্রদান করেন, সমুদয় বিষয়েই রমণীকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সংসারে স্বামীই পত্নীর একমাত্র আশ্রয় স্থান। পতি সহধর্ম্মিণীকে যে ভাবে চলিতে আদেশ করিবেন, ভাল মন্দ বিবেচনা শূন্যা হইয়া

পত্নীকে সেই ভাবেই কার্য্য করিতে হইবে। পতির অনুমতি ব্যতিরেকে রমণীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবারও অধিকার নাই। আহার বিহার, সকল বিষয়েই স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি নির্ভর করিতে হয়। পতির সন্তোষ-সাধন অভিলাষে হিন্দু-ললনা যেরূপ যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেরূপ আর কোন দেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নারীজাতি—অভিমানিনী! যে পতির কারণ প্রাণপণ করিয়া দিবানিশি পরিশ্রম ও চিন্তা করিতেছেন, সেই স্বামী তাহার প্রতি অনাদর করিলে—তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না। একমাত্র পতির প্রেম-ভিখারিণী হইয়াই হিন্দু-তনয়া ইহ জীবন পতি-সেবায় নিয়োজিতা রাখেন। তাহার প্রতিদান স্বরূপ পতির স্নেহ মমতা না পাইলে, তাহার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় কিরূপে শান্তিলাভ করিবে? তদ্গত চিত্তে সতী যদি স্বামীর অনুরাগিণী, পতির সম্পদ বিপদের সমাধিকারিণী, পতি সেই পতিপ্রাণা পতিব্রতার প্রতি অযথা ব্যবহার করিলে অবশ্যই তাহার হৃদয়ে শক্তিশেল বিদ্ধ হইতে থাকে এবং একমাত্র পতিপ্রেম ব্যতিরেকে কিছুতেই সে শোকরাশি বিদূরিত হয় না। মনে মনে সতীনারী যে পতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, সে ভাব অকৃত্রিম; তাহাতে সুখ-দুঃখজনিত সাংসারিক বৈষম্যে কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় না। স্বামী সহস্র দোষে অপরাধী হইলেও হিন্দুললনার যত্নের নিধি; রূপ, গুণ, ধন—কোন বিষয়েরই অভাবজনিত তারতম্যে সতীর সেই পতিসেবা হইতে ক্ষণকালের জন্য ভিন্নমতি

হয় না। সংসারে স্বামীই একমাত্র রমণীর বিরাম সদন! যে স্বামীর প্রতি সতীর এতাদৃশ প্রগাঢ় ভক্তি, লোক মুখে সেই পতির নিন্দা শুনিলে পতিপ্রাণার হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়। পতি-নিন্দা সতীনারী কখনই সহ্য করিতে পারে না। বিশ্ব-জননী মহামায়া ভগবতী—পূজ্যপাদ জনকের মুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়াই শোকতাপে যজ্ঞস্থলে তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন; তাপসতনয় সত্যবান রাজকুমারী সাবিত্রীর অযোগ্য হইলেও, সাবিত্রী তাঁহাকেই পতিপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং সত্যবান সাংসারিক ঘটনা-স্রোতে কঠোর কালের করগত হইলেও, পতিপ্রাণা সাবিত্রীর হৃদয় তাঁহারই প্রতি একান্ত অনুরাগিণী ছিল; পতিব্রতা পতিপদ সেবাই জীবনে সার জানিয়াছিলেন, সেই কারণেই কঠোর কাল—তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া অবশেষে মৃত পতির প্রাণ দান করিয়া, সতীর মনসাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সতীনারীর চরিত্র—আদর্শ স্থল, পতি-প্রাণার ক্রিয়া-কলাপ সমুদয়ই অলৌকিক!

রায় মহাশয়ের সংসার এক্ষণে নিরুদ্বেগ ও উন্নতিশীল; কোন বিষয়েই অভাব নাই। সদানন্দে দিনাতিপাত হইতেছে। গ্রাসাচ্ছাদন, লোকলৌকিকতা সকল বিষয়ই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে। বাহ্যিক দৃশ্যে সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে, দ্বারকানাথের পরিবারবর্গ মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু অর্থের সচ্ছলতায় মনের সুখ উপলব্ধি হয় না। যদিও

তাঁহার পরিবারবর্গের বাহ্যিক কোন অভাব নাই; যখন যাহার যে কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, গোচরমাত্রেই, অর্থব্যয়ে তাহা সাধিত হইয়া থাকে; এরূপ সত্ত্বেও তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে চির অসন্তোষ বিরাজমান। সে অশান্তি কিছুতেই দূর হইবার নহে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথের নির্ম্মল চরিত্র, সামাজিক লোকাচারে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভিন্নরুচিবিশিষ্টা! মহেন্দ্রনাথ অমায়িক, সরল চিত্ত; আর তাঁহার পত্নী বিষয়জনিত গর্ব্বে গর্ব্বিতা, সকল বিষয়ে সদাই অসন্তুষ্টা। এদিকে, হেমেন্দ্রনাথ লম্পট ও মদ্যপায়ী! তাঁহার স্ত্রী—সরলা, লজ্জাশীলা; পবিত্র হিন্দুরমণীর আদর্শ স্বরূপিণী। রায় মহাশয়ের গৃহিণী—তাঁহার মত উদার ও সরলপ্রকৃতি; কিন্তু পুত্র ও বধূদিগের পরস্পর ভিন্নভাব দর্শনে সতত ব্যথিতা!

মুখরা স্ত্রীলোকের নিকট লজ্জাশীলা রমণীকে চিরকালই পরাভব স্বীকার করিতে হয়। কোন কারণ বশতঃ হেমেন্দ্রের পত্নীর সহিত মহেন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর কথান্তর হইলে, কনিষ্ঠা বধূর আর নিস্তার নাই! এককথা লইয়া শত সহস্র ভর্ৎসনা করিয়াও জ্যেষ্ঠা বিরতা নহে। প্রকৃতপক্ষে কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক বিবাদ বিসম্বাদে নিযুক্তা থাকিলেই সমধিক আমোদ অনুভব করিয়া থাকে; হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া কোন সামান্য কারণ ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অকারণ জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার প্রতি যথেচ্ছাভাবে কটূক্তি প্রয়োগ করে। উভয়েই

শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিতা, সাংসারিক অভাবের কারণ তাহাদিগকে এক দিনের জন্যও চিন্তা করিতে হয় না; সে সমস্ত ব্যয়ভার দ্বারকানাথ স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছেন, তথাপি উভয়ের নিত্যই কলহ হইয়া থাকে। কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কথায় কোন উত্তর প্রদান করেন না বটে, কিন্তু মনে মনে অনুতাপিতা হন; অধিকন্তু মহেন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন, হেমেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিলাসবিভোগের দাস, ক্ষণিক আমোদ প্রমোদ উপলব্ধির আশয়ে সুরা ও বেশ্যায় আশক্ত—সুতরাং দিন দিন তাহার অধোগতি সুনিশ্চয়! আপনার স্বামী সক্ষম—কৃতীমান; আর দেবর অলস ও অকর্ম্মণ্য জানিয়া, সময় পাইলেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে দুইচারি কথা শুনাইয়া থাকে। কিন্তু কনিষ্ঠা তাহাকে জ্যেষ্ঠা সহদরার মত সদত স্নেহ ভক্তি করেন। কনিষ্ঠা বধূ তাঁহাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা, অথচ সাংসারিক কার্য্যে সম্যক রূপে পারদর্শিনী; জ্যেষ্ঠা ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিলেও এক দিনের নিমিত্ত তিনি কোন কথার উত্থাপন করেন না। তাঁহার মনের আক্ষেপ মনেই মিলাইয়া যায়। বিশেষতঃ হেমেন্দ্র তাঁহার কথানুসারে কোন কাজই করে না। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নিকটেই সমস্ত সুখ দুঃখের কথা বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া থাকে; অভাগিনী এক দিনের নিমিত্তও সে সুখের অধিকারণী নহে। শশুর শ্বাশুড়ী দিনে দিনে বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন; সাংসারিক গৃহকার্য্যে এক্ষণে আর গৃহিণীর

তাদৃশ সামর্থ নাই; বড় ও ছোট বধূই সে সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন। কথায় কথায় জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার যে মনো-মালিন্যের সূত্রপাত হয়, কালক্রমে আপনারাই মিটাইয়া লয়; ভাল মন্দ কোন বিষয়েই কনিষ্ঠার মুখে এক-টীও কথা নাই! বড়বৌ যথেচ্ছা মত তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া—আপনিই নিবৃত্তা হয়। মুখরা স্ত্রীলোককে সকলেই ভয় করে, কেহ তাহার বিরক্তিজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কদাচ সাহস করে না। মহেন্দ্র সকল বিষয়ে গুণবান্ হইয়াও তিনি স্ত্রীকে ভয় করেন। সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে যাহা করিতে বলিবে, সময়ে অবশ্যই তাঁহাকে সেইমত করিতে হইবে। কনিষ্ঠা—স্বামীর প্রণয় লাভে এককালে বঞ্চিতা, প্রতি রজনী একাকিনী তাঁহাকে গৃহ মধ্যে মনের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া যাপন করিতে হয়। লম্পট দুশ্চরিত্র হেমেন্দ্র আপনার আমোদ প্রমোদেই উন্মত্ত, গৃহে যে সতীলক্ষ্মী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় মনের দুঃখে সারা রাত্রি জাগরিতা, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য নাই।

স্ত্রীর প্রীতি সম্পাদন যে পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য—সে ধারণা হেমেন্দ্রের মনোমধ্যে উদয়ও হয় না। বারাঙ্গনাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই হেমেন্দ্র আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। এমন কি, সময়ে সময়ে সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে উপস্থিত বিপদের ছলনা করিয়া হতভাগ্য দুই একখানি অলঙ্কারও আত্মসাৎ করিয়াছে। সতীনারী স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধনই সংসারে একমাত্র সার ভাবিয়াছে, পতি বিপদে পড়িয়াছে—একথা শুনিয়া কখনই নিশ্চিন্তা থাকিতে

পারেন না। হেমেন্দ্রের যখন যত টাকার প্রয়োজন হইত, চাহিবা মাত্র পতিপ্রাণা প্রফুল্লচিত্তে স্বামীকে প্রদান করিতেন এবং যাহাতে পরিণামে তাহার এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয় ও চরিত্রের দিন দিন সংশোধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যথাযথ পরামর্শ দিতেন। দিবাভাগ কাজকর্ম্মে যাপিত হইত! গুরুজনবর্গের সমক্ষে, স্বামীর সহিত দেখাসাক্ষাৎ হিন্দুললনার পক্ষে বড়ই লজ্জাস্কর। একমাত্র রজনীযোগেই উভয়ের একত্র মিলিত হইবার উপযুক্ত সময়; কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্টে তাহাও প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। হেমেন্দ্র সাধারণতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, কখনই বাটীতে প্রত্যাগত হইত না। আবার যখন গৃহে আসিত, সুরাপানে এরূপ বিহ্বল থাকিত যে, তাহার চৈতন্য এককালে লোপ পাইয়াছে, বলিলেই হয়। পতিপ্রাণা সেই উন্মাদ অবস্থাগত স্বামীকেই হৃদয়ে ধরিয়া সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কালক্রমে দুই এক দিবস হেমেন্দ্রকে প্রকৃতস্থ দেখিতে পাইলে, তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি স্বামীকে কত উপদেশ, কত হিতকথাই শুনাইতেন! কিন্তু নিষ্ঠুর হেমেন্দ্র এরূপ স্ত্রীর কথায় আদৌ কর্ণ-পাত করিত না। দুষ্টমতি মনে মনে যাহা ভাল বিবেচনা করিত, তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ আশক্ত থাকিত। পতিপ্রাণা পতির এইরূপ অধোগতি দর্শনে দিবানিশিই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন; লোকের নিকট আক্ষেপ করিয়া কোন কথা প্রকাশও করিতেন না। পরমুখে

পতির নিন্দা, যাহার হৃদয়ে শক্তিশেলসম বিদ্ধ হইত; সে রমণী স্বামীর কুৎসা কেমন করিয়া অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে? এমন কি, কোন স্থানে বসিয়া আছেন, কথাচ্ছলে হেমেন্দ্রের চরিত্রবিষয়ক কথা উঠিয়াছে; তাঁহাকে পতির অপবাদের কথা শুনিতে হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে হেমেন্দ্রের অর্থের প্রয়োজন হইলে পিতার নিকট জানাইলেই অভাব পূর্ণ হইত। কিন্তু তাহার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হওয়ায়, রায় মহাশয় এককালে সেরূপ অর্থ প্রদান স্থগিত করিয়া ছিলেন। পিতার নিকট টাকা চাহিয়া বিমুখ হইলে, হেমেন্দ্র মাতার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা লইত। জননী কনিষ্ঠ-পুত্রকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন, এজন্য হেমেন্দ্র মাতার কাছে টাকা চাহিলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। রায় মহাশয় পুত্রের চরিত্র সংশোধন উদ্দেশেই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন না; কিন্তু ক্রমে তাহার চরিত্রের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন অধোগতি হইতেছিল। এইভাবে কিছু দিন গত হইলে, রায় মহাশয় এক দিন গৃহিণীর নিকট জ্ঞাত হইলেন যে, হেমেন্দ্র সময়ে

সময়ে তাঁহার নিকট হইতে বিশ পঁচিশ টাকা পাইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া তিনি সহধর্ম্মিণীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্ম্ম আর না করেন, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। এক্ষণে হেমেন্দ্র পিতা মাতা কাহারও নিকট মাথা খুঁড়িয়াও একটী পয়সা পায় না, অথচ স্বভাব সেইরূপই আছে। রাত্রিকালে প্রতিদিনই সে বাটী হইতে বহির্গত হয় এবং এক প্রহরের পূর্ব্বে কোন দিনই বাটীতে আসে না ; এমন কি—সময়ে সময়ে সমস্ত রাত্রিই তাহার বাহিরে কাটিয়া যায়।

রায় মহাশয় বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ! বেশ্যাগৃহে গমন বা সুরাপান অর্থাভাবে কখনই হইতে পারে না—একথা তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই নিমিত্তই তিনি হাত গুটাইয়া ছিলেন এবং স্ত্রীকেও হেমেন্দ্রের হস্তে টাকা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। হেমেন্দ্রের চরিত্রের প্রতি তাঁহার একান্ত লক্ষ্য ছিল ; যে সময়ে বঙ্কেশ্বরের জামাতাকে লইয়া হেমেন্দ্র বেশ্যাগৃহে আমোদ আহ্লাদ করে, সে সময়ে হেমেন্দ্রের কোন উপায়ে একটীও পয়সা হস্তগত হইবার সুবিধা ছিল না। রায় মহাশয় পুত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াও তাহার চরিত্রের কিছুমাত্রও উন্নতি করিতে পারিলেন না ভাবিয়া, মর্ম্মাহত হইয়া ছিলেন। এক্ষণে সকলেই হেমেন্দ্রের শত্রু। রায় মহাশয়ের বিষয়কর্ম্মভুক্ত কোন লোকজনও হেমেন্দ্রকে কোন বিষয়ে দুই এক টাকা প্রদান করিলে, তাহার প্রতি তিনি বিরক্ত হইতেন। এই কারণে

পিতার কর্ম্মচারী বা সামান্য দাসদাসীও হেমেন্দ্রকে কেহ একটী পয়সাও ধার দিত না। সকলেই প্রভুর আদেশ মত কার্য্য করিত। এ সময়ে যে হেমেন্দ্রের অর্থব্যয় করিয়া উপপত্নী গৃহে আমোদ প্রমোদ চলিত—এঘটনায় রায় মহাশয়ের মনে সাতিশয় সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, মনে মনেই সবিশেষ তাহার অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন।

এক দিবস মধ্যাহ্ন ভোজনাদির পর, রায় মহাশয়ের গৃহিণী, বধূদ্বয় ও কন্যা একত্রে বসিয়া সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে অলঙ্কার-বিক্রেতা জনৈক বিধবা রমণী একছড়া দায়মণ্ড কাটা চিঁক লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। এই স্ত্রীলোকটী মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিত। রায় মহাশয়ের পরিবার, বধূমাতা ও কন্যা সকলেরই মাসিক কিছু কিছু টাকা জল খাবারের বন্দোবস্ত ছিল। স্ত্রীলোক পরিমিতাচারিণী, যাহাতে দশ টাকার সংস্থান হয়; তদ্বিষয়েই সদত যত্নবতী! সময়ে সময়ে দুই দশ টাকা সংস্থান হইলেই, তাঁহারা কেহবা একখানি অলঙ্কার, কেহবা একখানি মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিয়া পরিণামের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন। রায় মহাশয়ের বাটীর স্ত্রীলোকগণও এইরূপ সময়ে সময়ে অলঙ্কারাদি ক্রয় করিতেন। যাহা হউক, সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; অকস্মাৎ গহনা-বিক্রেত্রীকে দেখিয়া, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা স্থগিত হইল। গৃহিণী তাহাকে দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গো, আছ ভাল ! অনেক কালের পর যে তোমায় দেখিতে পেলাম।"

"আর মা ঠাকরুণ! দুঃখে সুখে—দিন পাত করি, মধ্যে এখানে ছিলুম না। এই পাঁচ সাত দিন হল এয়েছি। বলি আপনারা সব ভাল আছেন? কর্ত্তা মশায় আছেন ভাল?"

"হাঁ! উপস্থিত সব মঙ্গল। তবে, ছোট ছেলেটার জন্যে জ্বলে পুড়ে ম'লাম। হতভাগাকে এত করে বোঝাই, তবুও ত সে কথা শোনে না; আর সে কথার আবিশ্যক নেই। বলি, আজ আমাদের বাড়ী কি মনে করে?"

"একছড়া চিক আছে, নেবেন? ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর বড় বউ বেচতে দিয়েছে। সোনাটা আছে ভাল। যদি দরকার হয় নিয়ে রাখুন—সুবিধে হবে।"

গৃহিণী "দেখি" বলিয়া চিকছড়া সেই স্ত্রীলোক-টীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নির্ম্মাণ কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করিয়া "না, এখন আবশ্যক নাই" বলিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কনিষ্ঠা বধূকে যে চিক একছড়া সম্প্রতি গড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই কথার উল্লেখ করিয়া—গহনা বিক্রেতা কামিনীকে দেখাইবার নিমিত্ত বধূমাতাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠাবধূ সুমতির পার্শ্বে বসিয়া কাথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে ছিলেন; এক্ষণে শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহাকে চিক লইয়া আসিতে বলায় অকস্মাৎ তাঁহার মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—মুখে কথা নাই;

নয়নাসারে চক্ষুদ্বয় পূর্ণ হইল। তিনি অধোমুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। গৃহিণী বধূমাতাকে এরূপ ম্লান ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, অধিকতর সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোট বৌমা! আমি যে তোমাকে চিক আনিতে বলিলাম, শুনিতে পাও নাই কি? কেন, অমন করে মৌনভাবে রহিলে যে?"

কনিষ্ঠাবধূ। মা! আমাকে ক্ষমা করুন, সে চিক আমার বাক্সের ভিতর নাই। কাল যখন সন্ধ্যাবেলা জল খাবারের পয়সা বাহির করিবার জন্য বাক্স খুলি; দেখিলাম, সমস্ত গহনাপত্র লণ্ডভণ্ড হইয়া রহিয়াছে। সব মিলিয়ে পেয়েছি, কিন্তু চিকছড়া দেখিতে পেলেম না।"

গৃহিণী কনিষ্ঠা বধূ প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কথা? ঘর থেকে গহনা গেল? কে নিলে? যাও মা! ভাল করে খুঁজে দেখ গে; পাওয়া যাবে, ভয় নাই।"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, অলঙ্কারবিক্রেতা রমণী গোলযোগ দেখিয়া "তবে আজ চল্লুম, আর এক দিন দেখা করিব" এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুমতি কনিষ্ঠাবধূর প্রিয়সঙ্গিনী—উভয়ে পরস্পর বিশেষ সদ্ভাব; দুই জনেরই সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের উভয়ে সহোদরার মত প্রণয়; যখন যে বিষয়ে পরামর্শ করিতে হয়, উভয়ে যুক্তি না করিয়া কোন কার্য্যই করেন না। গত রাত্রিতে যখন

কনিষ্ঠাবধূ বাক্‌স খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া ছিলেন, সে সময়ে সুমতি তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং চিকছড়া বাক্‌সের মধ্যে নাই—দেখিয়া ছিলেন। এক্ষণে মাতা সেই চিকের তত্ত্ব লইতেছেন শ্রবণ করিয়া, তিনি জননীকে বলিলেন "না, মা! ছোট বয়ের বাক্‌সে চিক নাই, সে চিক নিশ্চয়ই খোয়া গিয়েছে। আমরা কাল তার অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দেখ্‌তে পাই নাই।" গৃহিণী তনয়া ও বধূমাতার কথায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন; কিন্তু এক্ষণে অধিক গোলযোগ না করিয়া, সুমতি ও বধূমাতাকে পুনরায় বাক্‌স অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কনিষ্ঠাবধূ শ্বাশুড়ীর আজ্ঞানুসারে, সুমতিসহ আপনার গৃহে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু-কামিনীর পতিগৃহে স্বামী ব্যতিরেকে তাপিত হৃদয় শীতল করিবার আর অন্য উপায় নাই। অভাগিনী হেমেন্দ্র-জায়া পতি-প্রেমে সম্পূর্ণ দরিদ্রা, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা হইয়াও পতির স্বভাব দোষে লোকালয়ে তাঁহাকে সদাই কুণ্ঠিত ভাবে দিনাতিপাত করিতে হয়। পতিপ্রাণা যথাসাধ্য পতিকে সংসারকার্য্যে মনোযোগী রাখিবার নিমিত্ত এ তাবৎকাল চেষ্টা করিয়া ছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত হেমেন্দ্র তাহার কোন কথাই গ্রাহ্য করে নাই, তিনি তজ্জন্য সদা-সর্ব্বদাই বিষণ্ন ভাবে মনোদুঃখে কালাতিপাত করেন। এ দুঃখময় সংসারেও ভাগ্যহীনা মনের কথা প্রকাশ করিবার লোক পাইয়া ছিলেন; সুমতি সরল-হৃদয়া, পরোপকারিণী; কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার সহিত তাহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। হেমেন্দ্রনাথের আচরণের কারণ তিনিও

মর্ম্মপীড়িতা, কিন্তু বয়সে কনিষ্ঠা বশতঃ ভ্রাতাকে কোন কথাই বলিতে পারিতেন না এবং সে বিষয়ে তাঁহার সাহসও নাই।

সুমতিকে নির্জ্জনে পাইয়া, হেমেন্দ্রের পত্নী কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুমতি বিচক্ষণা ও বুদ্ধিমতী; বিবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্নবতী হইলেন। উভয়ে এই ভাবে অনেকক্ষণ ক্ষেপণ করিয়া, পুনরায় যে যাহার সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। গৃহিণী কনিষ্ঠাবধূর চিকচড়া হারাইয়া গিয়াছে স্থির ভাবিয়া, মনে মনে অক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে অলঙ্কারাদি বিশেষ সতর্কের সহিত রাখিতে বলিলেন। কোন জিনিষ নষ্ট হইলে, লোকে ক্ষণেককাল তাহার কারণ উৎকণ্ঠিত হয়; অবশেষে সাংসারিক ঘটনা-স্রোতে সে ভাবনা তাহার হৃদয় হইতে চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। রায় মহাশয়ের বাটীর মহিলাগণ সকলেই অলঙ্কার খোয়া গিয়াছে শুনিয়া, সে সময়ে ব্যাকুলিত হইয়া ছিল; উপস্থিতে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে আর সে কথার আন্দোলন নাই!

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, রায় মহাশয় আদালত হইতে গৃহে আসিলেন। মহেন্দ্রনাথও সন্ধ্যার অনতি-বিলম্বে গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। হেমেন্দ্রের দিবাভাগে কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই; প্রত্যহ সুদীর্ঘ রাত্রি জাগরণ করিয়া, আহারাদির পর দিবাভাগ নিদ্রিতাবস্থায় যাপন করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্বাস্থ্য নিবন্ধন নিদ্রার প্রয়োজন—

রজনীই নিদ্রার উপযুক্ত সময়! কেবলমাত্র নিশাচরগণ সে সময়ে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে ; তজ্জন্য সাধারণতঃ জীবগণ যে সময়ে শান্তি লাভ করে, সে সময় তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। সংসারে যখন জীবগণ পরিশ্রমান্তে বিরাম লাভ আশয়ে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়, নিশাচরবর্গের ভ্রমণের তাহাই উপযুক্ত সময়। হেমেন্দ্র পিতা ও ভ্রাতাকে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া শুভ্র বেশ ভূষায় পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহে যে পতিপ্রাণা সতী তাহার বিচ্ছেদ জনিত দারুণ যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালাতিপাত করিবে, সেদিকে দৃষ্টি নাই। হেমেন্দ্রের সহধর্ম্মিনী পতির গর্হিত আচরণের কথা কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না; যেহেতু পতির অপবাদ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু সুমতিকে তিনি প্রাণের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেন, সুমতিও মনে কিছুমাত্র কপট ভাব রাখিতেন না। উভয়েই সরল চিত্তে—সরল ভাবে, পরস্পর সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতেন। কনিষ্ঠা বধূর হৃদয়ের দুঃখকাহিনী অপরের অজ্ঞাত হইলেও, সুমতি সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন।

সংসারের কাজকর্ম্ম সমাপনে যে যাহার গৃহে শয়ন করিয়া বিরাম লাভ করিতেছেন! রজনী জীবের বিরামদায়িনী, নিশিযোগে সকলেই স্ব স্ব গৃহে নিদ্রাদেবীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছে। একমাত্র সুমতি

কনিষ্ঠা বধূর গৃহে এই গভীর রাত্রিতে—উভয়ে সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন! কনিষ্ঠা বধূ স্বামীর চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া—এ অসার জীবন ধারণে আর প্রয়োজন নাই, মৃত্যু হইলেই সকল শোক তাপের কঠোর হস্ত হইতে জন্মের মত পরিত্রাণ পান—ইত্যাদি কত কথার উল্লেখ করিয়া ননদিনী সমক্ষে মনের আক্ষেপ করিতেছেন। সুমতি সাধ্যমত তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছেন; সময়ে সময়ে তাঁহার কোমল হৃদয়—ভ্রাতৃজায়ার শোকোক্তিতে দ্রব হইয়া যাইতেছে।

উভয়েই নয়নাসারে সিক্ত হইতেছেন। ক্রমে ক্রমে জগতের কোলাহল শূন্য হইয়া আসিল, এক্ষণে আর লোক জনের জনরব আদৌ কর্ণগোচর হইতেছে না; রায় মহাশয়ের বাটীর দাস দাসীগণও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন! নিদ্রাদেবী জগতের যাবতীয় জীবের উপরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। রায় মহাশয়ের বাটীতে কেবলমাত্র তাঁহার কন্যা ও কনিষ্ঠা বধূব নিদ্রা নাই—তাঁহারা উভয়েই জাগরিতা! নিদ্রার কোন নির্দ্ধারিত সময় অসময় নাই! শরীরের আলস্য সঞ্চার হইলেই, অজ্ঞাতসারে নিদ্রাদেবী জীবদেহে প্রবেশানন্তর তাহাকে অভিভূত করে। সুমতি ও কনিষ্ঠা বধূ একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, অকস্মাৎ উভয়েরই নিদ্রাকর্ষণ হইল। কনিষ্ঠা বধূ সুমতিকে সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিতেন, কথোপকথনে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে জাগরিতা ছিলেন, এক্ষণে তন্দ্রা অনুভব করিয়া, বিশ্রামলাভ বাসনায় উভয়েই শয়নোপরি

শায়িতা হইলেন। কিন্তু, সে নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মিল! যেহেতু সুমতির গৃহে জনৈক দাসীর নিকটে তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু শায়িত রহিয়াছে। অধিকন্তু হেমেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে আপন গৃহে উঠিয়া যাইতে হইবে; এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সুমতি ভ্রাতৃ-জায়ার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রতি দিন হেমেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় একজন পরিচারিকা কনিষ্ঠা বধূর গৃহে শয়ন করিয়া থাকে এবং যথাসময়ে হেমেন্দ্র স্বগৃহে উপস্থিত হইলেই, সহচরী অন্যত্রে যাইয়া শয়ন করে। অদ্য কার্য্য বশতঃ সে দাসী স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, অগত্যা সুমতি কনিষ্ঠা বধূকে একাকিনী রাখিয়া আপনার গৃহে উঠিয়া আসিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, তাহার যে দাসী নিজ গৃহে নিদ্রিতা আছে, তাহাকেই ভ্রাতৃজায়ার গৃহে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু গৃহে আসিয়া দাসীকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিয়াও কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইল না। অবশেষে কনিষ্ঠা বধূ—একাকিনী দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া নিজ গৃহে শয়ন করিলেন।

মানুষ কথাবার্ত্তায় তন্দ্রাভিভূত হইলেও, নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা অতিরিক্ত দুই এক ঘণ্টা জাগ্রতাবস্থায় ক্ষেপণ করিতে পারে; কিন্তু পরস্পর মুখ বন্ধ হইলেই—নিদ্রাক্রোড়ে অভিভূত হয়। এক্ষণে সুমতি আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া দুই এক দণ্ড মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্না হইলেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়াছেন, নিশা-যোগেও ভ্রাতৃজায়া সহ কথোপকথনে শান্তিলাভ করিতে

পারেন নাই; শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল। এ দিকে কনিষ্ঠা বধূর হৃদয় সাংসারিক শোক তাপে জর্জ্জরিত। সংসারে বাহ্যিক সুখসম্ভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অভাব না থাকিলেও, আন্তরিক দুঃখে হৃদয় উদ্বেলিত; কোন প্রকারে দুরাচার স্বামীর চরিত্র দেবোপম হয়, তাঁহার এইমাত্র কামনা; পতিপ্রাণা স্বপ্নেও পতির অশুভ কামনা করেন নাই। স্বামী সহস্র দোষে অপরাধী হইলেও হেমেন্দ্র তাহার পক্ষে পূজনীয়! কি প্রকারে তাহার চিত্তবিনোদন করিবেন, কিরূপে তাহার অসচ্চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিবে; এই সকল ভাবনা চিন্তায় তিনি দিবানিশি যাপন করিয়া থাকেন। আহার বিহার কিছুতেই তাঁহার সুখ নাই; সদাই যেন শোক-সাগরে নিমগ্না! সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবণ্য পতির চিন্তায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাংসারিক আমোদ প্রমোদ তাঁহার নয়নের শূল; তাহা হইতে পৃথক থাকিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। পতিকে সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই পাপাত্মার চরিত্রের উন্নতি হয় নাই। মহা-পাতকী হেমেন্দ্র এক দিনের নিমিত্তও প্রাণ-প্রিয়ার উপ-দেশানুসারে কার্য্য করে নাই; সহধর্ম্মিণীর কথায় তাহার কর্ণপাতও হইত না। উত্তরোত্তর স্বামীর অধোগতি দেখিয়া সতী মনে মনে সাতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছেন, কোন সুযোগে প্রাণত্যাগ করিলেই সাংসারিক সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিবৃত্তা হইবেন, পর জীবনে আর তাঁহাকে

স্বামীর অসৎ চরিত্রের কারণ মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হই-বেনা; এইরূপ মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া পতিপ্রাণা সরলহৃদয়া কনিষ্ঠা বধূ আপনার প্রাণ বিনাশই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁহার পক্ষে সংঘটন দুর্ঘট! যেহেতু দিবাভাগে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন; শ্বাশুড়ী, ননদিনী, ভাশুর-পত্নী সকলের সম্মুখে থাকিয়াই দিবা অতিবাহিত হয়। রাত্রিকালে তাঁহারা যে যাহার গৃহে নিদ্রিতা থাকিলেও, নিজ গৃহে একাকিনী থাকিতে পান না; জনৈক সহচরী তাঁহার গৃহে হেমেন্দ্রের আগমন কাল পর্য্যন্ত শুইয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় নিজ প্রাণবিনাশ—এ ভীষণ দুঃসাহসিক কার্য্য রমণী কি প্রকারে সম্পন্ন করিবেন?

অদ্য রজনী যোগে তিনি গৃহমধ্যে একাকিনী, নশ্বর জীবন পরিত্যাগের—তাঁহার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত সময়! মৃত্যু যন্ত্রণা জীবের পক্ষে ভয়ঙ্কর, সেই যন্ত্রণার বিভীষিকা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায়, যুবতী নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার নিকট হইতে জন্মেরমত বিদায় গ্রহণ করিতেছন, উদ্দেশে তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিলেন। এক্ষণে কিরূপে প্রাণত্যাগ করিবেন? পরমাত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত না হইলে, লোকাপবাদে তাঁহাকে অধিক-তর লজ্জা পাইতে হইবে! সংসারের যাবতীয় স্নেহ-মমতা-পাশ ছেদন করিয়া, ইহ জীবন স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতেছেন, এই মহাপাপের জন্য জগদীশ্বরের নিকটে তাঁহাকে শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে; মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহার

সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রু-বারি বিগলিত হইতে লাগিল। শোকোচ্ছ্বাসে হৃদয় আন্দোলিত হইল। কিন্তু সে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া আর্ত্তনাদ করিলে, অপর কেহ জাগরিত হইতে পারে; তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি—নিস্ফল হইবে। এতদিন যে নিজ প্রাণ স্বামীর চরিত্রের কারণ বিসর্জ্জন দিবেন—মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; তাহাতে অকৃত হইবেন। অভাগিনী মনের উদ্বেগ মনেই সংবরণ করিলেন। অবশেষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, উর্দ্ধভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন। কড়িকাঠস্থিত কড়ায় একগাছি শিক্—তাহাতে একটী লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইলেন। একখানি টুল লইয়া ধীরে ধীরে লণ্ঠনটী নিম্নতলে নামাইয়া, পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাবয়ব সুচারুরূপে আবৃত করিয়া, আনালাস্থিত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া তাহার একপ্রান্তে সজোরে গ্রীবাদেশ আবদ্ধ করিলেন। অপর প্রান্ত সেই টুল খানিতে উঠিয়া লম্বমান শিকে বাঁধিয়া দিলেন। অবশেষে টুলের উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িলেন; তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, হস্তপদাদির সঞ্চালন করায়, কাষ্ঠাসনখানি স্থানান্তরিত হইল। দুই তিন মুহুর্ত্তের মধ্যেই সরলার প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল। অভাগিনী নিজ প্রাণ স্বহস্তে বিনাশ করিয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতাচরণ হইতে জন্মের মত অব্যাহতি পাইলেন।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, গভীর নিশায় সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কনিষ্ঠ বধূর এরূপ দুঃসা-

হৃসিক কার্য্যের বিষয় রায় মহাশয়ের গৃহস্থিত জন প্রাণীও জানিতে পারে নাই। হতভাগ্য হেমেন্দ্র প্রতিদিন যেরূপ সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আজিও সেই সময়ে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ মানসে গৃহদ্বারে উপনীত হইল। পুনঃপুনঃ দাসীকে সম্ভাষণ করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া সজোরে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রী তাহার আর আয়ত্তাধীন নহে, কামিনীর পবিত্র পবমায়ু ঈশ্বরপদে বিলীন হইয়াছ! বারম্বার আহ্বান করিয়া—কাহারও উত্তর না পাওয়ায়, হেমেন্দ্র সতেজে দ্বারদেশে আঘাত করিল। গৃহে জনপ্রাণীও নাই, কে আর সেই আঘাতে দ্বারোদ্ঘাটন করিবে? দুর্ভাগা অবশেষে নিরুপায় হইয়া বহির্ব্বাটীতে যাইল এবং গোপাল ও দ্বারবানকে সত্বর ডাকিয়া আনিল। তাহাদিগের এইরূপ কোলাহলে সুমতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি হেমেন্দ্রনাথকে বাহিরে দাঁড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, এখনও কি দরজা খোলা পাওনি? রাত যে অনেক হয়েছে!'

হেমেন্দ্র। না, বড় গোলযোগেই পড়িয়াছি! আজ ঝি মাগি পর্য্যন্ত এম্‌নি ঘুমিয়ে পড়েছে যে, কা'রও সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছেনা। ব্যাপারখানা কি?

সুমতি। ছোট দা, আজ যে ছোট বৌ একা শুয়েছে! ঝিত নেই—যে উত্তর দিবে?

অনন্তর সুমতি সত্বর ভ্রাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন; তাহাদিগের গোলযোগে রায় মহাশয়, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই জাগ্রত হইলেন; অবশেষে তাঁহারা সকলে

মিলিয়া সেই দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই দ্বার মুক্ত হইল না; অনন্যোপায় হইয়া রায় মহাশয় গোপালকে জনৈক কর্ম্মকার ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। প্রভুর আজ্ঞানুসারে ভৃত্য অবিলম্বে প্রস্থান করিল। দ্বারকানাথ হেমেন্দ্রকে অধিক রাত্রিতে বাটী আসিয়াছে বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রের পক্ষে এরূপ ভর্ৎসনা নতন নহে ; প্রকৃতই নিজে অপরাধী ! তাহার দোষেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ; সুতরাং কোন কথার উল্লেখ না করিয়া, যুবক মৌনভাবে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের বাটীর দাস দাসী সকলেরই এ গোলযোগে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। অনন্তর অনেকেই মনে করিতেছে যে, কনিষ্ঠাবধূ গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা, সেইজন্য এত ডাকাডাকিতেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এক এক বার কবাটে ঘা দেওয়া হইতেছে ও তাঁহার এরূপ নিদ্রার কারণ তিরস্কার করা হইতেছে। কিন্তু হেমেন্দ্র-পত্নীর প্রাণবায়ু যে বহুক্ষণ পূর্ব্বেই ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—গৃহে যে তাঁহার মৃতদেহ মাত্র অবশিষ্ট; সে ধারণা কাহারও মনে একবারও উদয় হয় নাই। সকলে মিলিয়া এইরূপ গোলযোগ করিতেছে, এমন সময়ে গোপালের সহিত জনৈক কর্ম্মকার তথায় উপস্থিত হইল। রায় মহাশয় অবিলম্বে তাহাকে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে বলিলেন, কর্ম্মকার উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা আজ্ঞামত কার্য্য করিল ! যুবতীর দোদুল্যমান বিকট মূর্ত্তি সকলের নেত্রপথে নীত

হইল। রায় মহাশয় বধূমাতা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন দেখিতে পাইয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। মহিলাদিগের মধ্যে রোদন ধ্বনি উঠিল। এরূপ বীভৎস দৃশ্য দর্শনে হেমেন্দ্রের পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইল; তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রায় মহাশয় বিজ্ঞব্যক্তি, তিনি আর এভাবে সময় ক্ষেপ না করিয়া, পুলিশে সংবাদ পাঠাইলেন।

নিশিথিনী অবসান প্রায় হইয়াছে, পশ্চিম গগনে শুকতারা সুবিমল কর-ধারা ধরাতলে বর্ষণ করিতেছে; সুধাকর এক্ষণে নিষ্প্রভ অবস্থায় অস্তাচলাভিমুখে গমনের উদ্যোগী। সমস্ত জগৎ নিদ্রাঘোরে নীরব থাকিলেও, সময়ে সময়ে পক্ষীগণের কূজনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রায় মহাশয়ের বাটী—লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। প্রতিবেশীগণ সকলেই রায় মহাশয়ের অনুগত, তাঁহার বাটীতে রোদনধ্বনি শ্রবণে সকলেই শশব্যস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বক্কেশ্বরও এই গোলযোগে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের বিষয়ে—রায় মহাশয় বন্ধুবর্গসহ পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বৈবাহিকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে প্রায় দুই মাস কাল বধূমাতাকে পিতৃগৃহেই রাখিয়া ছিলেন; কিন্তু তৎপরে রাধামতিকে লইয়া যাইবার জন্য আর একবার লোক পাঠাইলেন। বর্ত্তমানে বক্কেশ্বরের সংসারে একমাত্র রাধামতি; দুহিতা ব্যতিরেকে তাঁহাকে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিবার কেহই নাই! কিন্তু কন্যাকে যে দিন জামাতৃহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিবস হইতেই, তাঁহার রাধামতির প্রতি কর্ত্তৃত্ব রহিত হইয়াছে। এক্ষণে কন্যার সম্পূর্ণ ভার—তাহার শ্বশুর ও পতির হস্তে অর্পিত! হইয়াছে। স্ত্রী বিয়োগ জনিত শোকে অধীর হইয়াই তিনি তৎকালে অনুনয় বিনয় করিয়া, কন্যাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে চন্দ্রনাথ লইয়া যাইবার অভি- প্রায়ে পুনরায় লোক পাঠাইয়াছেন, এবার আর কোন ওজর আপত্তি না করিয়া, শুভ দিনে শুভক্ষণে কন্যাকে জামাতৃগৃহে পাঠাইয়া নিজে দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সমুদায়ই কামিনী দ্বারা সম্পাদিত হয়, বক্কেশ্বর নিজ হস্তেই রন্ধনাদি করিয়া ভোজনাদি করেন।

রাধামতি ভর্ত্তৃগৃহে নীতা হইয়া, পিতার অদর্শনে মনে মনে সদা সর্ব্বদাই বিষণ্ণা; কিন্তু তাহার প্রতিকারের শক্তি নাই। নারীজাতি চিরকাল পরাধীন! রাধামতি স্বামীগৃহে দিনাতিপাত করিবেন, ইহাই সকলের প্রার্থনা।

শ্বশুরালয়ে কন্যার ভরণ পোষণ—কোন বিষয়ে কষ্ট হইলেও হিন্দু-সমাজে তাহা দূষণীয় নহে, সীমন্তে সিন্দুর ও বামহস্তে লৌহবলয় পরিধান করিয়া কন্যা পতিপ্রেমে কালযাপন করেন, ইহাই সকলের প্রার্থনা। বাল্যকালাবধি রাধামতি সুখ-সম্ভোগে দিন যাপন করিয়াছে, পতি-গৃহে সেরূপ স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্যই হয় না। শ্বাশুড়ী, ননদিনী যতক্ষণ না তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। সুতরাং মনে মনে সদাই অসুখী। যত দিন পর্য্যন্ত গুরু-জনের অধীন থাকিয়া তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ভাবেই থাকিতে হইবে। স্বামীগৃহে বিলাস বিভোগ কিছুই নিজের আয়ত্তাধীন নহে। রাধামতির শ্বশুরালয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে শ্বাশুড়ী ননদিনীর বাক্য গঞ্জনায় তিনি মর্ম্মপীড়িতা হইতেন। বাল্যকালাবধি অলসপ্রিয়তা নিবন্ধনই, তাহাকে এরূপ দুঃখ-ভোগ করিতে হইয়াছিল; অধিকন্তু এরূপ ঘটনা সংসার-জীবনে প্রত্যেক হিন্দু-রমণীকেই সময়ে সময়ে সহ্য করিতে হয়। রাধামতি মধ্যে মধ্যে যে গুরুজন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইতেন; তাহার প্রতিকারও তাঁহার পক্ষে যেরূপ ছিল, সে প্রকার সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ফণীন্দ্রনাথ সুধীর সুমতি, লেখাপড়ায় দিন দিন উন্নতি করিতেছেন, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার সৌজন্যে মোহিত! এই গুণবান যুবকই রাধামতির স্বামী। ফণীন্দ্রনাথ

প্রিয়াকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, কিরূপে রাধামতির চিত্ত বিনোদন করিবেন, কিরূপ ব্যবহার করিলে রাধামতি তাঁহাকে ভালবাসিবেন, রাধামতির হৃদয়ে যাহাতে কোন প্রকার দুঃখ বা অনুতাপের সঞ্চার না হয়, তিনি আপনার পাঠাধ্যয়ন অপেক্ষা ইহাই জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া সদা সর্ব্বদা রাধামতির মনস্তুষ্টিকর কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু অভাগিনী নিজ দোষে এরূপ প্রণয়ী পতির প্রেম লাভে বঞ্চিতা। রাধামতি পতির সহিত কদাচ সংব্যবহার করিত না। স্বামীকে দেখিবা মাত্র তাহার ক্রোধানল দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হইত। ফণীন্দ্র প্রাণপণে সহধর্ম্মিণীর অনুরাগভাজন হইবার চেষ্টা করিয়াও রাধামতির প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই।

ফণীন্দ্রনাথ পত্নীকে অহোরহ হিতকার্য্যে উপদেশ দিয়া থাকেন, মনে মনে সঙ্কল্প যে, যাহাতে সহধর্ম্মিণী লেখা পড়া শিখিয়া স্বামীভক্তির গুণাগুণ জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া আপনার মনের মত সুশিক্ষিতা করিবেন। ফণীন্দ্র স্ত্রীকে গুণবতী করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন, এক এক দিবস সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়াও, মহাভারত রামায়ণাদি পৌরাণিক ঘটনাবলী হইতে সতীনারীর চরিত্র সকল উল্লেখ করিয়া পত্নীকে কত উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু রাধামতি সে সকল কথায় এক দিনের নিমিত্তও মনোযোগী নহে। পতির এরূপ তাঁহার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও যাহাতে

তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে রাধামতি সচেষ্টিতা হইত। এমন কি সময়ে সময়ে রাধামতির উৎপীড়নে ফণীন্দ্রনাথের রাত্রিকালে আদৌ নিদ্রা হইত না, সারা রজনী জাগ্রতাবস্থায় ক্ষেপণ করিতেন। কিন্তু এরূপ পীড়ন সত্বেও রাধামতি তাহার হৃদয়-মন্দিরের উপাস্য দেবী, রাধামতি সহস্র অপরাধে অপরাধিণী হইলেও, ফণীন্দ্র তাহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও বিরক্ত হইতেন না; যাহাতে প্রিয়ার মনোরঞ্জন হয়, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে, সেই বিষয়েই ফণীন্দ্রের একান্ত যত্ন ছিল। ফণীন্দ্র বাল্যকালাবধি পিতামাতার আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। সাংসারিক বিলাস বিভোগে তাঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না, সদা সর্ব্বদাই পুস্তক অধ্যয়নে সময় ক্ষেপ করিতেন। বিবাহোৎসবের পর ভার্য্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে তিনি একান্ত মোহিত হইয়াছেন। আপনার প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও সহধর্ম্মিণীর মনস্তুষ্টি করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। দিবানিশি প্রিয়ার কি প্রকারে ভালবাসা লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা! উত্তরোত্তর এই ভাবনায় তিনি সংযত থাকায়, তাঁহার লেখা পড়ারও ক্ষতি হইতে লাগিল। বিবাহের পরবর্ষে তিনি এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে বি, এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রণয়িণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তাঁহার উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ফণীন্দ্র যেরূপ যত্ন সহ পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হইতেন, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। অনুক্ষণ

তিনি অন্য মনস্ক ভাবেই ক্ষেপণ করেন; সমপাঠীগণ তাঁহার ঈদৃশ চিত্ত-বৈকল্যের লক্ষণ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি প্রকৃত কথা গোপন পূর্ব্বক অন্য কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করেন। দিনে দিনে ভার্য্যাজনিত ভাবনা চিন্তায় তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তিনি নিজ দোষেই এরূপ মনো-বিকার উপস্থিত করিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাকে সাংসারিক ঘটনা-স্রোতে এরূপ আন্দো-লিত হইতে হইত না!

রাধামতি সরল চিত্ত হইলেও, গৃহস্থালী বিষয়ে কিছুমাত্র বিজ্ঞতা না থাকায়, সামান্য কারণে মনঃক্ষুণ্না হইতেন। সংসারে তাহার একমাত্র বিরামের স্থল—স্বামী! ফণীন্দ্র নাথ স্ত্রীকে তুষ্টা রাখেন; কোন বিষয়ে ক্ষণেকের নিমিত্ত তাঁহাকে বিষণ্ণাবস্থায় কাটাইতে না হয়, সেই ভাবনায় আপনার বিদ্যা শিক্ষার প্রতিও অমনোযোগী হইয়া দিবানিশি প্রণয়িণীর কারণ উৎকণ্ঠিত। পতি যে ইহ সংসারে রাধামতিকেই প্রণয়-প্রতিমা বলিয়া স্থির জানিয়াছেন, আপনার অনিষ্ট সত্বেও তাঁহার তৃপ্তিসাধনে সচেষ্টিত—এ ধারণা অবলা রাধামতির হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সঞ্চার হয় নাই। বিবাহকাল হইতেই রাধামতি স্বামীকে অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতেন; এত যে পতির সোহাগ, যত্ন ও ভালবাসা—তাহার কিছুমাত্রও প্রতিদান হইত না। ফণীন্দ্র পিতামাতা আত্মীয় স্বজন, দুর্লভ বিদ্যালাভ, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া

সহধর্ম্মিণীর সুখ চিন্তাই জীবনের একমাত্র উপাস্য ভাবিয়াছেন। আমি যাহাকে প্রাণপণে ভালবাসি, যাহার অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় জ্ঞান হয়, যে প্রণয়-মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভাবে নিত্য বিরাজিতা, অবশ্যই তিনি আমার অনুরক্তা। তবে লোকাচার বা বাল-স্বভাব প্রযুক্তই আমার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সময়ে—প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া স্বর্গীয় সুখে দিনাতিপাত করিব। রাধামতি—সরলা বালিকা; চাতুরী ছলনা, সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাত কিছুই বিদিতা নহে, এই জন্যই তাহার প্রতি আমার আশক্তি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না! এভাব কিছু চিরকাল থাকিবে না, সময়ে রমণী আমাকেই হৃদয়ের অধীশ্বর বলিয়া জানিবে, আমার প্রীতি সম্পাদনে যত্নবতী হইবে। ফণীন্দ্রনাথ মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়াই রাধামতির দোষের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু রাধামতি যে বাল্যকালাবধি পিতা মাতার আদরিণী, গৃহকার্য্যে এককালে অনভিজ্ঞা, আমোদপ্রমোদ-প্রিয়া, সে ধারণা তাঁহার মনে ক্ষণেকের নিমিত্তও উদয় হয় নাই। দিনে দিনে ফণীন্দ্রনাথের লেখাপড়ার প্রতি অযত্ন হইল। মন কোন বিষয়ে সংযত রাখিলে, অপর বিষয় সুচারুরূপে কদাচ হইয়া উঠে না। কি উপায়ে রাধামতির ভালবাসা লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনা। সাংসারিক বিষয়কার্য্য উপেক্ষা করিয়া একমাত্র রাধামতির মঙ্গল চিন্তাই তিনি জীবনের সার বলিয়া জানিয়াছেন।

এক দিবস ফণীন্দ্রনাথের মাতা রাধামতিকে কোন একটী কার্য্যের ভার প্রদান করেন, রাধামতি আলস্য-প্রিয়তা প্রযুক্ত তাহাতে মনোযোগী না হওয়ায়, সেই কার্য্য শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর অভিপ্রায়ানুযায়িক হয় নাই। পুত্রবধূ বা কন্যাগণের পরিণামে উন্নতি হইবে, লোকে তাহাদের সুখ্যাতি করিবে, এই ভাবিয়াই গৃহিণী কার্য্য বিশেষে তাহাদের প্রতি ভারার্পণ করিয়া, প্রথমে কোন দোষ সংঘটন হইলে, পুনর্ব্বার সেই কার্য্য নির্ব্বাহ কালে সেরূপ ত্রুটী আর না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে তিরস্কার করিয়া থাকেন; বুদ্ধিমতি বালিকা বা যুবতীগণ আচরিত বিষয়ে দোষ লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে সতর্ক হয়। কিন্তু যাহাদের চরিত্র অপেক্ষাকৃত হীনভাবাপন্ন, তাহারাই গুরুজনের কথায় বিরক্ত হয় এবং তজ্জন্য মনঃক্ষুন্ন ভাবে কালাতিপাত করে। আমাদিগের রাধামতি এই শেষোক্ত প্রকৃতিগত রমণী, শ্বশ্রূঠাকুরাণী বা ননাদিনী তাঁহার কার্য্য সংক্রান্ত কোন দোষের কথা উল্লেখ করিলে, মনে মনে বিরক্তা হইয়া থাকেন। এরূপ চরিত্রবিশিষ্ট লোক আপনাদিগের যুক্তিই সার বলিয়া গ্রহণ করে, অপরে তাহাদিগের অপেক্ষা কোন একটি ভাল কাজ করিলেও, তাহা তাহাদিগের মনোনীত হয় না। যে দিবস রাধামতি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিয়া তিরস্কৃতা হইত, সেই রজনীতেই ফণীন্দ্র শয়নাগারে যাইয়া রাধামতির মুখের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানিতে পারিতেন যে, রমণী রোদন করিতেছেন। অভাগা

ফণীন্দ্রনাথের জীবনসর্ব্বস্ব ধনের নয়নাসারে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে! প্রিয়তমার সুখচিন্তাতেই এক্ষণে তিনি সর্ব্বদা নিয়োজিত; সাংসারিক সম্বন্ধ—একমাত্র পত্নীর চিত্ত-বিনোদন। তাঁহার সেই হৃদয়ের নিধি, অন্ধের চক্ষু অবশ্যই কোন কারণ বশতঃ মনোদুঃখে অনুতাপিতা; নতুবা অকস্মাৎ কেন প্রিয়ার কোমললোচনে বরিষার বারিধারা প্রায় অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে। ফণীন্দ্র রাধামতিকে কাঁদিতে দেখিলেই সবিশেষ কারণ জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুকচিত্তে পুনঃ পুঃ অনুনয় করিতেন, একদিন তিনি পত্নীকে এই ভাবে দেখিয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু রাধামতির মুখ হইতে কোন কথা বহির্গত হইল না; যুবতী আপন মনে নীরবে অধোমুখে বসিয়া আছে। ফণীন্দ্রের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল—কখনবা পরিধেয় বস্ত্রে প্রাণেশ্বরীর মুখ মুছাইয়া দিতেছেন, কখনবা প্রিয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ম্রিয়মাণ ভাবে বসিয়া আছেন; এই ভাবেই বহুক্ষণ যাপিত হইল। ফণীন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া পত্নীকে শতসহস্র বার অনুনয় বিনয় করিয়াও কোন উত্তর পাইতেছেন না; এত যে তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে রাধামতির শ্রীমুখের সুমধুর বাণী শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত, তাহাতেও স্ত্রীর প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি তখনও কি নিমিত্ত এরূপ হইল, কি কারণ তাঁহার অশ্রু-বারি বিগলিত হইতেছে, সেই এক কথাই শতবার জিজ্ঞাসা

করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, যে ব্যক্তি প্রিয়ার এই বিষাদের মূল, তাহার সমুচিত প্রতিশোধ লইবেন। তিনি রাধামতির রূপ লাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সহধর্ম্মিণী স্বামীর কথায় এরূপ অবমাননা করিতেছে, তাহার জন্য তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইতেছে, মধ্যে মধ্যে কথা কহিবার শক্তি লোপ পাইতেছে, তথাপি আদরের প্রণয়িণীর বিন্দুমাত্র নয়ন-বারি তাঁহার সমুদয় দুঃখ কষ্টাপেক্ষা গুরুতর। কোন মতে প্রিয়াকে তুষ্ট করিতে পারিলেই, তাহার নয়নাসার নিরস্ত হইলেই ফণীন্দ্র আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। পুনঃ পুনঃ আরাধনায় দেবতাগণও প্রসন্ন হইয়া সেবকের মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। রাধামতি পতি কর্ত্তৃক বারম্বার সাধিত হইয়া অবশেষে উত্তর করিল "আমার দুঃখের সীমা নাই, সে কথা তুমি শুনিয়া কি করিবে ?"

ফণীন্দ্রনাথ প্রিয়তমার এই কয়েকটী কথা শ্রবণ করিয়াই অপার আনন্দ-সলিলে আপ্লুত হইলেন। উৎসুক চিত্তে সবিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি; তোমার যদি দুঃখ ভার নিবারণ করিতেই না পারিব, তাহা হইলে আর এ অসার দেহ ভারে প্রয়োজন কি? এই দণ্ডেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সকল শোক দূর করিব। প্রাণেশ্বরি! কি জন্য তুমি এরূপ রোদন করিতেছ, ত্বরায় আমাকে জানাইয়া চরিতার্থ কর।"

রাধামতি। সংসারে যেন কাহারও আমার মত

দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। অভাগিনী চিরকাল দুঃখভোগ করিতেই জন্মিয়াছিল। এমন এক দিনও নাই যে, গঞ্জনা না শুনিয়া আমার দিনাতিপাত হইয়াছে। বিধাতা আমাকে চিরদুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই তোমার সহিত বিবাহ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না; এই দণ্ডে মৃত্যু হইলেই হাড় জুড়ায়।

ফণীন্দ্র। বিনোদিনি! আমি তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। ভাল, আমিই যদি তোমার দুঃখের কারণ হইলাম, তাহা হইলে আর এ অভাগা তোমাকে ত্যক্ত করিবে না। কি জন্য যে দুঃখ ভারে অধৈর্য্য হইয়াছ—সে কথাত এখন কিছুই জানিতে পারিলাম না?

রাধামতি। তোমার মত যদি সমস্ত লোক হইত, তাহা হইলে আর সংসার চলিত না। এত যে লেখা পড়া শিখিয়াছ, তাহা ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। একটা কথা উঠিলে, যদি তুমি তাহা বুঝিতেই না পারিবে, তাহা হইলে আর লেখাপড়া কি শিখিলে? আমি কি তোমারই জন্য অসুখী? বাটীতে যে তোমার মা বোন্ আছেন, তাহাদের কথায় কথায় লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আর আমি এখানে থাক্‌তে পারব না। আমার অসহ্য হয়েছে, কত দিনে যে মা গঙ্গা ঠাঁই দিবেন, তা তিনিই বলিতে পারেন? তোমার কেবল আমৃতা আমৃতা কথায় আর কাজ চলে না।

ফণীন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, মাতা

ঠাকুরাণী সময়ে সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে রীতি, নীতি শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে যে তিরস্কার করিয়া থাকেন, তাহাতেই প্রিয়ার মনোভাব এরূপ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তিনি প্রণয়িণীর প্রতি একান্ত অনুরাগী হইলেও, তাহার কথায় জননীকে কোন কথা বলিতে পারেন না। মাতা তাঁহার পরমারাধ্যা, সন্তানের রূঢ় বাক্যে জননীর হৃদয়ে যে অনুতাপের সঞ্চার হইবে; তিনি সেরূপ কুলাঙ্গার পুত্র নহেন। উপস্থিত মতে কোন প্রকারে রাধামতিকে সন্তুষ্ট করিবেন, ইহাই তাঁহার চেষ্টা। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওযাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন এবং যাহাতে রাধামতির এরূপ মনকষ্ট আপাততঃ বিদূরীত হয়, প্রণয়িণী মনের সুখে কালযাপন করিতে পারে; তদ্বিষয়ে সত্বর প্রতিবিধান করিবেন, প্রিয়া সমক্ষে স্বীকৃত হইলেন। রাধামতি স্বামীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া সুমধুর সম্ভাষণে প্রেমালাপে পতিসহ সুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে, ফণীন্দ্র কৌশলক্রমে মাতার নিকট স্ত্রীকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। রাধামতি শ্বশুরালয়ে পদার্পণ দিবসাবধি ফণীন্দ্রের সকল বিষয়েই ঔদাস্য ঘটিয়াছে। লেখাপড়া আপনার আয়ত্তাধীন, তিনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই হইবে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার অধিকার নাই; পিতামাতা জীবিত আছেন। তাঁহারা যেরূপ করিতে আদেশ করিবেন, ফণীন্দ্রকে অবনত শীরে

তাহাই করিতে হইবে। দুর্দ্দান্ত যৌবনের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি প্রণয়িণীর রূপ মাধুর্য্যে যদিও বিমুগ্ধ হইয়া বিদ্যালাভে অযত্ন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও জনক জননীর আজ্ঞাধীন! তাঁহারা যে কার্য্য করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিবেন, তাহা জন্মেও কদাচ করিবেন না। পিতা মাতাও পুত্রের চরিত্র সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাও পুত্রগত প্রাণ। পুঃপুনঃ প্রণয়িণীব মনস্তুষ্টি কর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ফণীন্দ্র রাধামতির চিত্ত বিনোদন করিতে পারেন নাই. ইহাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। এক্ষণে কোন উপায়ে রাধামতিকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিলেই, তিনি মনে মনে আনন্দ অনুভব করেন। মাতাপিতা ফণীন্দ্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, বধূমাতাকে সত্বর পিঃগৃহে পাঠাইবার দিন স্থির করিতে মনস্ত করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণীর আত্মহত্যা হইতেই হেমেন্দ্রের মনে আর সেরূপ স্ফূর্ত্তি নাই, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক। বাহ্যিক আমোদ প্রমোদে যে যুবক দিবানিশি অতি-বাহিত করিয়াও পরিতুষ্ট হইত না, এক্ষণে আর সে সকল বিষয়ে তাহার আদৌ আশক্তি নাই। অকস্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উন্মদ বলিয়া প্রতীয়মান

হয়। আহার বিহার—সংসারীর প্রয়োজনীয় ; দৈনন্দিন জীবনে লোক ইহা হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া কদাচ দুই দিবস ক্ষেপণ করিতে পারে না ; হেমেন্দ্র পূর্ব্বে যথেষ্ট আহার করিত, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যৎ সামান্য খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করিয়া দিনাতিপাত করে। যে সকল বন্ধু বান্ধবকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, তাহারা উৎসুকচিত্তে তাহার সান্ত্বনা প্রদানে সযত্ন হইলেও হেমেন্দ্রের তাহাদের প্রতি আনুরক্তি নাই! প্রণয়িণীর জীবদ্দশায় একদিনের নিমিত্তও যে হৃদয় তাঁহার জন্য আকুলিত হয় নাই, এক্ষণে সেই পত্নীর বিয়োগে হেমেন্দ্রের কি এরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে? পরিজনবর্গের সহিত তাদৃশ কথা-বার্ত্তা নাই, হেমেন্দ্র মনোদুঃখে সদাই ম্রিয়মাণ! তাহার পিতা ও ভ্রাতা মনে মনে অনুমান করিলেন যে, ভার্য্যার শোকেই হেমেন্দ্র এরূপ কাতর হইয়াছে, পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিলে সকল দুঃখ দূর হইবে এবং এই সময় হইতেই তাহার চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে, আর তাহাকে ইতর লোকের সহবাসে বেশ্যা ও সুরাশক্ত হইয়া কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু হেমেন্দ্রের প্রকৃত হৃদয়গত ভাব কে বুঝিতে পারিবে? কখনবা হেমেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, হয়ত কখনবা সংসার আশ্রমে আর থাকিবে না, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া নিরালয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিবে, আবার কখন হয়ত আপনার প্রাণ স্বহস্তে বিনাশ করিতেই উদ্যত। এইভাবে দিনাতিপাত করিতেছে, দুই একজন

বন্ধুর সহিত হেমেন্দ্রের বাল্যকালাবধি সাতিশয় সদ্ভাব ছিল, তাঁহারাও তাহার মনোগত ভাব বুঝিবার কারণ, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, অকস্মাৎ স্ত্রী কি কারণ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল এবং ইহাতেই তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

কিন্তু মৃত্যু মনুষ্যের অবশ্য হইবে, কালের কঠোর নিয়মের কে ব্যতিক্রম করিতে পারে? আত্মীয় স্বজন নিধন জনিত শোক—দুই বা দশ দিনের মধ্যেই সকলে বিস্মৃতিসলিলে নিমগ্ন করিয়া, পুনরায় সাংসারিক কাজ কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া থাকে। চিরকাল যদি একজনের বিয়োগজনিত শোকে অভিভূত হইয়া, তাহার আত্মীয় স্বজন কালক্ষেপ করিত, তাহা হইলে এত দিনে সৃষ্টি অবশ্যই লোপ পাইত! এ মহীমণ্ডলে দেহী মাত্রেই এরূপ কোন না কোন শোকে অবশ্যই অভিভূত হইয়াছেন, কিন্তু সে শোকগাথা কতকাল তাহার হৃদয়ে গ্রথিত থাকে? কার্য্য-স্রোতে সে শোকভার কোথায় যে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই! হেমেন্দ্র যে পত্নীকে দিনেকের নিমিত্তও স্নেহমমতা করে নাই, যে পতিব্রতা হিন্দু-ললনার সকল গুণের আদর্শ হইয়াও পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, আজি সেই পতি-প্রাণার বিচ্ছেদে যে হেমেন্দ্রের হৃদয় আকুলিত হইবে, সে কথা কে বলিতে পারে? হেমেন্দ্রের চরিত্র বিষয়ে যে ব্যক্তি আদ্যোপান্ত দৃষ্টি রাখিয়াছে, অনুক্ষণ তাহার সহবাসে কালক্ষেপ করিয়াছে, একমাত্র হেমেন্দ্রের অভিপ্রায় সেই

সম্যক প্রকারে অবগত; অপর ব্যক্তি তাহার বাহ্যিক হাবভাব দেখিয়া কিছুই নিরাকরণ করিতে পারে না।

দিনে দিনে হেমেন্দ্রের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল, বেশভূষায় আর তাহার তাদৃশ যত্ন নাই। লোকে তাহাকে দেখিলেই স্ত্রী-বিয়োগে কাতর হইয়া এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং যাহাতে তাহার সান্ত্বনা হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্টিত হন। কিন্তু হেমেন্দ্রের শোক—দুর্নীবার, কেহ সান্ত্বনার জন্য কোন কথার উল্লেখ করিলে, তাহার হৃদয়োদ্বেগ দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ললিত বাল্যকালাবধি দ্বারকানাথের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে,রায় মহাশয়ের পরিবার বর্গের স্বভাব চরিত্র তাহার সবিশেষ বিদিত.বিশেষতঃ হেমেন্দ্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব। রায় মহাশয় হেমেন্দ্রের পিতা এবং ললিতের প্রভু। প্রভুপুত্রের স্বভাব, দোষে দূষীত হইলেও সকল বিষয়ে হেমেন্দ্রের সমকক্ষ হইয়া কার্য্য করিবার তাহার অধিকার নাই। সুযোগ মতে ললিত হেমেন্দ্রের সহিত একত্র আমোদ প্রমোদ করে। প্রভু-পুত্র যে ভার্য্যার জীবদ্দশায়, তাঁহার প্রতি এক দিনের নিমিত্তও অনুরাগী ছিল না, বারবিলাসিনীর সহিত সুখ সম্ভোগই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—এ কথা ললিত সম্যকরূপে জানিত। উপস্থিত চিত্তচাঞ্চল্যে যে হেমেন্দ্র অধীর হইয়াছে, সে মনোবিকারের মূল কারণ, ললিতের পক্ষে কিছুই অবিদিত নহে। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া হেমেন্দ্রের দিন দিন শোচনীয় দশা পর্য্য-

বেক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপিত হইলেন এবং তাহার প্রতীকারার্থে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রকৃত রোগের ব্যবস্থা না হইলে, সে চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না। হেমেন্দ্রের চিত্ত যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে বিকার গ্রস্থ, সে কথা তাহারা কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? হেমেন্দ্র প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনোদুঃখে যাপন করে। কেহ কোন হিত কথা বলিলেও হেমেন্দ্রের তাহার প্রতি আস্থা নাই। হেমেন্দ্র আপনার মনে যাহা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে, লোকের কথায় সে বিশ্বাস তাহার বিচলিত হইবার নহে। আমি জীবনে যাহার প্রতি এক দিনের নিমিত্তও যত্ন করি নাই, যে আমার মঙ্গল চিন্তায় দিবানিশি ক্ষেপণ করিয়াছে, আমার চিত্ত-বিনোদন যাহার একমাত্র কামনা, পার্থিব ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া যে আমার উন্নতি-আশয়ে অহোরাত্র চিন্তায় নিমগ্ন, আমি তাহার প্রতি পুনঃ পুনঃ পরুষ ব্যবহার করিলেও যে আমাকে আপনার বলিয়া যত্ন করিত; লাঞ্ছনা, তিরস্কার কিছুতেই যাহার মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্যভাবের উদয় হয় না, যে আমাকে দেখিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিত; যে আমার সুখ দুঃখের সমভাগী, এ সংসারে তাহাকে জন্মের মত হারাইলে অবশ্যই হৃদয় আকুলিত হইতে পারে, কিন্তু সকলের মন বা চরিত্র সমান নহে। হেমেন্দ্র নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি ও মহাপাপী; তাই জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পতিপ্রাণা কামিনীর মনে নিত্য নিত্য কষ্ট প্রদান করিয়াছিল; সাধ্বী সতী কত শত বার পতিকে সদুপদেশ

প্রদান করিয়াছিলেন, অভাগা হেমেন্দ্র ভ্রমে পড়িয়া সহধর্ম্মিণীর সার.যুক্তি গ্রহণে অমনোযোগী হইয়াছিল। এক্ষণে সেই স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহজন্মের মত চলিয়া গিয়াছে, আর এ জীবনে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। এ নিমিত্তও হেমেন্দ্রের হৃদয় কতক পরিমাণে অনুতাপিত। অভাগা অনুষ্ঠিত গর্হিত কার্য্যের বিষয় স্মরণ করিয়া শোকানলে বিদগ্ধ হইতেছে; কিন্তু সে শোকও তাহার মত পাষাণ হৃদয়ে অনায়াসে সহ্য হইতে পাবে।, যে ব্যক্তি সামাজিক রীতি নীতির বিরোধী, সর্ব্বদাই মদ ও বেশ্যার উপাসনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ শোক তাদৃশ দুঃখজনক বিবেচিত হয় না। হেমেন্দ্র পত্নীর মৃত্যুর দিবসাবধি দুই তিন দিন বাটী হইতে বহির্গত হয় নাই, নিয়ত শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় ক্ষেপণ করিয়াছিল; কিন্তু তৎপরে তাহার সে ভাবেব পরিবর্ত্তন হইল। যুবক ললিতের সহিত রাত্রিযোগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সুদীর্ঘকাল স্থানান্তরে কাটাইয়া যথাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। এ সকল ঘটনা একমাত্র ললিত ব্যতিরেকে আর কেহই জানিতে পারে নাই। হেমেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন স্ত্রী-বিয়োগজনিত শোকে তাহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, ইহাই স্থির অনুমান করিয়াছিলেন।

ললিত উদারপ্রকৃতি, লোকের সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিযা থাকে, এনিমিত্ত তাহার চরিত্র দোষ সত্বেও সকলেই তাহাকে ভালবাসে। সুরাপানে বিহ্বল হইলে

লোকের চৈতন্যের এককালে লোপ হয়, সে সময়ে হিতাহিত কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি থাকে না। এক দিবস ললিত সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া হেমেন্দ্রের বৈঠকখানা গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। মহেন্দ্র সৎ ও সুধীর প্রকৃতি, তিনি ললিতকে এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন দেখিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু উপস্থিতে হেমেন্দ্র যে শোকাকুল ভাবে দিনযাপন করিতেছে,ইহার সবিশেষ কারণ জানিবার জন্য তিনি সাতিশয় উৎসুক হইলেন, কনিষ্ঠের সহিত ললিতের যে বিশেষ প্রণয়, তাহা তিনি জ্ঞাতছিলেন। এই সুযোগে ললিতের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত সমুদায় জানিতে 'পারিবেন অনুমান করিয়া, মধুর আলাপনে ললিতকে সম্ভাষণানন্তর তথায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। ললিত ক্ষণকাল তথায় উপবিষ্ট হইয়াই, আপনার মনে কত কথার উত্থাপন করিল। কথায় কথায় মহেন্দ্র ললিতকে সহোদরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ললিত অকপট চিত্তে হেমেন্দ্র সম্বন্ধে যথাযথ সকল কথা তাঁহার সমীপে বিদিত করিল। এক্ষণে আর হেমেন্দ্রের উপস্থিত দুঃখভাব দর্শনে মহেন্দ্রের চিত্ত আকুলিত হইবে না! হেমেন্দ্র যে জনৈক বারবিলাসিনীর প্রতি একান্ত আশক্ত এবং সেই গণিকা অর্থলোভে মুগ্ধা হইয়া হেমেন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন ভদ্র সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতেছে; তজ্জন্য হেমেন্দ্রের এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ও এক্ষণে কোন সুযোগে পুনরায়, সেই পিশাচিনীর

প্রেমানুরাগ লাভ করিতে পারিলেই, অভাগা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। ভ্রাতার এবম্বিধ চরিত্র জ্ঞাত হইয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ললিতকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তবে এখনও কি জন্য রাত্রিকালে হেমেন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হয়? ললিতের তৎকালে চৈতন্য লোপ হইয়াছে, কোন্ কথায় কিরূপ উত্তর প্রদান করিবে—বিবেচনাশূন্য; অম্লানবদনে ললিত মহেন্দ্রকে উত্তর করিল যে, সে বারাঙ্গনা কনিষ্ঠ বধূর মৃত্যু সংবাদে হেমেন্দ্রের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতে থাকে। এক্ষণে সে রমণী অপর কোন ব্যক্তির রক্ষিতা বটে, তথাচ তাহার অনুপস্থিতি কালে হেমেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠায়। হেমেন্দ্র তাহার দর্শনলাভ আশয়ে এত দিন মৃতপ্রায়ছিল, এক্ষণে নিশাযোগে অবকাশ মত গোপনে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসে। সেই জন্যই তাহাকে বাটী হইতে নিশাকালে বহির্গত হইতে হয়। হেমেন্দ্রের বিষণ্ণচিত্ত হইবার আরও কারণ এই যে, এরূপ আমোদ প্রমোদে অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু আমোদমত্ত অলসপ্রিয় হেমেন্দ্রের সে পথে কণ্টক পড়িয়াছে। পিতা মাতা কাহারও নিকট তাহার এক্ষণে একটী পয়সারও প্রত্যাশা নাই; বিনাব্যয়ে যে আমোদ লাভ হয়, এক্ষণে তাহাতেই অভাগা স্বীকৃত। মহেন্দ্রনাথ ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে ললিতের নিকট সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু ইহার আশু কোনপ্রতীকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত। সংসারের প্রতি বাল্যকালাবধি

হেমেন্দ্রের ঔদাস্যভাব, সর্ব্বদাই সে স্থানান্তরে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে ভালবাসে, তাহাতে সম্প্রতি তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। হেমেন্দ্রের ভার্য্যার প্রতি আশক্তি না থাকিলেও, কনিষ্ঠ বধূ যে স্বামীকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন এবং তিনিই সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিলেন; এ কথা রায় মহাশয়ের পরিবারবর্গের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। যে রমণী স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, পতির চরিত্র দোষের নিমিত্ত তিনি যে সর্ব্বদা বিষন্নবদনে মনোদুঃখে কালাতিপাত করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। পতিনিন্দা যাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইত, হেমেন্দ্রের এক্ষণে সেই সাধ্বী সতী ভার্য্যা আর নাই! পাষাণ হৃদয় দুর্ব্বৃত্ত হেমেন্দ্র অবশ্যই তাঁহার শোকে অভিভূত হইয়াছে; স্বভাব দোষে হেমেন্দ্রের বারবিলাসিনীর প্রতি আশক্তি থাকিলেও, তাহার হৃদয়ে পতিপ্রাণা প্রণয়িণীর কমনীয় মূর্ত্তি অবশ্যই অঙ্কিত রহিয়াছে; এসময়ে তাহাকে চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া কোন কথা বলিলে, হয়ত তাহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাব অধিকতর বৃদ্ধি হইতে পারে। বিচক্ষণ হেমেন্দ্র এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া, ভ্রাতাকে কোন কথাই বলিলেন না। অধিকন্তু তাহার যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, মনোবিকার বিদূরিত হয়, প্রফুল্লচিত্তে সময় ক্ষেপণ করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে সযত্ন হইলেন। রায় মহাশয় বিষয় কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিবার তাঁহার অবকাশ

নাই। তাহাতে বয়োধিক্য প্রযুক্ত সাংসারিক কার্য্যে এক প্রকার বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের অসৎস্বভাবই তাঁহার এইরূপ ঔদাস্যের মূল কারণ! কিন্তু পিতামাতার হৃদয়ে পুত্রের অসৎ স্বভাবই গুরুতর ক্লেশ দায়ক হইয়া থাকে। দ্বারকানাথ হেমেন্দ্রের প্রতি কুপিত হইলেও, এক্ষণে যাহাতে তাহার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, সুখসচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারে, তাহার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ফণীন্দ্রনাথ রাধামতিকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়াও তাহার ভালবাসা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কত শতবার পত্নী তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি সরলচিত্ত স্বামীর হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বিবাহ দিবসাবধি ফণীন্দ্র রাধামতিকে যে শুভ চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেই ভাবেই এতাবৎ কাল দেখিয়া আসিয়াছেন; ভার্য্যার সহস্র দোষও তাহার পক্ষে মার্জ্জনীয়। তিনি এক দিনের নিমিত্তও রাধামতিকে কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই। রমণী—আদরের সামগ্রী, যত্নের নিধি ও কোমল হৃদয়া। পুরুষের পরুষ বাণী কামি-

নীর অসহ্য! তিনি মনে মনে ইহাই স্থির ভাবিয়া,যাহাতে রাধামতির হৃদয়ে দুঃখ বোধ হয়, কদাচ এরূপ কোন কথার উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু সংসারে একপক্ষ সরলতাপূর্ণ,অপর পক্ষে কপটতার ভীষণ চিত্র ; এ উভয়ের সন্নিবেশ বড়ই সুকঠিন! তাহাতে ফণীন্দ্র ভার্য্যা প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছেন যে, জননীই এ মনোমালিন্যের কারণ। সুবোধ সন্তান সহধর্ম্মিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেও, তাহার কথায় গর্ভধারিণীর প্রতি কদাপি কোন কটূক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। বুদ্ধি কৌশলে যাহাতে সেরূপ ঘটনা পুনরায় না সংঘটন হইতে পারে তদ্বিষয়েই দৃষ্টি রাখে। রাধামতির শ্বশ্রূঠাকুরাণী পরিণামে তাহার মঙ্গল উদ্দেশেই মধ্যে মধ্যে সাংসারিক কার্য্য-সূত্রে তিরস্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু অভাগিনী রাধামতি সে ভাব ভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াই আপনার সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। ফণীন্দ্রনাথের একপক্ষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা রাধামতি, অন্যপক্ষে ইহ জগতে দেবী স্বরূপিণী স্নেহময়ী জননী! পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টিত হইয়াও অবশেষে আত্মত্যাগ স্বীকারই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া, এক দিবস প্রভাতে ফণীন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যে কোথায় প্রস্থান করিল, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রাধামতির পতির প্রতি আস্থা না থাকিলেও, এক্ষণে সমধিক শোককাতরা হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রনাথ গৃহিণী সহ অবশেষে যুক্তি করিয়া বধূমাতাকে

পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। স্বেচ্ছাচারিণী রাধামতি পিত্রালয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। বঙ্কেশ্বর জামাতার নিরুদ্দেশ সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন। সংসারের একমাত্র অবলম্বন দুহিতা—রাধামতির স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! পতিই নারীর জীবন সর্ব্বস্ব, হিন্দুললনা একমাত্র স্বামীর সুখদুঃখের অধিকারিণী। অভাগিনী রাধামতির ভবিষ্যৎ অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া মিত্রজা মহাশয় বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। ফণীন্দ্রনাথ সুবিজ্ঞ, লেখাপড়া শিখিয়াছেন। তিনি যে এরূপ অস্থির প্রকৃতি হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার জনক জননী প্রিয়পরিজনবর্গ বিয়োগজনিত শোকে আকুলিত হইবে, সে কথা কি তাঁহার মনে একবারও উদয় হইল না! বঙ্কেশ্বর এই সকল মনে মনে চিন্তা করিয়া শোকাকুল হইলেন। রাধামতিকে বহু দিবস দেখিতে পান নাই, একাকী সংসারে এ কয়েক মাস কাটাইতে ছিলেন, রাধামতির আগমনে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-উৎস প্রবাহিত হইবে—কিন্তু ভগবান সে সুখে বাদ সাধিয়াছেন! বঙ্কেশ্বর জামাতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত গোপনে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এ দিকে যাহাতে দুহিতা পতি-চিন্তায় এককালে নিমগ্না না থাকে, সাংসারিক কাজ কর্ম্মে নিয়োজিতা থাকিয়া সময় ক্ষেপণ করে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। রাধামতি পিতৃ-গৃহে আসিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

স্বামী সচ্চরিত্র ও সাধুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইলেও অভাগিনী

পতিভক্তি অজ্ঞাত ছিল। ফণীন্দ্র তাহাকে যে প্রাণাপেক্ষা আদরের সামগ্রী জ্ঞান করিত এবং তাহারই নিমিত্ত যে গৃহত্যাগী হইয়াছেন; এ ধারণা রাধামতির মনে ক্ষণ-কালের নিমিত্তও উদয় হয় নাই। রাধামতি বাল্যকালাবধি সুখসচ্ছন্দে ক্ষেপণ করিয়াছে, জনক জননীর অন্য সন্তান সন্ততি না থাকায়, রাধামতিই তাঁহাদিগের এক-মাত্র আদরের ধন; পতিব্রতা কমলা রাধামতিকে অকূল দুঃখপাথারে ভাসাইয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে একমাত্র পিতা—রাধামতির আশ্রয়স্থল। বঙ্কেশ্বর দুহিতার চিত্ত-বিকার নিবারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এক দিনের জন্যও তাহার প্রতি অনাদর করিলেন না। একমাত্র কন্যাকে অবলম্বন করিয়াই বঙ্কেশ্বর সংসারী! আহারবিহার, বসনভূষণ, রাধামতির যখন যে কোন বস্তুর অভাব হইত, বঙ্কেশ্বর তদ্দণ্ডে তাহা যোগাইতেন, ক্ষণেকের নিমিত্তও সে বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। রাধামতি পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াও, পিতৃদেব প্রসাদে মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। কামিনী বাহিরের কাজ কর্ম্ম করে, আর রাধামতি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকে। বঙ্কেশ্বর কার্য্যস্থান হইতে যথা সময়ে প্রতিদিন গৃহে আসিয়া কন্যার সুকোমল মুখশ্রী দর্শনে প্রিয়া বিরহজনিত সকল শোকের শান্তিলাভ করেন। সুখ দুঃখে এক প্রকার দিন চলিয়া যাইতেছে, কোন দিকেই গোলযোগ নাই। কিন্তু যাহার যেপ্রকার স্বভাব, সে তদনুরূপ কার্য্য করিতে ভাল বাসে; বিপরীত বা বিভিন্ন স্বভাবানুসারে কালক্ষেপ

তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য! রাধামতি বিলাসিনী, আমোদ প্রমোদে অনুরক্তা; সেই ভাবে থাকিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। পরিণামে যে ভীষণ পথের পথিক হইয়া মহা বিপদে পতিতা হইবে, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। দিনে দিনে পিতৃগৃহে একাকিনী কাল-যাপন তাহার বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ এক্ষণে তাহার পূর্ণযৌবন! যৌবন কালেই নর নারীর রিপুসমূহ প্রবলবেগে দেহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। তাহাদিগের ভীষণ ঘাত প্রতিঘাতে অবিচলিত স্থিরমতিও সচঞ্চল হইয়া উঠে। মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে—অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা-শূন্য হইয়া, রাধামতি তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে! এক্ষণে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট না থাকিলেও তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই। সদা সর্ব্বদাই যেন কোন বিষয় বিশেষের চিন্তায় চিন্তাকুলা। যৌবনকালে হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে, পদে পদে বিঘ্নরাশি সমুত্থিত হয়; বিশেষ চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে জগতের প্রলোভনে মোহিত হইতে হয় না। যে নরনারী আমোদই সংসারের সার জানিয়াছে, ঐহিক সুখসম্ভোগ ব্যতিরেকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে পারে না, তাহাদিগের পক্ষে চরিত্র দমন দুরূহ ব্রত। রাধামতি একে বিলাসভোগী, তাহাতে কুটিলা কামিনী তাহার সহচরী। অধর্ম্মাচরণে আপাততঃ সুখলাভ হয়, পরিণামে অনন্ত নরক—চিরকাল যে দুঃখ যন্ত্রণায় যাপন

করিতে হইবে, সে জ্ঞান থাকে না। হিন্দুগৃহে রমণীর সতীত্ব জগতের যাবতীয় নারীজাতির আদর্শ স্থানীয় কোন বস্তুর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য নাই। হিন্দুললনা পতিব্রতা সাধ্বী হইয়া জগতের শীর্ষ স্থানীয়া। রাধামতি সরল ও উদার প্রকৃতি বিশিষ্টা হইলেও, বালিকাবস্থা হইতেই স্বেচ্ছাচারিণী; কামিনী তাহার উপদেষ্টা। যখন যে বিষয়ে আশক্তির সঞ্চার হয়, সকল বিষয়েই কামিনী রাধামতির সহায়তা করিয়া থাকে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, এক দিবস সন্ধ্যাকালে রাধামতি সহচরী সমভিব্যাহারে ছাদোপরি বিহার কালে জনৈক যুবক তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল; পাপাত্মা হেমেন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে সেব্যক্তি অপর কেহ নহে। কামিনীর চরিত্র ভালছিল না; সংসর্গদোষে সংস্বভাব বিশিষ্ট নরনারীও বিকৃত অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। কামিনী এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণতা, কিন্তু তাহার চরিত্রগত দোষ কোথায় যাইবে? বৃদ্ধা রাধামতিকে বাল্যকালাবধি আপনার আয়ত্বাধীন করিয়াছে, মনে মনে স্থির ভবিয়াছে—অন্তিম সময়ে তাহার স্কন্ধে উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এদিকে হেমেন্দ্রনাথ পত্নীবিয়োগে কল্পিত শোককাতর হইয়া কতিপয় দিবস ক্ষেপণ করিল। অভিপ্রেত বারবিলাসিনীসহ প্রণয় মিলনে মিলিত হইলেই তাহার সমস্ত দুঃখ ঘুচিবা যাইবে; কিন্তু জগদীশ্বর অসংউদ্দেশ্য কদাচ পূর্ণ করেন না, পদে পদে তদ্বিষয়ে বিপদ সংঘটিত

হইয়াথাকে। তাহাতে বারাঙ্গনাগণের অনন্তলীলা! হেমেন্দ্র যে পতিতা কামিনীর কারণ মানসম্ভ্রম সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছে,একমাত্র তাহার মনস্তুষ্টিই সংসারের সার বলিয়া জানিয়াছে, যাহার প্রতি তাহার প্রীতি দেখিয়া সংস প্রিয় পরিবারবর্গ তাহাকে দুর্জ্জন শত্রু বলিয়া বি করিয়াছে, যে কুলটার প্রণয় লাভে নিশি যাপন ক পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে জন্মেরমত হারাইযাছে, য সেই পাপিয়সী আর হেমেন্দ্রের ভালবাসায় মুগ্ধা ন গণিকা এক্ষণে জনৈক অপর যুবকের প্রণয়ে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। অভাগা হেমেন্দ্র কুটিলমতি, কুহকিনীর এসকল চাতুরী ছলনা লক্ষ্য করিয়াও তাহার প্রতি প্রেমাশক্তি হৃদয় হইতে ত্যাগ করিতে পারে নাই। মায়াবিনী ছলনাজাল বিস্তারিত করিয়া এখনও তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, হেমেন্দ্র সে পাপ মুক্ত হইয়া যে উদ্ধার পাইবে, সে চৈতন্য তাহার লোপ পাইয়াছে। বারবিলাসিনী তাহাকে অনাদর করিলেও সে তাহার আদরিণী—জীবনের আনন্দদায়িনী। দিবা নিশি হেমেন্দ্র তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন, কতদিনে পুনরায় উভয়ে প্রেমালাপে মিলিত হইবে, অভাগা একাগ্র চিত্তে সেই সময়ের প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিল।

ভ্রষ্টা রমণীর হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশ মাত্র নাই! ছলনা, চাতুরী দ্বারা তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিতা নহে, যে কোন উপায়ে হউক প্রলোভন

দ্বারা লোককে মুগ্ধ করিয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ পূর্ব্বক পরিণামে ত্যাগ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মোহ ও রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া লোকে গণিকার কৃত্রিম প্রণয়ে বিমোহিত হয়,সে সময়ে তাহার হিতাহিত বিবেচনাশক্তি লোপ পাইয়া থাকে। হেমেন্দ্র জনৈক কুহকিনী বারাঙ্গনার প্রণয়-লোলুপ হইয়া, সুখের সংসার বিষাগারে পরিণত করিয়াছে। এক্ষণে সেই পাপিয়সীর চরিত্রও সম্যক প্রকারে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কিন্তু মোহিনীর কি মোহিনী শক্তি! পদে পদে অবমানিত হইয়াও অভাগা হেমেন্দ্র তাহারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী! স্ত্রী বিয়োগ জনিত শোকাপেক্ষা কুলটার সহিত বিচ্ছেদ তাহার হৃদয়তন্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। কোন উপায়ে পুনরায় তাহার সহিত একত্র মিলিত হইতে পারিলেই, হেমেন্দ্রের স্বর্গীয় সুখ অনুভব হয়! গৃহে পতিব্রতা সতী-লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী যে, একমাত্র পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া, মনোদুঃখে আত্মঘাতিনী হইলেন; সেকথা তাহার হৃদয়ে একবারও স্থান পাইল না। যে সকল লোক বাল্যকালাবধি আমোদপ্রিয়, বেশ্যা ও সুরা যাহাদের জীবনের একমাত্র উপাদেয় সামগ্রী, তাহাদের কখনও মতের স্থিরতা নাই; ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নভাব ধারণ করে। যে গণিকার জন্য হেমেন্দ্র এতাবৎকাল উৎকণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করিতে ছিল, বহুল উদ্যমে নিষ্ফল হইয়া অবশেষে সেই পাপিয়সীর আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু চিরাভ্যস্ত অসৎ প্রকৃতি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে,

তাহা পাপময় হইয়া উঠে। হেমেন্দ্রের বহুকালাবধি রাধামতিকে কোন প্রকারে হস্তগত করিবার একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু এতাবৎকাল সে সুযোগ তাহার ঘটিনা উঠে নাই। বিশেষতঃ ফণীন্দ্রনাথকে লইয়া একদিন আমোদ প্রমোদ করায়, পিতা ও অন্যান্য গুরুজনবর্গের নিকটে বিশেষরূপে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে সে আশা তাহাকে এককালে স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত করিতে হইয়া ছিল। এক্ষণে তাহার হাতে পয়সা নাই, পিতা মাতার নিকট হইতেও অর্থ সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; সময়ে সময়ে স্ত্রীর কাছেও দুই দশ টাকা পাইত, সেপথেও কণ্টক পড়িয়াছে; অথচ আমোদ ব্যতিরেকে তাহার দিন কাটে না।

রাধামতি পিতৃগৃহে আসিয়া স্বেচ্ছামত কাজকর্ম্ম করে। তাহার দোষের কথা উল্লেখ করিয়া দুই এক কথা বলিবারও কেহ নাই। চন্দ্রনাথ পুত্রশোকেই জর্জ্জরিত, উপযুক্ত সন্তান গৃহত্যাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কি সুখে তিনি আর সংসারে থাকিবেন? বিবাহ দিয়াই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ইহার প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি মনোদুঃখেই কালাতিপাত করেন। বধূমাতাকে লইয়া সাদ আহ্লাদ করিবেন, কিন্তু গৃহে যে ফণীন্দ্রনাথ নাই। এক্ষণে রাধামতিকে দেখিলেই তাঁহার শোকের উচ্ছ্বাস প্রবল বেগে বহিতে থাকিবে, স্থির ভাবিয়া রাধামতিকে লইয়া যাইবার আর কোন কথা উত্থাপন করেন না। কিন্তু সময়ে সময়ে বক্রেশ্বরের বাটীতে খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া তত্ত্বাদি করেন।

এই ভাবেই দিন যাইতেছে। রাধামতি পিতৃগৃহে মনের সুখে কাল কাটাইতেছে, কিন্তু সময়ের ধর্ম্ম কে লঙ্ঘন করিবে? এক্ষণে রাধামতি—পূর্ণযুবতী। আহার বিহারে মনোবৃত্তি উত্তেজিত ভিন্ন তৃপ্তি হইবার নহে! তাহাতে কামিনী—সহচরী! সময়ে সময়ে উভয়ে নানাবিধ রসালাপ হইয়া থাকে। বঙ্কেশ্বর এ সকল কথার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। ভার্য্যা-বিয়োগাবধিই তিনি অতি পবিত্র ভাবে দিন যাপন করিতেছেন; দুঃখে কষ্টে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। সংসারে একমাত্র দুহিতা রাধা মতি, আপনি ও পরিচারিকা—কামিনী। পরিশ্রমান্তে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার সময় সুখে অতিবাহিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে এক দিবস হেমেন্দ্র কোন সুযোগে কামিনীকে হস্তগত করিয়া তাহার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিল এবং এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কার দিবে—অঙ্গীকার করিয়াছিল। কামিনী এই সকল কার্য্যেই সুপটু, হেমেন্দ্র প্রমুখাৎ সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। রাধামতির উপরে কামিনীর সম্পূর্ণ অধিকার; কামিনী রাধামতিকে যেভাবে চলিতে বলিবে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য হইয়া যুবতীকে তাহাই করিতে হইবে। কামিনী হেমেন্দ্রের প্রস্তাবে অঙ্গীকৃতা হইয়া কয়েক দিবস রাধামতির সহিত নানাবিধ প্রেমরসালাপ করিতেছিল। রাধামতি এক্ষণে পূর্ণযৌবনা হইলেও কামিনীর অভিসন্ধি কিছুমাত্র বুঝিতে

পারে নাই। প্রতিদিন কামিনী তাহার সহিত এই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে, আর রাধামতি নিষ্পন্দ ভাবে সেই সকল কথা শ্রবণ করে। কথায় কথায় কামিনী এক দিবস রাধামতির নিকটে তাহার স্বামীর কথা উত্থাপন করিল। ফণীন্দ্রনাথ যে সময়ে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, সে সময়ে রাধামতি এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। পতি যে স্ত্রীলোকের আদরের সামগ্রী, স্বামী-সোহাগেই রমণী যে সংসারের সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে, সে সকল বিষয় তৎকালে সে তরুণ হৃদয়ে কিছু মাত্র অঙ্কিত হয় নাই। বিবাহ দিবসাবধি রাধামতি স্বামীকে পর পুরুষ জ্ঞানে অতিশয় অযত্ন করিত; কিন্তু দিনে দিনে তাহার সে ধারণা লোপ পাইযাছে; ফণীন্দ্র তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন ও যত্ন করিতেন; রাধামতি নিজ দোষেই সে সুখের হন্তারক হইযাছে। পতি তাহার নিমিত্তই সংসার-সুখ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে রাধামতির হৃদয়ে পতির প্রেমমূর্ত্তি দিনে দিনে অঙ্কিত হইয়াছে। রাধামতি তৎকালে স্বামীর প্রতি যথাযথ ব্যবহার করে নাই বলিয়া, এক্ষণে অনুতাপিতা; কোন সুযোগে পতির সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে, আর তাঁহাকে নয়নের অন্তরালে রাখিবে না; নিরন্তর প্রেম-মিলনে কালযাপন করিবে। রাধামতি পতি-প্রেম-পাগলিনী হইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছে, পিতৃগৃহে স্বেচ্ছামত আহার বিহার করিয়াও তাহার মনে,সুখ নাই। পতিই নারীর জীবন

সর্ব্বস্ব, শান্তি-সদন ও পূর্ণানন্দ; এক্ষণে তাহার সে ভাব অনুভব হইয়াছে; কামিনী সময়ে সময়ে তাহার সহিত পরিহাসাদি করিয়া থাকে, কিন্তু সরল মতি রাধামতির হৃদয়ে তাহা শক্তিশেল সম বিদ্ধ হয়। কামিনী রাধামতিকে প্রকৃতই পতি-বিরহে একান্ত কাতরা দেখিয়া, এক দিবস কথায় কথায় কহিল "আজ রাত্রিতে তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" রাধামতি বহুকালাবধি পতি-প্রেমে বঞ্চিতা, অকস্মাৎ দাসীর মুখে পতির কথা শুনিয়া যুবতী উত্তর করিল "কামিনি! আমার সহিত এত পরিহাস কেন? প্রাণনাথ আজ সাত বৎসর হইল নিরুদ্দেশ রহিয়াছেন, এতকাল তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না! আজ কিনা অভাগিনী তাঁহাকে দেখিতে পাইবে?"

কামিনী। আচ্ছা, আজ রাত্রিতেই আমি তোমাকে দেখাইব, কোন কথার প্রয়োজন নাই; তুমি তখন জানিতে পারিবে—যে সত্য কি মিথ্যা!

রাধামতি। কামিনি! তুমি দেখাইবে, তবে আমি দেখিব? প্রাণেশ্বর কি আমায় দেখা দিবেন না? দাসীর অপরাধ কি তিনি এখনও বিস্মৃত হন নাই? আহা! আমি অভাগিনী; তিনি পরম সাধু! তাঁহার চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ নাই, আমি নিজ দোষেই সেই পতিরত্নে বঞ্চিতা হইয়াছি। ভাল, তিনি কি আমাদের বাটীতে আসিবেন না? তুমি দেখাইবে—একথায় যে সন্দেহ হয়!

কামিনী। রাধা দিদি! ফণীন্দ্র বাবু অনেক

দিনের পর দেশে আসিয়াছেন; এখন কি আগেভাগে তোমার সহিত—দেখা করিতে পারেন? কাল সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল; আজি রাত্রিতে তিনি তোমার সহিত একবার দেখা করিয়াই, আপনার ঘরে যাইবেন।

রাধামতি। কামিনি! তিনি আমাকে দেখিতে আসিবেন না, তবে তাঁহাকে আমি কি প্রকারে দেখিতে পাইব? আবার বলিতেছ—তিনি দেখা দিয়াই চলিয়া যাইবেন! তোমার এসব কথাত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কামিনী। সে সকল কথায় তোমার প্রয়োজন কি? স্বামীর জন্য কাতরা হইয়াছ, তাঁহার সহিত তোমার দেখা হইবে। তার পর সাক্ষাতে তোমার মনে যা আছে কর।

রাধামতি কামিনীকে অধিক কথা আর জিজ্ঞাসা করিল না। যুবতী পতির সহিত পুনরায় মিলিত হইবে, এই শুভ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া—বিবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা হইল ও ক্ষণে ক্ষণে রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল!

এ দিকে কামিনী গত রাত্রিতে হেমেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছিল যে, রাধামতিকে পতিদর্শন প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বাটী হইতে অন্তরালে লইয়া যাইবে। তথায় হেমেন্দ্র, ললিতচন্দ্র সহ এক খানি গাড়ী লইয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা

করিতে থাকিবে। যথা সময়ে রাধামতিকে লইয়া কামিনী শকট সমীপে উপনীত হইলে, হেমেন্দ্রনাথ পতি-ভাবে তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক শকট মধ্যে লইয়া যাইবে। দুশ্চারিণী কামিনীর অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই!

অন্যপক্ষে রাধামতি বহুকালের পর পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবে, ফণীন্দ্রনাথ হয়ত লজ্জা ভয়ে কোন কথাই কহিতে পারিবেন না। স্বামীর অধোমুখ দেখিয়া রাধামতি যেন মনে মনে বিরক্ত না হ'ন, তাহার ইচ্ছামত কার্য্যে যেন কোন প্রকার দ্বিধার সঞ্চার না করেন—ইত্যাদি নানা কথা কামিনী রাধামতিকে শিখাইতে লাগিল। পথে যাইয়া স্বামীর সহিত দেখা করিতে হইবে, কামিনী প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া রাধামতি কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতা হইল ও পিতার আদেশ ব্যতিরেকে এরূপ কার্য্য করিতে প্রথমতঃ সম্মতা হইল না। কিন্তু তৎকালে যুবতী স্বামীর জন্য পাগলিনীপ্রায় অবস্থিতি করিতে ছিল, অকস্মাৎ মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে শুনিয়াই—তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে এ কার্য্যে কামিনী সহায়তা করিতেছে, অবশ্যই মনোমত ধন লাভ করিবে, এইসকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কথা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিল না। কতক্ষণে প্রেমমূর্ত্তি প্রাণনাথের দেখা পাইবে, এই সময়ের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, জগৎ অন্ধ-

দ, পথ ঘাটে লোকের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইতে লাগিল। নিশাগমে রাধামতির হৃদয়ে অধিক আনন্দ সঞ্চার হইল; অচিরে প্রাণনাথ সহ মিলিত হইবে. আজ গত সাত বৎসর কাল অভাগিনী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া অনাথিনী ভাবে দিন যাপন করিতে ছিল; বিধাতা তাহার প্রতি এতদিনে করুণাকটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; আজি তাহার শুভগ্রহ। এতাবৎ কাল যুবতী যে পতি-প্রেমাশয়ে বিষণ্ণ মনে কালাতিপাত করিতে ছিল.আজি ভগ্ন-হৃদয়ার সেই সাধ পূর্ণ হইবে, মনের সুখে পতি সহ প্রেমালাপে মিলিত হইয়া, পরমানন্দে নিশিথিনী যাপিত হইবে,রাধামতি মনে মনে এই সকল কল্পনা করিতে ছিল। অন্যান্য দিবসাপেক্ষা সে দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আহারাদি করিয়া কতক্ষণে পতির সহিত মিলিত হইবে—মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতেছিল। হিতৈষিণী কামিনী কতক্ষণে তাহাকে স্বামী সকাশে যাইবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিবে—ভাবিতেছে; এমন সময়ে কামিনী তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। রাধামতি তাহাকে দেখিতে পাইয়া, সমধিক ব্যগ্রতা সহকারে আনন্দ চিত্তে সাদর সম্ভাষণ করিয়া যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর কামিনী তাহার গমন প্রতীক্ষার অপেক্ষা করিতেছে শুনিয়া, রাধামতি সত্বর পদবিক্ষেপে কামিনীর অনুগামিনী হইল। বঙ্কেশ্বর সন্ধ্যাকালে আহারাদি করিয়া বহির্বাটীর দ্বারদেশে জনৈক বয়স্য সহ দ্যূত ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। রাধা-

মতি কামিনী সহ বাটী হইতে যে বহির্গত হইল, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। অথবা মধ্যে মধ্যে রাধামতি সহচরী সমভিব্যহারে রায় মহাশয়ের বাটীতে সুমতির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া থাকে, বোধ হয় কন্যা সেই স্থানেই যাইতেছে, এইরূপ অনুমান করিয়া সে বিষয়ে তাদৃশ লক্ষ্যও করেন নাই। তিনি আপনার ক্রীড়াতেই উন্মত্ত ছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্রনাথ, ললিত চন্দ্র প্রমুখাৎ ভ্রাতার আদ্যোপান্ত বিবরণ সম্যক জ্ঞাত হইয়া পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও নিকট কোন কথার উল্লেখ করিলেন না; আপনার মনে মনেই সেই সমস্ত কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র স্ত্রী-বিয়োগ জনিত শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াছে, দিনে দিনে তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, এ সময়ে দ্বারপরিগ্রহ করিলে, অবশ্যই তাহার সুমতি হইবে; অসৎ সঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল, উপস্থিত মতে সে সমস্ত তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। হয়ত আর সে অবোধের মত

অলীক আমোদ প্রমোদে আশক্ত হইবে না, দ্বারকানাথ এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া হেমেন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পুত্র অসৎ প্রকৃতির হইলেও পৈত্রিক স্নেহলাভে কদাচ বঞ্চিত হয় না! রায় মহাশয় হেমেন্দ্রের নামে বিরক্ত হইয়া উঠেন; কিন্তু পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আজ তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই! হেমেন্দ্র আমোদ আহ্লাদে চিরকাল কাটাইয়াছে, স্ত্রী-বিয়োগাবধি অচৈতন্যের ন্যায় অকর্ম্মণ্যভাবে গৃহে বসিয়া থাকে, আহার বিহারে তাহার সুখ নাই, সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ! এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহাতে হেমেন্দ্রের আমোদ প্রমোদে আশক্তির সঞ্চার হয়, তাহার সমবয়স্ক ললিত চন্দ্রকে ডাকাইয়া সেই সকলের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রনাথ পিতার ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে মনে মনে বিরক্ত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু কোন কথার উত্থাপন করেন নাই। আজ কাল হেমেন্দ্রের পয়সায় জন্য বিশেষ ভাবিতে হয় না, প্রয়োজনানুসারে পিতার নিকট হইতে সময়ে সময়ে ললিত চন্দ্রের দ্বারা ২০।২৫ টাকা পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার যে কারণ অর্থের প্রয়োজন, সে দিকে যে গোলযোগ বাধিয়াছে! যে টাকা পিতার নিকট হইতে সময়ে সময়ে গ্রহণ করে, তাহা হইতে সামান্য মাত্র ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট টাকা এক্ষণে হেমেন্দ্র সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী মুদ্রার কি মোহিনী শক্তি! লোক টাকার জন্য অমূল্য প্রাণদান ও বিনাশ করিতেছে;

জগতে যত কিছু অসম সাহসিক কার্য্য সাধিত হয়, অধিকাংশ স্থলেই অর্থ—তাহার মূল কারণ। অর্থেই বিষম অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহ সংসারে জীবন ধারণ করিতে হইলে, সামাজিক নিয়মানুসারে চলিতে হইলে, পদে পদে অর্থের প্রয়োজন; আবার অর্থ হইতেই মহানিষ্টের সূত্রপাত হয়! হেমেন্দ্র শোকের ছলনা করিয়া সরল হৃদয় বৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে বারে বারে অর্থ আত্মসাৎ করিয়া, এক্ষণে তাহার অপেক্ষাকৃত সাহস বাড়িয়াছে। রায় মহাশয় পুত্রকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে হেমেন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে বেড়াইতে যায়, অসৎ সঙ্গীদল সহিত কখন বা কলুষিত আমোদে উন্মত্ত হয়। রায় মহাশয় সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও উপেক্ষা করেন। তিনি পুত্রকে সানন্দচিত্তে আহার বিহার করিতে দেখিলেই পরম সুখী!

যে দিবস রাধামতির সহচরী কামিনীর সহিত হেমেন্দ্রের দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং যুবতীকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ স্থির হয়; সেই দিবসাবধি হেমেন্দ্র বাটীতে আসে নাই। ইতি পূর্ব্বেই পিতৃদত্ত অর্থও কথঞ্চিত তাহার হস্তগত হইয়াছে; আপাততঃ সুখে আমোদ প্রমোদ চলিবে, তাহাতে কোন সুযোগে রাধামতিকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে, তাহার বহুকালের বাসনা পূর্ণ হইবে। এক্ষণে সেই সকল উপায়েই হেমেন্দ্র ব্যস্ত রহিয়াছে; পর দিবস

রজনী যোগে সেই কার্য্য সাধিত হইবে! বৃদ্ধা কামিনী রাধামতিকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত যে সকল পরামর্শ দিয়াছে, সেই কথাগুলি হেমেন্দ্রের জপমালা হইয়াছে। বিশ্বস্ত ললিতচন্দ্র হেমেন্দ্রের বাল্য সহচর, তাহার নিকটে হেমেন্দ্রের কোন কথাই অব্যক্ত থাকে না। ভার্য্যার মৃত্যু দিবস হইতে একমাত্র ললিত, হেমেন্দ্রের পরম বন্ধু হইয়াছে। যখন যে কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতে হইবে, ললিতের অভিপ্রায় সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হয়। কামিনী যেদিবস হেমেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করে, তৎকালে ললিত তথায় উপস্থিত ছিল। হেমেন্দ্র রাধামতিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যাবতীয় পরামর্শ ললিত চন্দ্রের সহিত একত্র মিলিয়া করিয়াছে। ললিত এ সকল কার্য্যে বিশেষ পটু, হেমেন্দ্রের আদেশমত শকট সংগ্রহাদি সমুদায় কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিয়াছে। এই সকল কার্য্যে যত কিছু অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, সমুদায়ই হেমেন্দ্র প্রদান করিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হেমেন্দ্র ললিতচন্দ্র সমভিব্যাহারে একখানি শকটারোহণে বঙ্কেশ্বরের বাটীর কিঞ্চিৎ অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে রাধামতিকে লইয়া কামিনী তাহাদিগের সম্মুখে উপনীত হইল। হেমেন্দ্র রাধামতির প্রতি একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া, অধোমুখ হইয়া রহিল। রাত্রিকাল—অন্ধকারে স্পষ্টভাবে কিছুই দৃষ্ট হয় না। সরলা রাধামতি পাপিষ্ঠ হেমেন্দ্রকেই স্বামী জ্ঞান করিয়া তাহার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা

করিল ; এরূপ মিনতি বাক্য শ্রবণ করিয়াও পতি কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, কামিনীর প্রতি রাধামতির দৃষ্টি পতিত হইল। অবিলম্বে বাসনা পূর্ণ হইবে, পতি-প্রেমে যুবতী অনন্ত আনন্দসাগরে নিমগ্না হইয়া, কালক্ষেপ করিবে ইত্যাদি দুইএকটী কথা বলিয়া সহচরী রাধামতিকে শকটারোহণের জন্য আকিঞ্চন করিল। রাধামতি কামিনীর কথায় কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইল এবং প্রথমতঃ গাড়ীতে আরোহণ করিতে অস্বীকার করিল। কামিনীর সহিত রাধামতির এইরূপ গোলযোগ বাধিয়াছে দেখিয়া, ললিতচন্দ্র অপ্রকাশ্য ভাবে শকটের অপর পার্শ্ব দিয়া অবতীর্ণ হইয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। কামিনী হেমেন্দ্রকেই রাধামতির স্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এক্ষণে শকটারোহণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় রাধামতি গাড়ীতে উঠিয়া হেমেন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিল। তৎসঙ্গে কামিনীও শকট মধ্যে প্রবেশ করিল। ইত্যবকাশে ললিতচন্দ্রও শকটের পশ্চাৎভাগে উঠিল। রাধামতি কামিনী সহ শকটে আরোহণ করিবামাত্র অশ্বচালক সতেজে অশ্ব চালাইল ; তীরবেগে ঘোটকদ্বয় ধাবিত হইল। শকটাভ্যন্তরে সকলেই ম্রিয়মাণ ভাবে বসিয়া আছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই ! হেমেন্দ্র কামিনীর সহিত পূর্ব্বে পরামর্শ স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে বৃদ্ধার কথানুসারেই নীরবে অধোমুখে বসিয়া আছে। রাধামতি—সরলা ; দুশ্চারিণী কামিনী যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে কথা যুবতী

কিছুমাত্র জানিত না। এক্ষণে হেমেন্দ্রকে ম্লানভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কামিনীকে পুনঃ পুনঃ স্বামীর কথা গোপনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু পাপিয়সী বৃদ্ধা রাধামতির কথায় কর্ণপাত করিলনা। দ্রুতবেগে শকট চলিয়া যাইতেছে, কামিনী যেন সেই শকটের ঘর্ঘর শব্দে এককালে বধির হইয়াছে। ভীরুস্বভাবা রাধামতি যে বারম্বার তাহাকে আহ্বান করিতেছে, সে সকল কথা তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না; রাধামতির মনে ইহাতে অতিশয় সন্দেহের সঞ্চার হইল। যে স্বামী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, তাহার সুখ সম্পাদনই যে পতির একমাত্র চিন্তা—সেই পতি সমক্ষে যুবতী ভয়াকুলিত চিত্তে কামিনীকে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে; সহচরী তাহার কোন কথার উত্তর দিতেছে না! অথচ তাহার স্বামী সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন, পত্নীর মিনতিবাক্যেও তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে না! রাধামতি এইরূপ বিষাদ-চিন্তায় এককালে অভিভূতা হইয়া পড়িল, নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। গভীর রজনী—পথে জনমানবের সমাগম নাই, কাহাকেও আহ্বান করিয়া যে সন্দেহ ভঞ্জন করিবে, সে উপায়ও নাই! সুতরাং অনিবার্য্য হৃদয়োদ্বেগ ক্রমেই প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হওয়াতে, অবশেষে রাধামতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হেমেন্দ্র এই সময়ে রাধামতিকে সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত না করিলে পরিণামে মহা গোলযোগ বাধিবে আশঙ্কা করিয়া কামিনীর

প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রাধামতি এক্ষণে দুর্দ্দান্ত হেমেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া চমৎকৃতা হইল; যুবতী এতাবৎ কাল হেমেন্দ্রকেই প্রকৃত স্বামী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল! কিন্তু এতক্ষণ কোন কথাবার্ত্তা না কহায় তাহার মনে মনে সন্দেহ হইয়াছিল, পাষণ্ড হেমেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার সে সন্দেহ দূর হইল, এক্ষণে রাধামতি আরো চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ভয়ে ও ক্রোধে যুবতীর সর্ব্বশরীর কম্পান্বিত হইল। কোন সুযোগে সেই দুরাচারের কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই রাধামতির যেন সমস্ত-ভাবনা ঘুচিয়া যায়! কুহকিনী কামিনী তাহাকে এই সময়ে বিবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, কিন্তু রাধামতি সে সকল কথায় কর্ণপাতও না করিয়া শকট হইতে অবতীর্ণ হইবার প্রাণপণে চেষ্টা পাইতে লাগিল। উপস্থিতে কোন উপায়ে যদ্যপি তাহার প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, তাহা হইলেই যুবতী আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে! নৃশংস হেমেন্দ্র রাধামতিকে সবলে ক্রোড়দেশে লইয়া মিষ্টালাপে তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইল, যুবতী কিছুতেই ভুলিল না। যখন বালিকাবস্থায় রাধামতি সুমতির সহিত একত্রে খেলা করিত, সে সময়ে এক দিবস হেমেন্দ্র তাহাকে অন্তরালে পাইয়া ধর্ম্মনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, এক্ষণে সেকথা রমণীর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। বিশেষতঃ হেমেন্দ্রের স্বভাব চরিত্র তাহার সবিশেষ জানা ছিল। একে গৃহস্থের কুলবধূ ও বণিতা, তাহাতে পথিমধ্যে নিশাকালে রাধামতি—একাকিনী অসহায়া! এদিকে

পাপীয়সী কামিনী হেমেন্দ্রের পক্ষই সমর্থন করিতেছে; আবার তাহাদের গোলযোগ বাধিয়াছে বুঝিয়া, ললিত শকটের পশ্চাৎভাগ হইতে সম্মুখে উপনীত হইল এবং হেমেন্দ্রের ইঙ্গিত মাত্রে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে তিন জনে মিলিয়া রাধামতির সর্ব্বনাশ চেষ্টায় সংযত হইল; একাকিনী রমণী রাধামতি প্রাণত্যাগ ব্যতিরেকে আর কি প্রকারে তাহাদিগের কঠোর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে? পাশাবদ্ধ পক্ষী যেরূপ ব্যাধকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ছট্‌ফট করিতে থাকে, অভাগিনী রাধামতি সেইরূপ হেমেন্দ্রকে দেখিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে কোন উপায়ে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। কামিনী পিতার অন্নে বহু কালাবধি প্রতিপালিত হইয়াছে, রাধামতি তাহাকে আত্মীয় স্বজনের ন্যায় বিবেচনা করিত, কখন তাহার কথা অমান্য করিত না; আবশ্যক মতে তাহারই সহিত পরামর্শ করিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম চালাইত। এক্ষণে সেই বিশ্বাসঘাতিনী কামিনী হেমেন্দ্রের সহায়তা করিতেছে দেখিয়া, রাধামতি বিস্মিতা হইল। রাধামতির রোদন, অনুনয় বাক্য কিছুতেই তাহাদের কঠিন হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না; রাধামতি হৃদয়াবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। পাষণ্ড হেমেন্দ্র রাধামতিকে স্পন্দহীনা দেখিয়া পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু নিকটে ললিত ও কামিনী বসিয়া আছে, লোকলজ্জায় যুবক কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইল। অবশেষে পাপাত্মা অসুরসদৃশ বাহুযুগল দ্বারা রাধামতিকে এরূপ দৃঢ়

ভাবে আলিঙ্গন করিল যে, রাধামতির অঙ্গ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা এককালে রহিত হইল।

এক্ষণে আর রাধামতিব বিলাপধ্বনি নাই! যুবতী নীরবে মৃতপ্রায় একপার্শ্বে পড়িয়া আছে; পার্শ্বে কামিনী তাহাকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রজনী শেষ হইয়া আসিল। রাধামতি এককালে নিস্পন্দ, তাহার আর পরিত্রাণার্থ রোদন ধ্বনি কিছুমাত্র শ্রুতিগোচর হ তেছে না! শকটচালক হুগলির গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক্ রোড দিয়া যথাক্রমে আসিতেছিল উষার সমাগমেই শালিখায় উপনীত হইল। ললিতচন্দ্র হেমেন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া খেয়াঘাটে যাইয়া এক খানি নৌকা ভাড়া করিল। অবশেষে রাধামতিকে লইয়া তাহারা তিনজনে প্রেতলীলা-ক্ষেত্র কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপকার্য্যের প্রতিফল ইহজীবনেই কেহ কেহ ভোগ করিয়া থাকে। আপাততঃ সুখকর ভাবিয়া ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় অভিভূত হইলে,পরিণামে অবশ্যই তাহার সমু-

চিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আজীবন ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার কার্য্যে সংযত থাকেন, দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার কোন বিষয়ে কখন সামান্য কষ্ট হইলেও পরজন্মে অনন্তকাল সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে পারিবেন। আপাততঃ যে কার্য্যে অনুরক্ত হইলে আমাদিগের বাহ্যিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা,মনুষ্য তাহাতে সহজে হস্তক্ষেপ করিতে কাচ স্বী কৃত হয় না। সাধারণতঃ অনেকেই অসার বিলাসভোগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া কালক্ষেপ করে, কিন্তু সংসারে সকলের দিন সমভাবে যায় না। আজি যেভাবে চলিতেছে, কালও যে সেই ভাবে কাটিবে—সেকথা সর্ব্বজ্ঞ মধুসূদন ব্যতিরেকে আর কে বলিতে পারে? বক্কেশ্বর সমস্ত পৈত্রিক ধন সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়াও পতিপ্রাণা কমলার কারণ এক দিনের জন্যও সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। লোকের অবনতির সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইলে,দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে! সামান্য মাসিক বৃত্তির উপরে নির্ভর করিয়া একমাত্র কন্যা রাধামতিকে লইয়া তিনি এক্ষণে সংসারী। স্ত্রীবিয়োগাবধি তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। আর তিনি বাহ্যিক অসার আমোদ প্রমোদে এক দণ্ডের নিমিত্তও যোগ দেন না। রাধামতি পিতার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দেয়, কামিনী গৃহিণীর মত সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখে। বক্কেশ্বর জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পরমেশ্বরের আরাধনায় মনঃসংযোগ করিয়া যাপন করিবেন—সাংসারিক ভোগবিলাসাদিতে আর তাঁহার

স্পৃহা নাই! এই ভাবে দিনাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সতীলক্ষ্মী কমলা যে তাঁহার গর্হিত আচরণের কারণ ইহসংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন—সে মহাপাতকের শাস্তি তিনি ব্যতিরেকে আর কে সহ্য করিবে?

বঙ্কেশ্বর বহির্ব্বাটীতে বন্ধুসহ দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত রহিয়াছেন, এদিকে রাধামতিকে লইয়া কামিনী যে বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছে, সে সংবাদ তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। যথাসময়ে অন্তঃপুরে যাইয়া কামিনী বা রাধামতি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মিত্রজা মহাশয় রন্ধনশালা, শয়নাগার প্রভৃতি যাবতীয় স্থানে অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগের সন্ধান না পাইয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে রায় মহাশয়ের বাটীতে তাহাদের সন্ধানে গমন করিলেন। তৎকালে রায় মহাশয়ের বাটীর সকলেই নিদ্রিত, বহির্দ্বারে করাঘাত ও রায় মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করায়, জনৈক প্রহরীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল। অনন্তর রায় মহাশয় জাগরিত হইলে, বঙ্কেশ্বর প্রমুখাৎ রাধামতি ও কামিনীর গৃহ হইতে প্রস্থান ঘটনা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। নিশাযোগে সহচরী সহ রাধামতি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে, একথা শুনিয়া তাঁহার মনে বিষম সন্দেহ হইল। দ্বারকনাথ তদ্দণ্ডে ভৃত্য গোপালকে ডাকাইয়া হেমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, যেহেতু হেমেন্দ্র পূর্ব্বদিবস হইতেই বাটী হইতে বহির্গত

হইয়াছে, এখনও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনার পুত্রের অসৎচরিত্রের বিষয় তিনি সম্যক জ্ঞাত ছিলেন; অধিকন্তু হেমেন্দ্রের বাল্যকালাবধি রাধামতির প্রতি একান্ত আসক্তি, হয়ত সেইবা কোন প্রলোভনে মুগ্ধকরিয়া রাধামতিকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে! গোপাল হেমেন্দ্রের গৃহে যাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না; অনন্তর তাহার তত্ত্ব লইবার জন্য ললিতচন্দ্রেরও অনুসন্ধান করা হইল। অবশেষে রায় মহাশয় তাহাদের উভয়ের কোন সন্ধান না পাইয়া, আরো অধিক চিন্তিত হইলেন; তৎক্ষণাৎ স্থানে স্থানে লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু কোথাও কাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ইতিপূর্ব্বে একদিবস বক্কেশ্বর কামিনীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, রাধামতি শ্বশুরালয়ে যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছে। বোধ হয়, কামিনী তাহাকে শ্বশ্রুগৃহে লইয়া গিয়াছে; এইরূপ নানাভাবের কথা উত্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু রায় মহাশয় চন্দ্রনাথবাবুর নিকটে লোক পাঠাইতে নিষেধ করিলেন; যেহেতু রাধামতি যদি সেস্থানে না যাইয়া থাকে, তাহা হইলে পরিণামে শ্বশুরালয়ে তাহার মুখ দেখান ভার হইবে, সমাজেও বক্কেশ্বরের অখ্যাতি ঘোষিত হইবে। সুতরাং তাঁহার কথানুসারে রাধামতির শ্বশুরালয়ে কোন সংবাদ দেওয়া হইল না।

হিন্দুগৃহে নারীর চরিত্র—স্বচ্ছ দর্পণ সদৃশ। বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শে এককালে চিরকালের জন্য তাহার নিন্দা গৃহে গৃহে উপকথার ন্যায় কথিত হইতে থাকে।

তৎপরে রমণী শত সহস্র সাধুকার্য্য সম্পাদন করিলেও সে অপবাদ তাহার বিদূরীত হয় না, সমাজের সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। হিন্দু-ললনা পথের বাহির হওয়া দূরে থাকুক, পর পুরুষের মুখ দেখিলেই তাহাকে লোকে কলঙ্কিনী বলে। রাধামতি বিশুদ্ধ চিত্তা হইলেও যখন নিশিযোগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছে, অবশ্যই তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধির সূত্রপাত হইয়াছে, কোন লোকের কুহকে পতিত হইয়া তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নতুবা কি কারণ রজনীযোগে সহচরী সহ বাটী হইতে বহির্গত হইল? এ কথা লোকে জানিতে পারিলে, বক্রেশ্বরকে এক ঘরে হইতে হইবে, সকলেই তাহাকে সমাজচ্যুত করিবে, লোকের নিকট তাহার মুখ দেখান ভার হইবে। আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার বাটীতে জলগ্রহণ করিবে না। অতএব এ সকল কথা অপ্রকাশ রাখিয়া গোপনে রাধামতির অনুসন্ধান হইতে লাগিল। রায় মহাশয় বক্রেশ্বরকে সহোদরের মত ভাল বাসিতেন, উপস্থিত বিপদে মনে মনে অনুতাপিত হইলেন।

বক্রেশ্বরের বাটীতে এক্ষণে অপর জন প্রাণীও নাই, রায় মহাশয় তাঁহাকে আপনার বাটীতেই আহারাদি করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কেবল মাত্র নিশা কালে বক্রেশ্বর গোপালকে লইয়া আপনার বাটীতে যাইয়া শয়ন করেন, আর সমস্ত দিবস মিত্রজা মহাশয়ের বাটী বন্ধ থাকে। রজনীতে রাধামতি সংক্রান্ত যে গোলযোগ উঠিয়া ছিল, পর দিবস প্রভাতে রায় মহাশয়

বক্কেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে লোকে রাধামতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইবে যে চন্দ্রনাথ বাবুর বাটীতে একটী বিবাহ উপস্থিত হওয়াতে সে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে এবং কামিনী তাহার সঙ্গে যাইয়াছে। কিন্তু লোকের নিকট প্রকৃত ঘটনা লুপ্ত রাখিয়াও, রায় মহাশয় ও বক্কেশ্বরের মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিল না, তাঁহারা দিনে দিনে ভাবনা চিন্তায় আকুলিত হইতে লাগিলেন।

যে দিবস এই ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার পূর্ব্ব-দিবস হইতেই হেমেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত দিবস হইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ললিতচন্দ্রও নিরুদ্দেশ। হেমেন্দ্র ও ললিতের অনুপস্থিতির কারণ রায় মহাশয় বিশেষ চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তিনি ভাবিয়া আর কি করিবেন? কুলাঙ্গার পুত্র হইতেই তাঁহার সাংসারিক ভোগ বিলাসে কোন অভাব না থাকিলেও তিনি এক দিনের নিমিত্ত সুখী নহেন। এক দিবস রায় মহাশয় সন্ধ্যাকালে আহারাদি করিয়া অন্তঃপুরে শয়নাগারে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ছোট বধূর গহনা পত্র যে বাক্সের মধ্যে রক্ষিত ছিল, তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। রায় মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই কনিষ্ঠপুত্রকে এই গোলযোগের মূল বলিয়া মনে মনে অনুমান করিয়া ছিলেন; এক্ষণে সমস্ত অলঙ্কার সমেত বাক্সটি হারাইয়াছে

শুনিয়া, তাঁহার মনে সেই সন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি হইল। কনিষ্ঠাবধূর জীবদ্দশায় এক ছড়া চিক হারাইয়াছিল এবং হেমেন্দ্র তাহা অপহরণ করে, একথা রায় মহাশয় পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে হেমেন্দ্র যে এই অলঙ্কারাদি পরিপূর্ণ বাক্‌সটি আত্মসাৎ করিয়া বিদায় হইয়াছে, একথা তাঁহার স্থির অনুমান হইল। তিনি এসময়ে হেমেন্দ্রের প্রতি এরূপ কুপিত হইয়াছিলেন যে, তাহাকে চৌর্য্যাপরাধে রাজদ্বারে শাস্তি প্রদানেও উদ্যত। অলঙ্কার লইয়া পুত্র গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছে, তিনি সেই পুত্রের চরিত্র সংশোধনার্থ এসংবাদ পুলিশে জানাইতে উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠিত হইলে হেমেন্দ্র যেখানেই থাকুক না কেন, পুলিশ প্রহরীর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবে না, তাহাতে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ যথেচ্ছাভাবে তাহার প্রতি পীড়ন করিবে, সে সকল যন্ত্রণা মাতার প্রাণে সহ্য হইবে না; হুগলীতে রায় মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি—মান সম্ভ্রমের কারণ ছোট বড় সকলেই রায় মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। চৌর্য্যাপরাধে হেমেন্দ্র পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, এসংবাদে তাঁহার সে যশোরবি কলঙ্ক-মেঘে আচ্ছন্ন হইবে। তিনি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীর কথায় নিরস্ত হইলেন। কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অলঙ্কার গিয়াছে, তজ্জন্য তিনি তাদৃশ দুঃখিত নহেন, কিন্তু হেমেন্দ্র যে কয়েক দিবস বাটী ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অদ্যাবধি কোন সমাচার পাওয়া গেল না

অধিকন্ত প্রিয় সুহৃদ্ বক্কেশ্বরের একমাত্র কন্যা রাধামতিরও নিরুদ্দেশ,এতাবৎকাল কাহারও কোন সংবাদ পাইলেন না। তিনি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে সদাই অসুখী, কাজকর্ম্মে তাদৃশ মনঃসংযোগ করিতে পারেননা। অবকাশ মতে মিত্রজা মহাশয়ের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয়, কন্যা বিরহে বক্কেশ্বর এক্ষণে প্রায় উন্মাদ অবস্থাগ্রস্থ হইয়াছে। একমাত্র রায় মহাশয়ই তাঁহার শান্তিদাতা! সময়ে সময়ে বক্কেশ্বর তাঁহারই নিকটে মনের যত কিছু আক্ষেপ প্রকাশ করেন। অভাগা বক্কেশ্বর বাল্যকালাবধি আমোদ প্রমোদে যাপন করিয়াছেন,তাঁহার নিজ দোষেই বিষয় আশয়ে বঞ্চিত হইয়াছেন, পতিব্রতা কামিনী তাঁহা-রই জন্য জীবনত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে মিত্রজা মহাশয় কন্যাকে লইয়া সংসার আশ্রমে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হতভাগ্যের ভাগ্যদোষে রাধামতিও স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাধামতির বিরহজনিত শোকাপেক্ষা লোকাপবাদ বক্কেশ্বরের গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে—একথা জন সাধারণে বিদিত হইলে, তাঁহার অপযশের আর পরি-সীমা থাকিবে না; শিশু বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিন্দা করিবে, অন্তিমকালে তাঁহার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে—তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এক্ষণে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন—রায় মহাশয়! বক্কেশ্বর কাজ কর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র কন্যার চিন্তায় দিবানিশি আকুলিত; কি করিবেন, চরমে তাঁহার কি গতি

হইবে, এইসকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয় সাধ্যমত তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন, কিন্তু বক্কেশ্বরের অস্থির হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আহার বিহার, লোকাচার কিছুতেই বক্কেশ্বরের স্পৃহা নাই! জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি এক্ষণে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে হেমেন্দ্রের শোকে তাহার জননীও আকুলিতা; আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের কারণ আহোরাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয়ের একদিকে পুত্র-বিরহ-কাতরা সহধর্ম্মিণী; অন্যপক্ষে নয়ন-পুত্তলি তনয়ার শোকে প্রিয়বন্ধু বক্কেশ্বরের মনোবিকার! কি উপায়ে যে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিবেন; কোথায় তাহাদিগের সন্ধান পাইবেন, এতাবৎকাল অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না! তিনিও তাঁহাদের মত শোকগ্রস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারে লোক যদি ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিত; মনে যাহা উদয় হইল, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলেই যদ্যপি তাহা সুসিদ্ধ হইত, বাসনার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্রিয়ার সহযোগিতা থাকিত; তাহা হইলে 'ঐশ্বরিক ইচ্ছা' কথাটি অবশ্যই সংসার হইতে লোপ পাইত। আমরা যাহা মনে করি, তাহা পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সময়ে সময়ে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি। ফণীন্দ্রনাথ সাংসারিক বিষয়-চক্রে জড়িত হইয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিবার আশয়ে শান্তি অন্বেষণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন যে এত দিন তাঁহাকে লালন পালন করিলেন; একমাত্র তাঁহাদিগের কৃপাতেই তাঁহার যাহা কিছু বিদ্যালাভ হইয়াছে; কিন্তু পরিশেষে তিনি পিতা মাতার চক্ষু গোচর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন! জনৈক অবলা কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার যাবজ্জীবনের ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছে, সংসারের কাজ কর্ম্ম, লোকাচার সমুদায়ই ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইবে, পিতৃদেবের মত তিনিও এক দিন সমাজে গণ্যমান্য হইবেন। পুত্র পৌত্রাদি লইয়া ঘর সংসার করিবেন, বার্দ্ধক্যাবস্থায় পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিয়া পুত্রধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন; জগতের এই যাবতীয় সম্বন্ধ ছেদন করিয়া তিনি স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং—

কেবলমাত্র আপনার ভার গ্রহণে অভিলাষী; সাংসারিক বাদ-বিসম্বাদ পূর্ণ ঘটনাবলিতে আশক্ত থাকা এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দয়াময় জগদীশ্বর ধরাধাম সুখদুঃখ পূর্ণ করিয়া স্বজন করিয়াছেন। সংসারে বাস করিতে হইলে, সময়ে সময়ে সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতে হয়, আপনার ইচ্ছানুযায়িক সকল কার্য্য সকল সময়ে সাধিত হয় না। ফণীন্দ্র—সরল ও উদার-চিত্ত, সাংসারিক গোলযোগ ভালবাসেন না; জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরারাধনায় ক্ষেপণ করিবেন, অথবা তাহাতে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া মনোবিকার জন্মের মত দূর করিবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি সাংসারিক মায়া মমতার উচ্ছেদ করিয়াছেন। কিন্তু এ কার্য্যে ঈশ্বর সহায় না থাকিলে, তাঁহার এই গুরুতর ভার বহন করা অতীব সুকঠিন! যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছামত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা কদাচ সুসিদ্ধ হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত না সেই পতিত-পাবন অগতির গতি দয়াময় ভগবান তাহার প্রতি সদয় হইবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদনে তাহার বৃথা আকিঞ্চন! ফণীন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শোক তাপ জর্জ্জরিত হৃদয়ে আত্ম হত্যাই সার যুক্তি ভাবিলেন; কিন্তু অন্তরস্থিত হিতাহিত বিবেচনা শক্তি সেই মহা পাপের হন্তারক হইল। দুর্লভ জীবন—সামান্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া উচ্ছেদ করিবেন, একমনা তাঁহার যুক্তি-

সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। কিন্তু প্রবল রিপু—ক্রোধ এখনও তাঁহার দেহে পূর্ণ-মূর্ত্তিতে বিরাজমান। গৃহে ফিরিয়া যাইলে হয়ত পিতা মাতা পূর্ব্বমত সস্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন না; ভার্য্যা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, একমাত্র পতির উপরেই রমণীর সুখ দুঃখের ভার যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নির্ভর করিতেছে, পতিই হিন্দুললনার আরাধ্য দেবতা, সংসারের যাবতীয় সুখভোগ পতির অবর্ত্তমানেই ঘুচিয়া যায়; এ সকল কথা সে কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে, পতিভক্তি শিক্ষা করে নাই। ফণীন্দ্র সাংসারিক ঘটনাবলি সম্যক জানিয়াও এক্ষণে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছেন; আত্মহত্যায় নিরস্ত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রাই মনস্ত করিলেন। কিন্তু বিদেশে যাইতে হইলেই অর্থের প্রয়োজন; তাঁহার হস্তে নগদ এক পয়সাও নাই, অথচ মনে মনে স্থির করিয়াছেন বিদেশে যাইবেন; অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজ হস্ত পরিহিত একশত টাকা মূল্যের একগাছা সুবর্ণ নির্ম্মিত অনন্ত জনৈক পোদ্দারের দোকানে ৫০৲ টাকায় বন্ধক দিয়া বিদেশ ভ্রমোণোপযোগী পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিলেন। ফণীন্দ্রের বাল্যকালাবধি বিলাসভোগের প্রতি দৃষ্টি ছিল না; প্রকৃত আবশ্যকীয় অভাব পূর্ণ হইলেই তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইতেন। এক্ষণে ১০।১৫ টাকার কাপড় জুতা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তিনি চন্দননগর ষ্টেশন হইতে মুঙ্গের যাইবার একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া রজনীযোগেই রেল গাড়ীতে যাত্রা

করিলেন। পর দিবস প্রাতেঃ আট ঘটিকার সময় গাড়ী জামালপুরে পৌঁছিল; তথায় ফণীন্দ্রনাথের জনৈক সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইংরাজী বিদ্যালয়ে ফণীন্দ্রনাথ তাহার সহিত একত্রে পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন, বহুকালের পর উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হইলে, দুইজনেই কথাবার্ত্তায় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর শুভ সম্বাদ জিজ্ঞাসিত হইলে, ফণীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরের গাড়ীতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে বাল্যবন্ধু তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। ফণীন্দ্রনাথ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত মুঙ্গের যাইতে ছিলেন না, বন্ধুর একান্ত আকিঞ্চনে অবশেষে তাঁহার বাটীতেই গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

যে যুবক ফণীন্দ্রনাথকে তাহার বাসা বাটীতে লইয়া যাইল, তাহার নাম হীরালাল দে; নিবাস কলিকাতা, ঢুলিপাড়া। তিনি ফণীন্দ্রের সহিত একত্রে পাঠাধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু পিতার সঙ্গতি না থাকায় অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের অনুগ্রহে জামালপুরে অডিট আফিসে ১৫৲ টাকা মাসিক বেতনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, মাসিক ২৭৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। অনন্তর যথা সময়ে উভয়ে স্নানাহার করিয়া, হীরালাল ফণীন্দ্র সহ কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইতি মধ্যে, ফণীন্দ্রনাথ চাকরির

অনুসন্ধানে যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মুঙ্গের যাইবার অন্য কোন প্রয়োজন নাই, এ সকল কথা হীরালাল জানিতে পারিয়াছিলেন। তজ্জন্যই বন্ধুকে লইয়া তিনি কার্য্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। হীরালাল বসিয়া কার্য্য করিতেছেন, ফণীন্দ্রনাথ নম্র ভাবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে সেই আফিসের প্রধান বাবু হীরালালকে ডাকাইয়া বলিলেন "কার্য্যের যেরূপ বাহুল্য হইয়াছে, তাহাতে আমি সাহেবের অনুমতি লইয়া একজন ১৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিয়াছি; তোমার সন্ধানে যদি কেহ থাকে, তবে তাহাকে লইয়া আসিও।" হীরালাল বন্ধুর নিকটে আসিয়া সে কথা ব্যক্ত করিলে, ফণীন্দ্রনাথ সেই পদের প্রার্থী হইয়া একখানি দরখাস্ত করিলেন। ফণীন্দ্র লেখা পড়ায় বিশেষ পারদর্শী, ইংরাজী ভালরূপ লিখিতে জানিতেন; তাঁহার হস্তাক্ষর ও বাক্যবিন্যাস প্রণালী দেখিয়া প্রধান বাবু বিশেষ সন্তোষ সহকারে অবিলম্বে সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে সেই দিবসেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফিস বন্ধ হইল; ফণীন্দ্র, বন্ধুর সহিত তাঁহার বাসাতেই গমন করিলেন, এইরূপে বন্ধুর সহিত একত্র থাকিয়া ফণীন্দ্র অডিট আফিসের কর্ম্মচারী হইলেন।

ফণীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, একমাত্র সহধর্ম্মিণীর জন্য তিনি সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন, এ সকল কথা বন্ধুর নিকটেও

প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু শ্বশুর প্রদত্ত সুবর্ণ অনন্তগাছা অর্থের প্রয়োজন বশতঃ হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন। সমুদায় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার হস্তে মোট ২৫৲ টাকা মজুত ছিল। এক মাস কার্য্য করিয়াই তাঁহার আর ১৫৲ উপার্জ্জন হইল; তিনি বন্ধুর নিকটে ২০৲ কর্জ্জ লইয়া আট টাকা বাসা খরচ হিসাবে তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। হীরালাল প্রথমতঃ টাকা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে ৮৲ গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে ফণীন্দ্র সেই পোদ্দারের লিখিত রশীদ অনুসারে তাহার আসল পঞ্চাশ, সুদ ও তাগা পাঠাইবার খরচা সর্ব্ব সমেত হিসাব করিয়া একখানি রেজেষ্টারি পত্র মধ্যে—পঞ্চাশ টাকার একখানি গভর্ণমেণ্ট করেন্সি নোট; পোষ্ট-ষ্ট্যাম্প ২৸৴০ একুনে মোট ৫২৸৴০ ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেন; যথাসময়ে অনন্তগাছা তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি সংসারের যাবতীয় সুখে বিসর্জ্জন দিয়াও প্রিয়তমার নিদর্শন স্বরূপ শ্বশুরপ্রদত্ত সুবর্ণ অনন্তগাছা নিজ হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। এইভাবে বন্ধুর সহিত একত্র থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ফণীন্দ্রের হস্তে ৪।৫ শতটাকা সংগ্রহ হইল।

এক দিবস বন্ধুদ্বয় উভয়ে বসিয়া রজনীযোগে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে হীরালাল ফণীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা ফণীন্দ্র! তোমার বাড়ী হইতে পত্রাদি আসে না, তোমাকেও কোন পত্রাদি লিখিতে দেখি না। ইহার কারণ কি?"

ফণীন্দ্র। “না, সময়ে সময়ে পত্র আসে; আমিও উত্তর পাঠাইয়া থাকি।”

মনোগত ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া ফণীন্দ্র যদিও এইরূপ উত্তর করিলেন বটে, কিন্তু সুচতুর হীরালালের মনে ইহাতে সন্দেহ হইল! অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, নতুবা বন্ধু এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? তিনি মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্ধু সমীপে আপাততঃ সে কথার আর উত্থাপন করিলেন না।

ফণীন্দ্রনাথের সৌজন্য ও সদাচারে জামালপুরস্থ অনেক লোকের সহিত তাঁহার সদ্ভাব হইল; সকলেই তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। আর এক দিন হীরালাল ফণীন্দ্রকে লইয়া পরিহাসাদি করিতে করিতে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন; সে কথায়ও ফণীন্দ্র বিশেষ সন্তোষজনক কোন উত্তর প্রদান করিলেন না; একবার বলিলেন—“হাঁ হইয়াছিল, কিন্তু আমার বিবাহের দুই চারি মাস পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।” পুনরায় বলিলেন “না, আমি বিবাহ করি নাই, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিব বলিয়াই বিদেশে আসিয়াছি। বৃথা দারপরিগ্রহ করিয়া সাংসারিক ভাবনায় শরীর ও মনের অনিষ্ট বৃদ্ধি করা উচিত নহে।”

ফণীন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া অফিসের সাহেব দিনে দিনে তাঁহার উন্নতি করিতে লাগিলেন। ফণীন্দ্র জামালপুরে একাদিক্রমে দশ বার বৎসর কাল যাপন করিলেন।

এক্ষণে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় দুই শত টাকা। কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিলাসভোগ বা আমোদ প্রমোদে অর্থ ব্যয়ে তিনি সমভাবেই ঘৃণা করিতেন। সময়ে সময়ে গোপনে দীন দুঃখীগণের হস্তে দুই দশ টাকা দান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। এতদ্ভিন্ন বন্ধু বান্ধব তাঁহার নিকট খাইবার জন্যে অনুরোধ করিলে, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে দুই দশ টাকা ব্যয় হইত। এই সকল ও নিজের নিত্য-নিয়মিত ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট টাকা এই দশ বৎসরকাল যথাক্রমে সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে প্রায় আট সহস্র মুদ্রা তাঁহার সংস্থান হইয়াছে।

এতাবংকাল পিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়া ফণীন্দ্র মনে মনেই অনুতাপিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একদিনের নিমিত্তও তাঁহাদিগের নিকটে পত্রাদি প্রেরণ করেন নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্ত টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবে এবং জনক জননীর বহু কালাবধি কোন সমাচার পান নাই। অজ্ঞাতসারে যে তাঁহাদিগকে, শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন সে কার্য্যও তাঁহার অতীব গর্হিত হইয়াছে; এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র ও তন্মধ্যে সহস্রমুদ্রার একখানি গভর্ণমেণ্ট নোট ইন্‌সিওর ও রেজেষ্টারি করিয়া পিতার শিরোণামায় পাঠাইলেন। কিন্তু ফণীন্দ্রের পিতা সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া ইতিপূর্ব্বে পবিত্র বারাণসীধামে যাত্রা করিয়াছেন;

সুতরং পত্রখানি সুদীর্ঘকাল বিলম্বে তাঁহরই নিকট ফিরিয়া আসিল।

—০ঃ০—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাধামতিকে লইয়া হেমেন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে। ললিত ও কামিনী হেমেন্দ্রের সহিত একত্র থাকিয়া তাহাব কুকার্য্যের সহায়তা করিতেছে। মস্‌জীদ্‌-বাড়ী ষ্ট্রীটে মাসিক ষোল টাকা হিসাবে ভাড়া ধার্য্য করিয়া একখানি বাটী ভাড়া লইয়া, তথায হেমেন্দ্র অন্যান্য সকলেব সহিত একত্রে বাস করিতেছে। জনৈক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ হিন্দুস্থানী দ্বাররক্ষকেব কার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা ব্যতীত অন্য কাহারও সেই বাটীতে প্রবেশ করিবাব অধিকার নাই। আবশ্যক মতে বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী ললিতচন্দ্র আনয়ন করে; কামিনীর প্রতি গৃহস্থালীর সমুদায় ভার অর্পিত হইয়াছে। হেমেন্দ্র আসিবার সময় বাটী হইতে স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি আনিয়া ছিল। রাধামতির মনস্তুষ্টির কারণ বহুমূল্য দুই তিনখানি বস্ত্র ও ভাল ভাল কয়েকখানি অলস্কার রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা করিয়াছে। সকলেই মনের আনন্দে দিন যাপন করিতেছে, কিন্তু অভাগিনী রাধামতির হৃদয়ে সুখের লেশ মাত্র নাই। যুবতী কলিকাতার কথা পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছিল,

কখনও এখানে আসেনাই। জলের কল, গ্যাসের আলোক ইত্যাদি মহানগরীর শোভা সৌন্দর্য্য দেখিবার তাহার একান্ত কামনা, কিন্তু নারীজাতি—ইচ্ছা করিলেই মনঃ সাধ পূর্ণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদিও মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বন্দিনীর অপেক্ষাও তাহার হৃদয় আকুলিত! কিরূপে সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে, নৃশংস হেমেন্দ্রের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, অনুক্ষণ সেই চিন্তাতেই রাধামতি চিন্তিতা! হেমেন্দ্র ভাবিয়া ছিল, রাধামতিকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেই উপায়ান্তর হইয়া যুবতী তাহার পত্নীর মত গৃহকার্য্যে রত হইবে, রন্ধন কার্য্যের নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র লোক রাখিতে হইবে না; কিন্তু এক্ষণে তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত বিকৃত ভাবাপন্ন হওয়াতে জনৈক পাচককে নিযুক্ত করিতে হইল। রাধামতির সতীত্ব নাশই দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য—পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই হেমেন্দ্র এই বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। কিন্তু সে আশা সফল হইতে বিলম্ব দেখিয়া পাপাত্মার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে প্রলয় জ্ঞান করিতে লাগিল। রজনীযোগে যে গৃহে রাধামতি শয়ন করে, হেমেন্দ্র প্রচ্ছন্নভাবে এক দিবস তথায় সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই লুক্কায়িত থাকিল। সরলা রাধামতি প্রায় অনশনেই দিনাতিপাত করিত। নিদ্রা—জীবের বিরাম দায়িনী, শোক তাপ যত কিছু ভাবনা চিন্তা শূন্য হইয়া লোক নিদ্রাক্রোড়ে শান্তিলাভ করে। রাজা প্রজা, দীন

দুঃখী, নিদ্রায় নিমগ্ন হইলে, সাংসারিক কোন অভাবই তাহাদিগের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না। রাধামতির জাগরিত কাল মনস্তাপেই কাটিয়া যায়। নিদ্রাদেবীর পাত্রাপাত্র ভেদাভেদ নাই; রাধামতি অভাগিনী—সংসারের সমুদয় সুখে বঞ্চিতা বলিয়া, নিদ্রাদেবীর শান্তিময়ী ক্রোড়ে শয়ন করিবার অধিকার হইতে বিচ্যুতা নহে। শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নিদ্রাদেবীর অনুরাগ বিস্তারিত হইয়া থাকে। রাধামতি শয্যায় শয়ন করিবার অনতিবিলম্বেই নিদ্রিতা হইল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত থাকিলেও তাহার অপরূপ কান্তি বিকাশ পাইতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্র সম সুবিমল বদন-মণ্ডল শোকতাপে মলিন হইলেও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাধামতি অচেতনে নিদ্রা যাইতেছে, শয়নগৃহের দ্বার অর্গল বদ্ধ; নিরাপদে শান্তিলাভ করিতেছে; কিন্তু এদিকে যে পাশবপ্রকৃতি, কামলোলুপ হেমেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাধামতির ধর্ম্মনাশাভিলাষে সময়ের প্রতীক্ষায় গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে, সে ঘটনার কিছুমাত্র যুবতী অবগত নহে। হেমেন্দ্র রাধামতিকে গাঢ়নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া ধীরে ধীরে পদসঞ্চালন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইল এবং বহুক্ষণ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও তাহার মনস্তুষ্টি হইল না। কিঞ্চিৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাধামতির পার্শ্বে শয়ন করিল। অবলা যুবতী তাহার ধর্ম্মনাশ আশয়ে পার্শ্বদেশে যে পাপমতি হেমেন্দ্র শয়ন করিয়াছে,

তাহা জানিতে পারে নাই, সু-নিদ্রায় শান্তিলাভ করিতেছে। হেমেন্দ্র এই অবকাশে তাহার বক্ষোপরি উঠিয়া মদনানল পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল, পাষণ্ড হেমেন্দ্রের দৃঢ়ালিঙ্গনে রাধামতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অভাগিনী একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল; কিন্তু যুবতী এক্ষণে শত্রুপুরীতে বাস করিতেছে, গৃহস্থিত সকলেই তাহার অনিষ্ট সাধনোদ্দেশেই নিযুক্ত, একাকিনী রমণী আর কি করিবে? হেমেন্দ্র পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া রাধামতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। যুবতীর নয়নাসারে সর্ব্বশরীর সিক্ত হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে আর তাহার প্রতিকারের উপায় নাই। হিন্দু রমণীর সতীত্বই পরম রত্ন! দুর্বৃত্ত হেমেন্দ্রের হস্তগত হইয়া রাধামতি এত দিনের পরে সেই মহাধনে বঞ্চিতা হইল। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে এই ভাবেই দুই চারি দিবস গত হইল।

লোকের মন একভাবে চিরকাল থাকে না। এ দিকে রাধামতি যে পুনরায় পিতা বা শ্বশুরালয়ে গমন করিবে, তাহার সে আশালতা চিরতরে নির্ম্মূলিতা হইয়াছে; দুরাত্মা হেমেন্দ্র সে সুখের হন্তারক হইয়াছে। অথচ এ পাপপুরীতে এখন আর বিষণ্ণ ভাবে দিন যাপনের প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, দিনে দিনে রাধামতি হেমেন্দ্রকেই পতি ভাবে গ্রহণ করিল। সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল। এতদিনে হেমেন্দ্রের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল।

লোক পরম্পরায় হেমেন্দ্রের পিতা এই সমস্ত ঘটনার সবিশেষ সংবাদ পাইয়া স্বয়ং কলিকাতায় আগমন করিয়া,

পুত্রের ঈদৃশ প্রকৃতির জন্য যৎপরোনাস্তি ভৎ´সনা করি-লেন। পিতার তাড়নায় হেমেন্দ্র রাধামতিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে যাত্রা করিল। ললিতচন্দ্র, রায় মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া যে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ছিল, তাহার, আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অভাগিনী রাধামতি এক্ষণে পথের কাঙ্গালিনী। কামিনী এখনও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। রায় মহাশয় পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন কালে রাধামতিকে লইয়া যাইবেন মনে করিয়াছি-লেন; কিন্তু বিষম সমাজ ভয়ে তদ্বিষয়ে সঙ্কুচিত হইলেন। গহনা পত্র যত কিছু হেমেন্দ্রের দ্রব্য সামগ্রী সমুদয়ই রাধা-মতির হইল। এক্ষণে দুইটী স্ত্রীলোকে সেই বাটীতে বাস করিতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বেই দ্বারবানকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছিল। এক্ষণে কামিনী বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আসে ও রাধামতি রন্ধনাদি সাংসারিক কাজকর্ম্ম করে। রাধামতির জীবনে ভীষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। লোক সমাজে তাহার মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল, স্নেহময় পিতা আর তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবেন না, শ্বশুর শ্বাশুড়ী এ জীবনে আর তাহার কোন সংবাদ লইবেন না, পতি বিরাগী হইয়া দেশত্যাগী হইয়া-ছেন, ঈশ্বরের কৃপায় তিনি পুনরায় কখনও গৃহে আসিলে আর তাহাকে পত্নী ভাবিয়া যত্ন করিবেন না। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার প্রতি দোষারোপ ও হতাদরকরিবে। অভাগিনী এক্ষণে কুলকলঙ্কিনী! লোকে তাহার কথা লইয়া কতউপহাস করিবে, যুবতী অনিচ্ছা সত্বেও রমণীর সর্ব্বস্ব-

ধন সতীত্ব রত্নে বঞ্চিতা হইয়াছে, পাপাত্মা হেমেন্দ্র তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এক্ষণে একমাত্র মৃত্যুই অভাগিনীর পক্ষে শ্রেয়ঃ; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে জগতে পাপের সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পাইত না। রাধামতির আহার নিদ্রা নাই, চরমে তাহার কি হইবে, বৃদ্ধ পিতার দশাইবা কি হইল? লোকে তাঁহার কতই অপযশ ঘোষণা করিতেছে! এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার দেহ অতি অল্প দিনের মধ্যেই অস্থি চর্ম্ম সার হইল। ভাবনা চিন্তায় রাধামতি রুগ্না হইল, কোন ক্রমে দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইলেই, তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা ঘুচিয়া যায়। এই পাপময় সংসারে তাহার জীবন ধারণে আর মুহূর্ত্তেকও বাসনা নাই। কামিনী এ সময়েও রাধামতিকে কুপথগামিনী হইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে। রাধামতির পীড়া দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া, সেই পাপীয়সী জনৈক চিকিৎসককে দেখাইয়া,যুবতীকে উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করাইল। রাধামতি এক্ষণে কি করিবে—পীড়াগ্রস্থা হইয়াও তাহার শরীর ভঙ্গ হইল না! একাকিনী রমণী বিদেশে বাস করিতেছে, গৃহে যাইয়া যে আত্মীয় স্বজন দর্শনে ভগ্নহৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ করিবে, সে আশাপথে কণ্টক পড়িয়াছে। কোন সুযোগে কামিনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, যুবতী মনে মনে অনুমান করিল যে সুখী হইবে; কিন্তু কুহকিনী কামিনীর ছল কৌশলে সরলার তাহা ঘটিয়া উঠা দুর্ঘট!

এই ভাবে দিন যাইতেছে। গাত্রের অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া রাধামতি একটী বাক্‌সের মধ্যে রাখিয়াছে। এক সন্ধ্যা আহার ও মলিন বস্ত্র পরিধান, সুখ সম্ভোগে আর যুবতীর স্পৃহা নাই। এমন সময়ে এক দিবস ললিতচন্দ্র আসিয়া রাধামতি সমীপে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাধামতি কিঞ্চিৎ সুস্থা হইল; মনে মনে ভাবিল, ললিতচন্দ্রের সাহায্যে কুহকিনী কামিনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সক্ষমা হইবে। অনন্তর দুই এক দিবস গত হইলে একদিন রাধামতি ললিতকে তাহার অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া দিতে বলিল। ললিত তদ্দণ্ডে সম্মত হইল। সবলা রাধামতি যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী ললিতচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া নগদ টাকা হস্তগত হইবে ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিল; কিন্তু ললিত সেই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া আর রাধামতির সহিত সাক্ষাৎ করিল না। বাজারে বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিবে, এই কথা বলিয়া সে যে রাধামতির নিকট হইতে বিদায় হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস গত হইল, সে আর ফিরিয়া আসিল না। এ দিকে মাসিক ১৬৲ টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া হেমেন্দ্র যে বাটী ভাড়া লইয়াছিল, পাপাত্মা যে কয়েক মাস সেই বাটীতে ছিল, তৎকাল পর্য্যন্ত কোন গোলযোগই হয় নাই; মাসে মাসে ভাড়া দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু হেমেন্দ্র দেশে যাইবার পর হইতে আর ভাড়া সেরূপ দেওয়া হয় নাই, প্রায় তিন মাসের ভাড়া জমিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামীর সরকার আসিয়া টাকার তাগাদা

করিতে লাগিল। রাধামতির এক্ষণে একমাত্র সম্বল দুই গাছা সুবর্ণ বলয়। স্বামী জীবিত আছেন, হস্ত হইতে বলয় খুলিয়া ফেলিলে তাঁহার যে অমঙ্গল হইবে? এই ভাবিয়া রাধামতি সেই বালা দুই গাছা এত দুঃখেও হস্তে রাখিয়া ছিল; কিন্তু গৃহস্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, নতুবা আবার কোন নূতন বিপদ সংঘটিত হইতে পারে ভাবিয়া, যে লোক টাকা আদায় করিতে আসিয়াছিল, তাহাকেই জনৈক স্বর্ণকারকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। অনন্তর বালা দুই গাছা বিক্রয় করিয়া উপস্থিত ঋণ-জাল হইতে মুক্তি পাইয়া রাধামতি সে বাটীখানি পরিত্যাগ করিল। কামিনী রাধামতিকে কোন ক্রমে হস্তগত করিতে না পারিয়া, স্বয়ংই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

রাধামতি কুলকামিনী হইয়া এক্ষণে একাকিনী—পথের ভিখারিণী; জীবন ধারণের নিমিত্ত তাহাকে পথের পথিকের নিকট যাচিঞা করিতে হইল। বাল্যকালাবধি সুখে কালা- তিপাত করিয়াছে, দুঃখের লেশমাত্র সহ্য করে নাই; বর্ত্তমান দুঃখে এককালে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িল, মৃত্যুই তাহার একমাত্র কামনা। কলিকাতা সহরের পথে ভদ্রকুলজাতা রমণী—একাকিনী, লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া দিনাতি- পাত করে, এদৃশ্য ভয়ানক ভয়ঙ্কর! রাধামতি গৃহ- স্থের কন্যা, জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রবধূ, তাহাতে অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন, পথিমধ্যে অনাথিনী প্রায় লোকের নিকট ভিক্ষা যাচিঞা করিয়া দিনাতিপাত

করিবে—সে কার্য্য কদাচ তাহার দ্বারা হইতে পারে না। কামিনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভাগিনী নিরাশ্রয়া হইল। কলিকাতা সহরে লোকের সমধিকগতি-বিধি। পল্লীগ্রামবাসী ভদ্র-মহিলা কিছুই জানে না; তাহাতে আজীবন সুখ স্বচ্ছন্দে যাপন করিয়া আসিয়াছে, দাস দাসী দ্বারা সকল কার্য্যই আবশ্যক মতে পূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া রাধামতি শোকতাপে এককালে অভিভূতা হইল। কি করিবে, কোথায় যাইবে, অপরিচিত স্থানে কাহার নিকট জীবনের যথাযথ ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া দয়ার পাত্রী হইবে; বিদেশে সকলেই তাহার অপরিচিত, কে বা তাহার মুখে আত্মপরিচয় শুনিয়া তাহাকে করুণা-কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিবে? রাধামতি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শোকতাপে মৃতপ্রায় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পথিমধ্যে একাকিনী দণ্ডায়মানা। কত লোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু কেহ অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছে না, যে দুই একজন তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে, তাহারা নেত্র পরিতৃপ্তির নিমিত্ত মাত্র; কেহ কেহবা দুই একটা পরিহাস করিয়াই চলিয়া যাইতেছে। রাধামতি ভদ্রকুলবধূ, পথে অনাথিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। পুরুষ যেভাবেই পথে বিহার করুক না। কেন, কাহারও তাহাকে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই; কিন্তু হিন্দুরমণী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা হইলেও পথের বাহির হইয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও লোকের নিকটে

দূষণীয়া! রাধামতি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অধীর হইয়াছে, তথাপি সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই, বিধাতার কৃপায় কতক্ষণে জনৈক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আশ্রয় পাইবে,অভাগিনী আগ্রচিত্তে সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। যত সময় যাই-তেছে, মনে মনে কাঙ্গালিনী অধিকতর ভীতা হইতেছে। কখন বা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া রোদন করিতেছে।

সংসারে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বিশিষ্ট লোকের বসতি। কেহ কেহ বা পরোপকার-ব্রতে জীবন সংযত রাখিয়া, সদানন্দে কাল যাপন করিতেছেন, আর কেহ বা স্বার্থ-সিদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিয়ত অন্যের অমঙ্গল সংঘটনে সচেষ্টিত! রাধা-মতিকে পথপার্শ্বে দর্শন করিয়া, কত লোকের মনে কত ভাবের উদয় হইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই! স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যই বিপদের মূল, রমনীর রূপ লাবণ্য উপলক্ষ্য করিয়া যত কিছু অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। রাধামতি পথের ভিখারিণী হইলেও তাহার অসামান্য রূপরাশী ও অলৌকিক চারুকান্তি কিছুতেই লুপ্ত হইবার নহে। যুবতীর শরীরের প্রতি এক্ষণে যত্ন নাই, কেশদামের পারিপাট্য না থাকায় আলু থালু ভাবে বিস্তারিত; তথাপি সে চারু প্রতিমা কিছুতেই নয়নের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবার নহে! যে রূপরাশি দর্শকের মনোমুগ্ধকারিণী, বারেক মাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, পুনরায় তাহা দেখিবার জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতে থাকে।

রাধামতি ভগ্ন হৃদয়ে নিরুৎসাহ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কতক্ষণে তাহার সদ্‌গতি হইবে, জনৈক ভদ্রলোক কৃপা

করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবেন; এইরূপ যুবতী ভাবনা চিন্তায় এককালে নিমগ্না রহিয়াছে। এমত সময়ে জনৈক যুবক রাধামতির সম্মুখীন হইল। সরল হৃদয়া তাহার নিকট আত্ম-কাহিনী জ্ঞাপন করিলে অবশ্যই পূর্ণ-মনোরথ হইবে অনুমান করিয়া, সেই পথিককেই সাধু ও সৎ চরিত্র জ্ঞান করিয়া, অকপটে সবিশেষ বিবরণ জানাইল। শঠশিরোমণি লম্পট যুবক যে, কৌশল ক্রমে তাহাকে আপনার আয়ত্তাধীন করিবার উদ্দেশেই তৎ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, অভাগিনী সে বিষয়ের বিন্দুমাত্রও ভাবে নাই। অবশ্যই ভদ্রলোক প্রকৃত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা অবশ্য কোন না কোন উপকার ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, মনে মনে অনুমান করিয়া রাধামতি তাহার নিকটে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের কিঞ্চিন্মাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই, আপনার ক্ষণিক সুখের আশয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেও তাহারা পরাঙ্মুখ নহে। রাধামতির প্রস্তাব শ্রবণ মাত্রেই সেই যুবা তদ্বিষয়ে স্বীকৃত হইল। অকস্মাৎ তাহাকে আশ্রয় দানে সম্মত দেখিয়া রাধামতির মনে মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। ইতি পূর্ব্বেই হেমেন্দ্রের ব্যবহারে অভাগিনী গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে, পবিত্র সতীত্ব-রত্নে চিরকালের জন্য বঞ্চিতা হইয়াছে। পুনশ্চ আগন্তুক যুবকের প্রলোভনে মুগ্ধা হইয়া যে তাহার কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। অপরিচিত যুবকের স্বভাব চরিত্র তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ

নূতন। রাধামতি দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে যুবককে তাহার ভার গ্রহণে স্বীকৃত দেখিয়া; তাহার কথানুসারে কার্য্য করিতে বিমুখ হইল। সরল প্রকৃতি হইয়াও রাধামতি সম্প্রতি হৃদয়ে যে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছে, আপনার নির্ব্বুদ্ধির নিমিত্তই গৃহস্থের কুলবধূ হইয়া আজি অনাথিনী—পথের কাঙ্গালিনী; অকস্মাৎ লোকের প্রলোভনে মুগ্ধা হইয়া উপস্থিতে ফলভোগ করিতেছে। রাধামতি সুমতি ও সরলা হইয়াও,আজি তাই যুবকের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না, অগত্যা নিরুপায় হইয়া যুবক রাধামতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এবং যাইবার সময়ে রাধামতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, দুই একটী পরিহাসজনক কথা বলিয়া গেল। তাহার ঈদৃশ ব্যবহারে রাধামতির সন্দেহ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। পাপাত্মাকে কৌশলে বিদায় করিয়াছে ভাবিয়া, এরূপ অবস্থাতেও রাধামতি মনে মনে আনন্দিতা হইল।

ধর্ম্মপথে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, দয়াময় জগদীশ্বর তদ্দণ্ডে তাহার উপায় করিয়া দেন। রাধামতি হতাশ ভাবে পথিপার্শ্বে বসিয়া আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, মনে মনে সঙ্কল্প—তাহার থাকিবার একটী আশ্রয় স্থির না করিয়া, জল গ্রহণ করিবে না। পরম দয়ালু ভগবান তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। পাপাত্মা যুবক রাধামতিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনতিবিলম্বেই জনৈক বৃদ্ধ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি রাধামতিকে এরূপ শোক ভাবাপন্ন

দেখিয়া সমীপস্থ হইলেন এবং যুবতীর কাতরোক্তি শ্রবণে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল। তিনি রাধামতিকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা করিবার উদ্দেশে গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। রাধামতি বৃদ্ধের বচনে বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার অনুগামিনী হইল। বৃদ্ধ আপাততঃ রাধামতিকে ধাত্রী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যেহেতু রাধামতি ভদ্রকুলজাতা রমণী হইয়াও যখন পথপার্শ্বে একাকিনী দণ্ডায়মানা, অবশ্যই তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন না কোন কলঙ্ক ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার স্বভাব চরিত্র তাঁহার তৃপ্তিজনক বিবেচিত হইলে, তিনি তাহাকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন মনস্থ করিলেন। আপাততঃ রাধামতি বৃদ্ধের গৃহে ধাত্রীভাবেই কার্য্য করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কামিনীর ছলনায় মুগ্ধা হইয়া রাধামতি নিঃসহায় বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বক্কেশ্বর একাকী শোক-তাপে অভিভূত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন সংসারের একমাত্র অবলম্বন, বক্কেশ্বরের পরম

সুহৃৎ দ্বারকানাথ সমভাবে তাঁহার প্রতি যত্ন মমতা করিতেছেন; একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহে বক্কেশ্বরেরও দীনাবস্থাতে কষ্ট নাই। রাধামতির গৃহত্যাগের বিষয় এক্ষণে তাহার শ্বশুরালয়েও প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রনাথ বক্কেশ্বরের নিকট সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। হতভাগ্য বক্কেশ্বর দুহিতার কলঙ্কের কথা আর কি জানাইবেন? তাঁহার বিদিত ঘটনাবলীর যথাযথ উল্লেখ করিয়া পত্রোত্তর প্রেরিত হইয়াছে। জনসমাজেও দুহিতার অপবাদের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। বক্কেশ্বর নিরপরাধী হইয়াও রাধামতির দোষে লোকের নিকট অপরাধী, সকলেই তাঁহার এক্ষণে নিন্দাবাদ করিতেছে। বাল্যকালাবধি কন্যাকে আমোদপ্রমোদে অনুরক্তা থাকিতে দেখিয়াও তিনি তাহার যথাযথ প্রতীকার করেন নাই বলিয়া রাধামতির চরিত্রের এরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে; নতুবা ভদ্র-রমণী পিতামাতার শাসনাধীনে থাকিলে কদাচ সাংসারিক রীতিনীতি পালনে বিমুখ হইত না। রাধামতির কুপথগামিনী হইবার প্রথম ও প্রধান কারণই পিতামাতার অবৈধ আদর যত্ন। যাহাহউক অভাগা মিত্রজা মহাশয়ের সম্বন্ধে হাটে, ঘাটে লোকে এইরূপ নানা কথা কহিতে লাগিল। পুত্র কন্যা জনিত নিন্দাবাদ পিতামাতার অসহ্য হইলেও, বক্কেশ্বর লোকাপবাদ-ভার বিষণ্ণ হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতেছে। বক্কেশ্বরের আর সংসারে ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই,

কোনপ্রকারে ইহ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইলেই, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। দ্বারকানাথও পুত্রের নিমিত্ত কয়েকদিন মনে মনে দুঃখিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব নাই, বহুসংখ্যক দাসদাসী দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি করিতেছে, উপযুক্ত সন্তান মহেন্দ্রনাথ পিতার আজ্ঞাবাহী; বস্তুতঃ দ্বারকানাথের সাংসারিক ভাবনাচিন্তা কিছুমাত্র নাই। বহুকালাবধি বক্কেশ্বরের সহিত তাঁহার সখ্যতা। সময়ে বক্কেশ্বরেব পিতার নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছেন। তাহাতে আবার তিনি নিজে পবমধার্ম্মিক ও উদার প্রকৃতি। ভদ্রসন্তান সাংসারিক ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাকে কোন প্রকারে সহায়তা করা দ্বারকানাথের একান্ত ইচ্ছা। এই নিমিত্তই রায়মহাশয় বক্কেশ্বরের সুখদুঃখের সমভাগী; অভাগা বক্কেশ্বরের উপস্থিত বিপদে তিনিও কতক পরিমাণে শোকাকুল হইযাছেন। যাহাতে অচীরে রাধামতির সন্ধান হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। ধনাঢ্য লোকের লোকজনের অভাব নাই, কেহ হেমেন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া দিলে, তিনি যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিবেন; এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, স্থানে স্থানে অনেকেই তাহার সন্ধানে গমন করিয়াছিল। অনন্তর কিছু কালের পর জনৈক ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়া রায় মহাশয় স্বয়ং যাইয়া হেমেন্দ্রকে সম্প্রতি গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। রাধামতি কুপথ-গামিনী হইয়াছে, তাহাকে গৃহে আনিলে জন-সমাজে কলঙ্ক ঘোষিত

হইবে; সেই ভয়েই রাধামতিকে রায় মহাশয় সঙ্গে লইয়া আসিতে পারেন নাই। একথাও কালক্রমে বক্কেশ্বরের কর্ণগোচর হইয়া ছিল। বৃদ্ধ বক্কেশ্বরের এক পক্ষে সমাজ-বন্ধন, অন্যপক্ষে দুহিতা; তিনি এক্ষণে কোন দিক রক্ষা করেন? প্রথমতঃ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। একবার মনে ভাবিলেন, রাধামতিকে গৃহে আনিয়া সমাজের সহিত সংশ্রব না রাখিয়া দিনাতিপাত করিবেন; কিন্তু এ বৃদ্ধাবস্থায় এরূপ কলঙ্ক মস্তকে গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া মনোভিলাষ পুর্ণ করিতে সাহসী হইলেন না। দিনে দিনে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। দ্বারকানাথ মিত্রজা মহাশয়ের আহারাদির বিষয়ে যত্নবান হইয়াও তাঁহার বিকল চিত্তে সুস্থতা সম্পাদন করিতে অক্ষম হইলেন। পল্লীস্থ বালক বালিকা পর্য্যন্ত বক্কেশ্বরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কোন সুযোগে বক্কেশ্বর সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়। কিন্তু বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পাপপুণ্যের ফলাফল হইতে অব্যাহতি কে পাইতে পারে? পরিশেষে বক্কেশ্বর উন্মাদ-প্রকৃতিগ্রস্থ হইলেন। সাংসারিক বাসনা এককালে তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া এক্ষণে দুরাবস্থাপন্ন হইয়াছেন, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এসকল বিপদাপেক্ষা রাধামতির গৃহ হইতে প্রস্থানে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; এবং ইহাতেই তাঁহার উন্মাদের সূত্রপাত হইল। সুবিজ্ঞ

দ্বারকানাথ ঔষধ, পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন বটে, কিন্তু যে মনাগুণে অভাগার হৃদয় অহোরাত্র বিদগ্ধ হইতেছে, সে দাহ-যন্ত্রনা নিবারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। রাধামতিই বক্কেশ্বরের সুখজীবনের কণ্টক স্বরূপিণী! সকাল সন্ধ্যা সর্ব্বক্ষণ কন্যার চিন্তায় বৃদ্ধ বক্কেশ্বর আকুলিত; রায় মহাশয় সময় মতে তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন; কিন্তু, কিছুতেই অভাগা বক্কেশ্বরের ভগ্নহৃদয় প্রবোধিত হয় না।

সংসারে যত দিন থাকিতে হয়, আহার বিহার ব্যতিরেকে এক দিনও লোকের অতিবাহিত হয় না; অভাগা বক্কেশ্বর নিদারুণ দুঃখভোগ করিয়াও সাংসারিক অভাব পূরণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যত্নবান! রায় মহাশয় তাঁহাকে ভ্রাতৃ-নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। তিনি বক্কেশ্বরের দিন দিন মনোবিকার লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিলেন যে, স্থানান্তরে গমন করিলে হয়ত অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে পারিবেন। এই মনে করিয়া, এক দিবস সন্ধ্যাকালে দ্বারকানাথ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে কথা প্রসঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইবার কথা উত্থাপন করিলেন। বক্কেশ্বর এক্ষণে পথের পথিক, তিনি গৃহী হইয়াও গৃহশূন্য হইয়াছেন। অসার সংসারে তাঁহার দেহভার বহন এক্ষণে কষ্টপ্রদ জ্ঞান হইতেছে, কোন প্রকারে ইহজীবন হইতে অব্যাহতি পাইলেই তাঁহার সকল ভাবনা চিন্তা ঘুচিয়া যায়; কিন্তু দয়াময় বিধাতা তাঁহাকে সুদীর্ঘ-জীবন

প্রদান করিয়াছেন, সংসারের এরূপ অসামান্য ঘাত-প্রতিঘাতেও তাহার হ্রাস হয় নাই! বাল্যকালাবধি কত পরিবর্ত্তন তাঁহার অদৃষ্টে সংঘটিত হইল, পুনঃ পুনঃ শোকদুঃখরূপ প্রবল প্রভঞ্জনে আলোড়িত হইয়াও বঙ্কেশ্বরের দেহতরু উন্মূলীত হইল না! নিরাশ্রয় অপ্রকৃতাবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াও বঙ্কেশ্বর বন্ধুর অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ রায় মহাশয় তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতেন; রাধামতিজনিত শোকে কাতর হইয়া বঙ্কেশ্বরের বক্ষস্থল সদাসর্ব্বদা নয়নাসারে ভাসিয়া যায়, সে দৃশ্য রায় মহাশয়েরও হৃদয়বিদারক হইত। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণে সুখ নাই; বিশেষতঃ তাহাতে আজীবনকাল অপবাদ ভোগ করিতে হয়, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া রাধামতিকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। বঙ্কেশ্বর রায় মহাশয়কেই সংসারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ জানিতেন, যে কার্য্যে রায় মহাশয়ের অভিরুচি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া বঙ্কেশ্বর তাহাতেই স্বীকৃত হইতেন। সাংসারিক কার্য্যে আবদ্ধ থাকিয়া এতাবৎকাল বঙ্কেশ্বরের ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু মাত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই, এক্ষণে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশাও উপস্থিত। বিষয় লালসায় মুগ্ধ থাকিলে, পরিণামের মঙ্গলের পথে কণ্টক জন্মাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; বস্তুতঃ বঙ্কেশ্বর ঈশ্বর চিন্তায় সংযত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল মনের আনন্দে যাপন করিবেন, মনে মনে অনুমান করিয়া ছিলেন। কিন্তু রাধামতির এরূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার

সে আশা-লতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। কন্যার বিচ্ছেদ-শোকে অধীর হইয়া তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আলোচনায় বিরাগী হইয়া ক্ষুণ্ণমনে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এদিকে আবার দ্বারকানাথের নিজের সুখসম্ভোগের সম্পূর্ণ সুবিধা সত্ত্বেও, তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী ও সরল হৃদয়। পরের মঙ্গলচিন্তাই তাঁহার জীবনের সার উদ্দেশ্য, বক্কেশ্বরের মনস্তৃপ্তির কারণ তিনি অর্থব্যয়েও কাতর নহেন। পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ পর্য্যটনে ইহ ও পারলৌকিক উভয় পক্ষেই মঙ্গলপ্রদ ভাবিয়া, রায়মহাশয় বক্কেশ্বরকে এবিষয়ে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। বিদেশ ভ্রমণে মনের অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্তন হইবে, ঠাকুর দেবতা দর্শনেও পুণ্যসঞ্চয় হইবে, তাহাতে পরম সুহৃৎ রায়মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, আবার তিনি ব্যতিরেকে আর এ বিশ্ব-সংসারে বক্কেশ্বরের আপনার কেহ নাই, অগত্যা রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে দ্বিধাশূন্য-চিত্তে শোকতাপ জর্জ্জরিত বক্কেশ্বর স্বীকৃত হইলেন।

হেমেন্দ্র পৈত্রিক ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এতাবৎ কাল আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করিতেছিল। সঙ্গ দোষে চরিত্র দূষিত হওয়ায় দিনে দিনে লোক সমাজে তাহার অখ্যাতি ঘোষিত হইয়াছে; লোকে তাহাকে লম্পট ও সুরাপায়ী বলিয়া অবজ্ঞা করে, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। তাহার স্বভাব দোষেই সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বেশ্যার বাহ্যিক অনুরাগও এক্ষণে হতভাগ্যের সম্যক

হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে বিনোদিনীকে না দেখিলে সংসার তাহার পক্ষে শূন্যময় বোধ হইত, যাহার মনস্তৃপ্তির কারণ হতভাগ্য—সরলা, পতিব্রতা পত্নীর হৃদয়ে মর্ম্মাঘাত করিয়াছিল, যাহাকে হেমেন্দ্র জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া জানিত, সেই বারবিলাসিনী অপর পুরুষের সংসর্গে আমোদ প্রমোদে এক্ষণে কালাতিপাত করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হেমেন্দ্রের কথঞ্চিৎ চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু তথাচ বাল্যকালাবধি রাধামতির প্রতি যে আসক্তি ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কামিনীকে সহায় পাইয়া অভাগিনী রাধামতির সতীত্বনাশ করিয়া এক্ষণে পাপাত্মা লোকলজ্জায় মর্ম্মাহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হেমেন্দ্রের আর পূর্ব্বমত দাম্ভিকতা বা বিলাস ভোগ লিপ্সা নাই। সুরা ও বেশ্যার গুণাগুণ তাহার হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আচরিত কার্য্য সমূহের জন্য হেমেন্দ্র অনুতাপিত। জীবনে আর এরূপ অসার আমোদ সম্ভোগে অনুরক্ত হইবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে পিতার পরামর্শানুসারে চলিবে—স্থির করিয়াছে। রায় মহাশয়ও তাহাকে কলিকাতা হইতে লইয়া আসা পর্য্যন্ত তাহার স্বভাব চরিত্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মিত্রজা মহাশয়ের সমভিব্যাহারে পিতা পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইতেছেন শুনিয়া, হেমেন্দ্র তাঁহাদের অনুগামী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। পুত্র নিকটে থাকিলে অবশ্য দিনে দিনে তাহার চরিত্র অপেক্ষাকৃত সংশোধিত হইবে ভাবিয়া, রায় মহাশয়

তাহাকেও লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের বিদেশ গমনের পরামর্শ স্থির হইলে, তদুপযোগী বেশ ভূষার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যথাসময়ে তাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের স্রোত একবার হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে, তাহার গতিরোধ দুষ্কর! অগ্নি স্পর্শে যেরূপ তুলারাশি ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, সেইরূপ লোকে পাপাসক্ত হইলে উত্তরোত্তর পাপকার্য্যে সংযত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যেই মহাপাপী হইয়া উঠে। পাপ কার্য্যের মোহিনী শক্তি, আপাততঃ মধুরতাময় প্রতীয়মান হইয়া, পরিশেষে গরলরাশি উদ্গীরণ করিতে থাকে। গর্হিত কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্যের লোপ হয় এবং উত্তরোত্তর আমরা যে পরিমাণে পাপে সংযত হইতে থাকি, দিনে দিনে আমাদের মনোবৃত্তি সকলও সেইমত বিকার ভাবাপন্ন হইয়া ভদ্র ও ইতরের বৈলক্ষণ্য ক্রমে লোপ পায়। ধর্ম্মপথে থাকিয়া আমরা, যেসকল কার্য্য অপরকে অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া ঘৃণা করি; অসৎ পথের পথিক হইলে লজ্জা

সম্ভ্রম ও জ্ঞানশূন্য হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে হয়ত আমরাই তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হই। সে সময়ে আমাদিগের হিতাহিত বিবেচনাশক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আপাততঃ যাহাতে সুখী হইব, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া, আমরা তখন আনন্দচিত্তে তাহাতেই অনুরক্ত হইতে থাকি। পরিণামের ভাবনা সে সময়ে আর হৃদয়ে স্থান পায় না, অনুষ্ঠিত কার্য্যই পরম প্রীতিপ্রদ জ্ঞান করিয়া সুধাভ্রমে হলাহল পান করি।

রাধামতি বৃদ্ধের বাটীতে ধাত্রীকার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছে। দুঃখে কষ্টে আপনার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে,একপ্রকার নিরাপদে তাহার অবশিষ্ট জীবন কাটিয়া যাইত! সৎপথে থাকিব, কদাচ কাহারও কথায় বিচলিত হইব না, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিলে অবশ্যই অভাগিনী আমরণকাল মনের সুখে যাপন করিতে পারিত; কিন্তু তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। গৃহস্থের বধূ ও কন্যা হইয়া সহচরীর কুহকে পড়িয়া লম্পট হেমেন্দ্রের উৎপীড়নে তাহার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, পিতা বা শ্বশুরালয়ে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই; তাঁহারাও সমাজ-ভয়ে তাহার সহিত সংশ্রব রাখিবেন না! এ অবস্থায় রাধামতি জনৈক বৃদ্ধের আশ্রয়ে কালাতিপাত করিবার সুযোগ পাইয়াও আপনার বুদ্ধিদোষে কলঙ্কিনী হইল। ভদ্র সমাজে ইহজন্মে আর গৃহীতা হইবে না, চির দিন তাহার দুঃখেই কাটিবে, এ দারুণ পরিতাপানলে কেহ তাহার সহায়তাও করিবে না; লোকের নিকট তির-

স্কার ব্যতিরেকে কেহ তাহাকে সাদরসম্ভাষণে আহ্বানও করিবে না। সুখস্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে বাল্যকালাবধি যাপন করিয়া পরাধীন ও সমাজের হেয় ভাবে দিন যাপন উপস্থিতে তাহার কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাধামতি এক্ষণে আবার পূর্ণ যৌবনা। ষড়রিপু তাহার দেহে স্ব স্ব আধিপত্য সমভাবে বিকাশ করিতে লাগিল; এ অবস্থায় দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সাংসারিক ভোগ লালসায় চির বিসর্জ্জন দিয়া কালক্ষেপ করা যুবতীর পক্ষে কষ্টপ্রদ বলিয়া অনুমিত হইল। উপস্থিত সুখলালসা পরিত্যাগ করিয়া, পরিণামে অনিশ্চিত ঘটনাবলীর প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা রাধামতি সদৃশ আমোদাভিলাষিণী রমণীর পক্ষে দুঃসাধ্য!

বৃদ্ধের গৃহে দুই চারি দিবস কালক্ষেপ করিয়াই রাধামতি তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিপ্রায় করিল। কুপ্রবৃত্তি তৎকালে তাহার হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উপস্থিত সুখলাভে যে পাপের প্রশ্রয় হইবে, দেহ বিনিময়ে রত্ন লাভ করিয়া যে পরিণামে তাহার দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইবে, মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজন দূরে থাকুক, ভদ্র ইতর কেহই তাহার মুখে এক ফোঁটা জলও প্রদান করিবে না; এসকল বিষয়ে কিছু-মাত্র চিন্তা না করিয়া, যাহাতে উপস্থিতে সদত মনের আনন্দে ক্ষেপণ করিতে পারে, তাহাতেই আসক্তা হইল। রাধামতি বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াই বারবিলাসিনী শ্রেণীভুক্ত হইল। কামান্ধ যুবকবর্গের ভবিষ্যতের

প্রতি দৃষ্টি নাই। তাহাদিগেরই প্রশ্রয়ে বারাঙ্গনা সম্প্রদায় প্রতিপালিতা হইয়া থাকে। গৃহস্থের বধূ হইয়া দিন কাটাইতে হইলে পদে পদে শ্বাশুড়ী, ননদের গঞ্জনা সহ্য করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে,ভর্ত্তা সঙ্গতিপন্ন না হইলে স্ত্রীলোকের সংসারে সুখ নাই। সংসারযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, সামাজিক রীতি-নীতি রক্ষা করিয়া কি প্রকারে সঙ্কুলান হইবে, এই সকল ভাবনা চিন্তায় হিন্দু-রমণীর শরীর দিনে দিনে জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে; তথাপিও তাহারা অমূল্য সতীত্ব রত্নের অধিশ্বরী হইয়া স্বামীসহ এক বেলা আহার করিয়াও মনের সুখে কালাতিপাত করে। অভাগিনী রাধামতির অদৃষ্টে সে পথ রোধ হইয়াছে; সংসারী হইয়া যে সুখে দিনাতিপাত করিবে, সে আশা তাহার ইহজন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, রূপ ও যৌবনের সহায়ে এই সময়ে দশ টাকা সংস্থান করিতে পারিলে, পরিণামে তাহাকে এরূপ দুঃখে কষ্টে কাটাইতে হইবে না, গৃহধর্ম্মে যখন তাহার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তৎকালে এ অল্পবয়সে পরের দাসত্ব স্বীকার— তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য! রাধামতি কুলকলঙ্কিনী, এক্ষণে ব্যভিচার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল।

সচরাচর লম্পট হতভাগ্য যুবক সম্প্রদায় বার-বিলাসিনীর চতুরতা পূর্ণ প্রণয়ে বিমোহিত হইয়া বিষয় সম্পত্তি সমুদয়ই উপপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে। অপরন্তঃ বেশ্যাদের চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, যখন যাহার নিকট

অধিক পরিমাণে অর্থ উপায়ের সুযোগ দেখিল, সময়োপযোগী কৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া দুই চারিটী মিষ্ট কথায় তাহাকেই জীবনের সর্ব্বস্বধন প্রিয়জন বলিয়া সন্তুষ্ট করিল। কিন্তু উপপতির অর্থাভাব উপস্থিত হইলে, আর তাহার প্রতি তাদৃশ যত্ন বা সম্মানাদি প্রদর্শন করে না; অধিক কি, তখন তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই মনে মনে প্রীত হয়। কিন্তু রমণীগণ এরূপ অসৎ পথ অবলম্বন করিয়াও এক দণ্ডের নিমিত্ত বাস্তবিক মনের সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ ইত্যাদি বাহ্যিক সুখের ভাণ করিলেও প্রকৃত আন্তরিক সুখ লাভ করিতে পারে না। যেঁহেতু তাহাদিগকে নিত্য নিত্য নূতন লোকের মনস্তুষ্টি করিতে হইবে, নতুবা লম্পটগণ তাহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইবে কেন? রমণী যখন ব্যভিচারিণী হয়, তৎকালে তাহার মনে এ ভাবের উদয় হয় না। প্রেমিক সহবাসে প্রেমালাপে উন্মত্ত হইয়া ভবিষ্যতের পথে কণ্টক ক্ষেপণ করে। রাধামতি প্রতিপালক বৃদ্ধের বাটী হইতে বিদায় গ্রহণানন্তর জনৈক যুবকের প্রণয়াসক্ত হইয়া কিছুকাল বাহ্যিক আমোদ প্রমোদে যাপন করিল।

অসৎ প্রবৃত্তির ফলাফল ইহ সংসারেই লক্ষিত হইয়া থাকে। জল ঝড়েও কোন বাধা না মানিয়া রাধামতি পদব্রজে যে প্রেমিকের অনুসন্ধানে তাহার বাটীর বহির্দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিত, যাহার ক্ষণেক অদর্শনে তাহার হৃদয় আদৌ পরিতৃপ্ত হইত না; সেই লম্পটও সময়ে তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়া চলিয়া গেল। রায় মহাশয় হেমে-

ন্দ্রকে লইয়া বাটী প্রস্থান করিলে, তাহার বিরহে যুবতীর যে প্রকার মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সে হৃদয় তাদৃশ উৎকণ্ঠিত হইল না; যেহেতু দিনে দিনে, সে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে; সরল হৃদয়ে কাঠিন্য আশ্রয় লইয়াছে। অন্যের অশ্রুজল দর্শনে এখন আর রাধামতির হৃদয় আর্দ্র হয় না। পাপিয়সী যে কোন উপায়ে দশ টাকা সংস্থান করিয়া বার্দ্ধক্যে ভীষণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, বর্ত্তমানে ইহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সরলা রাধামতি এক্ষণে কপটতার পূর্ণপ্রতিমূর্ত্তি! লোকের মন ভুলান কয়েকটী সুমিষ্ট আলাপনে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার প্রেমাকাঙ্খীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যতা; এক্ষণে তাহার লজ্জা সম্ভ্রম কিছুই নাই, সমাজচ্যুত হইয়া রূপ লাবণ্যই উপার্জ্জনের একমাত্র সহায় জানিয়া স্বেচ্ছাচারিণী স্বেচ্ছানুসারে হতভাগ্য লম্পট দিগের প্রতি যথাযথ কুব্যবহার করিতে শিক্ষিতা হইয়াছে। হেমেন্দ্রের আয়ত্তাধীনে যে রাধামতি সতীত্বধর্ম্ম সংরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিল, এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠা অর্থলোভে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিতা নহে। মিথ্যাকথা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি যে কয়েকটী কার্য্য জগতে দুষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, একে একে সকলগুলিই তাহার হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছে। কপটতা, ছলনা এক্ষণে তাহার কথায় কথায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। নিষ্ঠুর ঘাতক যেরূপ দয়া মায়া শূন্য হইয়া অপরাধীর প্রাণদণ্ড করে, দিনে দিনে রাধামতি সেইরূপ প্রেমোন্মত্ত

যুবক দিগের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে লাগিল। দশ বার বৎসরের মধ্যেই রাধামতি প্রায় দুই তিন সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিল। এক্ষণে তাহাকে আর গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত চিন্তা করিতে হয় না ; কিন্তু অর্থে মানসিক চিন্তা বিদূরীত হইবার নহে!

রাধামতি পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত, অসৎবৃত্তি অবলম্বনে তদপেক্ষা বাহ্যিক আমোদ প্রমোদ বহুল পরিমাণে উপভোগ করিয়াও সেরূপ মনের তৃপ্তি লাভ করিতে পাইত না। বিষয় সম্পত্তির বৃদ্ধি হইলেও রাধামতি সংসারে একাকিনী, নিঃসহায়া; পীড়িতাবস্থায় সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার আত্মীয় স্বজন এমন কেহই নাই। আলাপ পরিচয়ে তদ্ব্যবসায়ী কতিপয় বারাঙ্গনার সহিত আত্মীয়তা হইয়াছে মাত্র! অভাগিনী এরূপ সুখ সম্ভোগ করিয়াও মনে মনে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সুখী নহে। গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে, তাহার এরূপ লম্পট কর্ত্তৃক আদর যত্ন হইত না বটে ; কিন্তু একমাত্র পতির মনোরঞ্জন করিয়াই মনের সুখে দিনাতিপাত করিতে পারিত! অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অভাগিনীকে দিবানিশি সদত শঙ্কিতভাবে কালযাপন করিতে হইত না! যাহাহউক কিছুদিন মনে মনেএইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থাদি পর্য্যটনে ক্ষেপণ করিবার অভিপ্রায়ে গাত্রের অলঙ্কারাদি সমুদায় বিক্রয় করিয়া প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা হস্তগত করিল। প্রতিদিন

রাত্রি জাগরণ, তাহাতে অসময়ে আহার, লম্পট দিগের উৎপীড়ন ইত্যাদি রাধামতিকে এতাবৎ কাল সমস্তই সহ্য করিতে হইয়াছিল। এ কারণ অল্প বয়সেই তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য এককালে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্যভিচারিণী রাধামতি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া এক্ষণে সমস্ত নগদ মুদ্রা হস্তগত করিয়াছে। অবশেষে জনৈক স্ত্রীলোক সমভিব্যহারে পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ পর্য্যটনে জীবন যাপনের যুক্তি করিল।

এক্ষণে রাধামতির কেশদাম তৈলাভাবে রুক্ষ, নিয়মিত বিন্যাস বিনা, পারিপাট্য বিহীন; অবয়ব সুবর্ণালঙ্কার বিচ্যুত, তাহাতে অভাগিনীর মনে সুখের লেশ মাত্র নাই। যৎসামান্য এক সন্ধ্যা আহার করিয়া দিনাতিপাত করে; পরিধান সামান্য মলিন বস্ত্র। অবশিষ্ট জীবন সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্না থাকিয়া কি প্রকারে আচরিত মহাপাতক হইতে পরিণামে পরিত্রাণ পাইবে, ভীষণ নরকের তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, ইহাই তাহার একমাত্র ইচ্ছা। মিত্রজা মহাশয়ের নয়নপুত্তলি রাধামতির প্রতি নেত্রপাত হইলেই মনোবিকার উপস্থিত হয়। সে লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য, অসামান্য রূপ রাশি এক্ষণে আর কিছুই নাই।

কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! জগদীশ্বর! তোমার চমৎকার লীলা!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান বারাণসী, ভাগিরথী তটে সংস্থিত। দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের দিব্যমূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজমান। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ মহাদেবের পরম উপাসক ছিলেন। ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া তিনিই বিশ্বেশ্বরের মন্দির সুবর্ণমণ্ডিত করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি তাহা দর্শকবৃন্দের নয়নগোচর হইয়া থাকে। হিন্দুগণ ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে; ধর্ম্মানুষ্ঠানে কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতে যেরূপ হিন্দুসন্তানকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ কোন জাতিকে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, লোক ইচ্ছা করিলেই যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারে; কিন্তু পুরাকালে ধার্ম্মিকগণ জলপথে কাশী, গয়া প্রভৃতি দুর্গম স্থানে তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিতেন। রুদ্রদেব বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি বক্ষে ধরিয়া কাশী মোক্ষধাম, জগৎজননী অন্নপূর্ণা দেবী তাহাতে জ্যোৎস্নাময়ী শশীস্বরূপিণী! কাশীতে মৃত্যু হইলে জীবের শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতি ভিত্তি-স্থাপন করিয়া পিতামাতা জীবন সর্ব্বস্ব সন্তান সন্ততিকে গৃহে রাখিয়া, দেশদেশান্তর হইতে পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে উপনীত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথ বসু বার্দ্ধক্যের অবলম্বন পুত্র ফণীন্দ্রনাথকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্যতিরেকে এক বিধবা কন্যা—অভাগিনী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃ-গৃহেই দিনাতিপাত করিতেছে। স্বামীর মৃত্যুতে হিন্দুরমণীর শ্বশুরালয়ের সম্বন্ধ এককালে রহিত হইলেও, ভদ্র সন্তান পুত্রবধূর ভরণ পোষণের যথাযথ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু চন্দ্রনাথের তনয়ার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার শ্বশুর পক্ষ হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনপ্রকার বন্দোবস্তই করা হয় নাই। চন্দ্রনাথও নিতান্ত অক্ষম পুরুষ নহেন, পৈত্রিক সম্পত্তিও তাঁহার নিতান্ত অল্প ছিল না। দুহিতার জন্য মৃতজামাতার বিষয় সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ করা লজ্জার কথা ভাবিয়া, তিনি কন্যাকে আপনার গৃহেই রাখিয়াছিলেন এবং আবশ্যক মতে দুই দশটাকা কন্যার হস্তে প্রদানও করিতেন। বিশেষতঃ চন্দ্রনাথের পরিবার সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে, আপনি ও সহধর্ম্মিণী এবং দুইটী মাত্রপুত্র ও কন্যা। কয়েক বৎসর অতীত হইল, পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন; তাহাতে একটী পুত্রবধূ তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যেদিবস ফণীন্দ্রনাথ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই ক্ষণ হইতেই চন্দ্রনাথের সংসারের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইতে থাকে পুত্র সুবোধ সুশীল, লেখাপড়াও এক প্রকার শিখিয়াছে; সংসার কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী; অকস্মাৎ কোন কথা না বলিয়া যে গৃহত্যাগী হইল, ইহারই বা কারণ কি?

বিশেষতঃ সেই বৎসর ফণীন্দ্রের বি, এ পরীক্ষা দিবার কথা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ মনঃসংযোগ সহকারে ফণীন্দ্র বিদ্যাধ্যয়নে সংযত থাকিত, এক্ষণে আর তাহাকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইত না। প্রস্থানের পূর্ব্বে সদা সর্ব্বদাই ফণীন্দ্র যেন অন্যমনস্ক ভাবে থাকিত। চন্দ্রনাথের এ সকল ঘটনার প্রতি পূর্ব্বেই দৃষ্টিপাত হইয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত সন্তান যে বাল্যকালাবধি পিতার অনুমতি ব্যতি-রেকে কখন কোন কার্য্য করে নাই, লোকের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বা বাগ্‌বিতণ্ডায় যাহার বিষদৃষ্টি; সেই গুণবান পুত্র যে তাঁহাকে কথার কথা একবার মাত্র না জানাইয়া, গৃহ হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে, এ বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।

দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই তিন দিবস গত হইল, ফণীন্দ্র নাথের নিরুদ্দেশ! বসুজা মহাশয় ভাবিলেন, ফণীন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যাধ্যয়নার্থ গিয়াছে। কিন্তু তথায় লোক পাঠাইয়া সংবাদ পাইলেন যে ফণীন্দ্র কতিপয় দিবস বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত আছে। এইরূপ স্থানে স্থানে চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রের সন্ধান লইতে লাগিলেন। সন্ধান লইতে লইতে সপ্তাহ কাটিয়া গেল; তৎপরে মাস, মাসের পর বৎসর গেল, চন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে তখনও নিশ্চেষ্ট হইলেন না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ, বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবকে পত্র লিখন ইত্যাদি নানাপ্রকারে তাঁহার বহুল অর্থ ব্যয় হইল। কিন্তু এরূপ ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়াও তাঁহার মনোরথ

পূর্ণ হইল না। পুত্রের নিরুদ্দেশ বশতঃ চন্দ্রনাথের মনে সুখ নাই, সদা ক্ষুণ্ণভাবে দিন যাপন করেন। কাজ কর্ম্মে আর তাঁহার তাদৃশ অভিরুচি নাই; বিষয় আশয় বহু-কালের নিয়োজিত জনৈক কর্ম্মচারী দেখিয়া শুনিয়া থাকে। মাসে মাসে সে ব্যক্তি যে টাকা আনিয়া দেয়, তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়। এইভাবে দিন যাইতেছে, এমন সময়ে পুত্রবধূর অসৎ চরিত্রের কথা তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল; তিনি সেই কথা শুনিয়াই ক্রোধান্বিত হইয়া বৈবাহিককে একখানি পত্র লিখিলেন এবং আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মনস্থ করিলেন। একে ফণীন্দ্রনাথের বিচ্ছেদে তাঁহার চিত্ত এককালে ঔদাস্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল; তাহাতে পুত্রবধূ কুলে কলঙ্ক দিয়া কুলটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এ কথা শুনিয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সংসারে আর একদণ্ড সময় ক্ষেপণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি অল্প মূল্যে সমুদয় সম্পত্তি অচিরে হস্তান্তর করিয়া দুহিতা ও সহধর্ম্মিণী সহ কাশীধামে বাস করিবেন মনস্থ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে রায় মহাশয়ের অনুরোধে বক্কেশ্বর পশ্চিমা-ঞ্চলে তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছেন। মিত্রজা মহা-শয়ের বিষয় সম্পত্তি যৎসামান্যই ছিল; তাহা ধর্ম্ম পরায়ণ রায় মহাশয় উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া, বক্কেশ্বরের নামে একখানি দুই হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। মিত্রজা মহাশয়ের নিকট

হইতে রাধামতির প্রস্থান দিবসাবধি একমাত্র রায় মহাশয়ের যত্নেই তিনি এতাবৎকাল প্রতিপালিত হইতে ছিলেন; এক্ষণেও রায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে তীর্থ-পর্য্যটন করাইতে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা সর্ব্ব-সমেত বাটী হইতে পাঁচজনে যাত্রা করিয়াছিলেন, এক জন পাচক ব্রাহ্মণ, গোপাল, মিত্রজা মহাশয় ও হেমেন্দ্র সমভিব্যাহারে দ্বারকানাথ রায়। প্রথমতঃ তাঁহারা বৈদ্যনাথ, তথা হইতে গয়া, গয়া হইতে আলাহাবাদ, তথা হইতে মথুরা, মথুরা হই তে বৃন্দাবন, এইরূপ স্থানে স্থানে পাঁচ সাত দিন হিসাবে যাপন করিয়া, সমস্ত ঠাকুর দেবতাদি দেখিয়া, মনের আনন্দে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। সংসার-বন্ধনে এতাবৎকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, কি প্রকারে পরিবারবর্গের অভাব মোচন হইবে, আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে,এই সকল ভাবনা চিন্তাতেই উভয়ের সময় যাপিত হইয়াছে। এক্ষণে রায় মহাশয় ও বক্কেশ্বরের বার্দ্ধক্য অবস্থা উপস্থিত; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, অনুষ্ঠিত কাজ কর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, এই সকল ভাবনা চিন্তায় উভয়েই ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন হইয়াছেন। পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিয়া যে অসার আমোদ প্রমোদে সুখসম্ভোগ করিবেন,সে আসক্তি এক্ষণে আর তাঁহাদিগের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে না।

হেমেন্দ্র সাক্ষাৎ পাপের প্রতিমূর্ত্তি! চিরকালই অসৎ কার্য্যে সংযত থাকিয়া দিনাতিপাত করিয়াছে। রাধামতির

নিকট হইতে যে দিবস রায় মহাশয় তাহাকে গৃহে লইয়া আসেন, সেই সময় হইতেই তাহার যেন চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে। হতভাগ্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, ইহ জীবনে আর কদাচ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। এক্ষণে বিদেশে পিতার কষ্ট হইবে, সাধ্যমত পিতার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার সান্ত্বনা করিবে, এই অভিপ্রায়েই পিতার অনুগামী হইয়াছে। গুরুজনের ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া, সৎসঙ্গ প্রভাবে দিনে দিনে তাহারও ধর্ম্মে আসক্তি জন্মিয়াছে। রায় মহাশয় যত স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর হেমেন্দ্রের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। অভাগা বাল্যকালাবধি লেখা পড়ায় সাধারণতঃ তাদৃশ মনোযোগী হয় নাই, বিশেষতঃ ইদানীন্তন ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত তাহার মনে মনে সাতিশয় আক্ষেপ জন্মিয়াছে। অবকাশ মতে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, হেমেন্দ্র আগ্রহ সহকারে শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করিতে লাগিল। এইরূপ ধর্ম্মান্দোলনে মনোনিবেশ করিয়া দিনে দিনে তাহার ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নারকী হেমেন্দ্র কাল ক্রমে নবজীবন লাভ করিল, তাহার আর অসার সংসারের প্রলোভনে হৃদয় বিচলিত হইল না। রায় মহাশয় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা কাশীধামে উপনীত হইলেন।

বিদেশে পয়সা হাতে থাকিলে কোন কষ্টই নাই। রায় মহাশয় সঙ্গতিসম্পন্ন পুরুষ; তীর্থ-স্থানে ক্রিয়া

কলাপ, পিতৃ-লোকের শ্রদ্ধাদি যথাযথ সম্পন্ন করিলেন। বলা বাহুল্য বক্কেশ্বরকে তিনি প্রাণের সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতেন, মিত্রজা মহাশয়কেও তিনি নিজ ব্যয়ে ক্রিয়াদি করাইলেন। অধিকন্তু বক্কেশ্বরের নিকটে দুই সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ ব্যতীতও নগদ প্রায় দেড় শত টাকা ছিল; সেই সমস্ত টাকা দেবসেবা ও অন্যান্য ক্রিয়া কলাপাদিতেই মিত্রজা মহাশয় ব্যয় করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফণীন্দ্র কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ সং করিয়া ছিলেন, বাল্যকালাবধি তিনি কখন অসৎসঙ্গে কালক্ষেপ করেন নাই, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বিষয় বুদ্ধি তাঁহার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় তিনি বাটী হইতে মনের দুঃখে বহির্গত হইয়া ছিলেন। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল পিতা মাতার কোন তত্ত্বই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সময়ে, তিনি যে অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতা মাতার সুখ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছেন; এই সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত

হওয়ায়, আর তিনি তাঁহাদিগের সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত-মনে থাকিতে পারিলেন না। তজ্জন্যই তিনি পিতার সংবাদ প্রাপ্তি আশয়ে রেজেষ্টারি করিয়া টাকা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পত্রখানি পিতৃদেব প্রাপ্ত হন নাই। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়, 'চন্দ্রনাথ বাবু তথা হইতে বহুদিবস চলিয়া গিয়াছেন' এই কয়েকটী কথা পত্রের উপরিভাগে লিখিয়া দিয়া পত্র প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। সেই পত্রখানিও যথাকালে ফণীন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছে। পিতা, মাতা, ভগ্নী ও সহধর্ম্মিণী—কে কোথায় গেল, আমিত নিরুদ্দেশ হইয়াছি; তাঁহারাও কি সকলেই নিরুদ্দেশ হইলেন? অথবা করাল কাল কি সমস্ত পরিবারবর্গকে এককালে গ্রাস করিয়াছে? পিতা দেশত্যাগী হইয়াছেন! কোথা যাইলেন, না জানি তাঁহারা প্রাণগতিক কে কেমন আছেন? জনক জননীর তিনিই নয়ন-পুত্তলি ছিলেন; তাঁহার ক্ষণেক অদর্শনে তাঁহারা ধরা শূন্যময় দেখিতেন। তিনি সেই দয়ামায়া ছেদন করিয়া বাটী হইতে আসিয়া অতি অন্যায়কার্য্য করিয়াছেন,এ মহাপাপের জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হইবে! এই সকল ভাবনা চিন্তায় ফণীন্দ্রের হৃদয় উত্তরোত্তর বিচলিত হইতে লাগিল। যদিও তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এতাবৎকাল তাঁহাদিগের কোন সংবাদ আদি লইলেন না কেন? এই সকল বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া ফণীন্দ্র অস্থির চিত্ত হইলেন।

এক দিবস কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি এইরূপ

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে প্রধানতম কর্ম্মচারী সাহেব বাহাদুর উপস্থিত হইলেন। সেই সাহেবই তাঁহার কার্য্যের পারদর্শিতা বশতঃ তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। ফণীন্দ্রনাথকে এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া, সাহেব উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে এরূপ মনোভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফণীন্দ্রনাথ শোকাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, যে প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার এতাদৃশ পদোন্নতি হইয়াছে, তিনি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখনও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই! সাহেব পুনরায় তাঁহাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিতীয়বারে ফণীন্দ্রের চটক ভাঙ্গিল। তিনি প্রভুকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই কাষ্ঠাসন হইতে সত্বর উত্থান পূর্ব্বক যথাযথ অভিবাদন করিলেন এবং অবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস তাঁহার নাসিকা-গহ্বর দিয়া বহির্গত হইল। সাহেব পুনরায় তাঁহাকে এরূপ বিষন্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফণীন্দ্রনাথ মনোগত ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া,অন্য কথার উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া ধরাতলেই বসিয়া পড়িলেন। উদার-প্রকৃতি সাহেব মহোদয় তাঁহাকে উপস্থিত মতে এসকল কথা আর জিজ্ঞাসা না করিয়া, অন্য দুই একটী কার্য্য

সংক্রান্ত কথার উত্থাপন করিয়া আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সে দিবস যথাসময়ে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফণীন্দ্রনাথ বাসায় উপস্থিত হইলেন। যে বন্ধুর আনুকূল্যে তিনি প্রথম কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিলেন না। মনের আক্ষেপে প্রিয় বন্ধু হীরালাল সমীপে সবিশেষ ঘটনার আদ্যোপান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন।

মনে কোন ভাবের উদয় হইলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহা অপরের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, সে ক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় নিয়তই চিন্তা-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে থাকে। একের মনোগত উদ্দেশ্য অপরে সম্যকরূপ বুঝিতে পারে না, কথায় কথায় প্রকাশ পাইলেই তখন বুঝিয়া, তাহার সহিত তাহার সহানুভূতি জন্মে। যে কার্য্য অতীব দুরূহ, তাহাও সম্পন্ন করিতে লোকে শক্তি অনুসারে চেষ্টা করে। ফণীন্দ্রনাথ এতাবৎ কাল মনের দুঃখ মনেই সম্বরণ করিয়াছিলেন, বাল্যসহচর হীরালাল সমীপেও কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বাটী হইতে রেজেষ্টারী পত্রখানি ফিরিয়া আসায়, তিনি আর হৃদয়োদ্বেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না। যে দিবস ডাক হরকরা তাঁহার হস্তে পত্র খানি দিয়া যায়, সেই সময় হইতেই তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইল। তিনি এই চঞ্চল অবস্থাতেই প্রভুর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে সকল কথা প্রকাশ না করিলে তাঁহাকে মনোদুঃখেই যাপন করিতে হইবে, অথচ লোকে

জানিতে পারিলে তাহার হয়ত উপকার হইতে পারে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি প্রিয়বন্ধু সমীপে নিঃসন্দেহে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার হৃদয়-বেদনা প্রিয় বন্ধুর হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হীরালাল আপনার সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া, যথাযথ প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

এদিকে ফণীন্দ্রনাথের প্রভু বিজাতীয় হইলেও তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন, একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে ফণীন্দ্রনাথ কার্য্যস্থানে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি সাতিশয় সদয় ও উদার প্রকৃতি। অনুগত ব্যক্তির যাহাতে দিন দিন উন্নতি হয়, মনের সুখে দিন যাপন করিতে পারে, এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি ফণীন্দ্রনাথের অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অনতি বিলম্বে হীরালালও বন্ধুর সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন। অনন্তর ফণীন্দ্রনাথের যাহাতে মনস্তৃপ্তি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বন্ধু ও প্রভু উভয়েই সচেষ্টিত হইলেন। অভাগা ফণীন্দ্র একাকী যে কার্য্যের অনুসন্ধানে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, এতদিনে সেই বিষয়ে তিন জনে উদ্যোগী হইলেন।

বড়লোক কোন কার্য্যে অনুরাগী হইলে, তাহা অতি সত্বরই সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা। আডিট আফিসের প্রধান সাহেব ফণীন্দ্রনাথের জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি চন্দ্রনাথ বসুর দেশ ত্যাগ সম্বন্ধে

সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন; যথা-সময়ে পত্রের প্রত্যুত্তর তাঁহার হস্তগত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, ফণীন্দ্র নাথের পিতা এক্ষণে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি সমুদয় বিক্রয় করিয়া কাশী-ধামে কন্যা ও সহধর্ম্মিণী সমভিব্যহারে বাস করিতেছেন। দয়ালু প্রভু ফণীন্দ্র নাথকে এই সংবাদ প্রদান করিলে তাঁহার কথঞ্চিৎ মনের উদ্বেগ দূর হইল। পত্র দ্বারা সন্ধান লইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন, সে অপেক্ষাও এক্ষণে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। বহুকালের পর পূজনীয় জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিবেন, ইহাপেক্ষা আর তাঁহার পক্ষে গৌরবের সামগ্রী কি আছে? তিনি প্রভুর নিকট সংবাদ পাইয়াই তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। দয়ালু প্রভু তৎক্ষণাৎ বিনাব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানি ছাড়পত্র লিখিয়া দিলেন এবং পথিমধ্যে তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রযুক্ত কোন গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা আশঙ্কায় তাঁহার বন্ধুকেও তাঁহার সহিত প্রেরণ করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

জামালপুর হইতে যাত্রা করিয়া পর দিবস প্রভাতে ফণীন্দ্রনাথ জনৈক ভৃত্য ও বন্ধু সমভিব্যহারে কাশীধামে উপনীত হইলেন। তথায় কিঞ্চিৎকাল অনুসন্ধানের পরেই যথায় জনক জননী বাস করিতেছিলেন, সেই বাটীতে ফণীন্দ্রনাথ বন্ধু ও ভৃত্য সহ বহুকালের পর উপস্থিত হইলেন।

পুত্রগত প্রাণ চন্দ্রনাথও ফণীন্দ্রকে দেখিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। দরদর ধারে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি সংসারের আশা ভরসা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাপন করিবেন, এই অভিপ্রায়েই গৃহত্যাগী হইয়া বারাণসী ধামে বাস করিতেছিলেন। যে পুত্রের কারণ তাঁহার সংসার ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, সংসারী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, সাংসারিক সম্বন্ধ যাহার কারণ তাঁহার এককালে রহিত হইয়াছে, বহুদিবসের পর অকস্মাৎ সেই প্রাণাধিক ফণীন্দ্রনাথকে সন্নিকটে পাইয়া চন্দ্রনাথের মুখ হইতে প্রথমে কোন কথা নিঃসৃত হইল না। তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অনিমেষ লোচনে সন্তানের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ফণীন্দ্রনাথ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহার শিষ্টতা ও সদাচারের কারণ সকলেই তাঁহার

প্রশংসা করিত। তিনি নিজ বুদ্ধি কৌশলে ও সৌজন্যতা গুণেই প্রভুর অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। মনের উদ্বেগেই বৃদ্ধ জনক জননীর দয়া মায়া কাটাইয়া সংসার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া প্রবাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু যে দিবসাবধি তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সেইক্ষণ হইতে পিতামাতাকে এরূপ মনোদুঃখ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা পৈত্রিক আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইযাছেন, কতকালে তাঁহাদিগের সংবাদ পাইবেন, তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন কি শোক তাপে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, জনৈক ভদ্রতনয়ার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, অভাগিনী তৎকালে বালিকাবস্থা প্রযুক্তা স্বামীর যথাযথ আদর যত্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে শিক্ষা করে নাই, এই অপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন তাহার দশাই বা কি হইল? ফণীন্দ্রনাথ এই সকল ভাবনা চিন্তায় এতাদৃশ আকুলিত হইয়াছিলেন যে পিতার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শে পিতৃদেবের ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে, আশঙ্কা করিয়া নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু পিতৃদেবের নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতেছে লক্ষ্য করিয়া. আর তিনি সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। বাহু যুগল দ্বারা পিতৃদেবের চরণ ধারণ পূর্ব্বক তদুপরি মস্তক স্থাপন করিয়া কৃতাপরাধের জন্য পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

হারানিধি চন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছে, তিনি পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া অনিমেষ লোচনে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া

রহিলেন ও ঘন ঘন ফণীন্দ্রের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ফণীন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্র নাথের পত্নী অন্তঃপুর হইতে কন্যা সহ সবেগে চন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ফণীন্দ্রনাথ গর্ভধারিণীকে দেখিয়া ভক্তি সহকারে তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। এদিকে তাহার বন্ধু ও ভৃত্য অন্তঃপুরবাসিনীগণ মনের উদ্বেগে বহির্বাটীতে উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতা, মাতা ও ভগ্নীর কুশল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বন্ধুর বিশ্রামার্থ অনু-রোধ করিলেন এবং বৈঠকখানা গৃহে লইয়া যাইলেন।

চন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুকালের পর অঞ্চ-লের ধন ফণীন্দ্রনাথকে পাইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পিতামাতা পুত্র কন্যা সকলেরই হৃদয় আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত হইল। কিন্তু সুখ—ক্ষণস্থায়ী, দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়; তাহার গতি বিধি নির্ণয় করা সুবিজ্ঞ পুরুষেরও ক্ষমতাতীত!

মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া কালক্ষেপ করিতেছে, অকস্মাৎ ফণীন্দ্রনাথের হৃদয়ে রাধামতির অপরূপ প্রতি-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল; সুখের সময়ে সকল কথাই মনো-মধ্যে উদয় হইতে থাকে। পিতা মাতা ও ভগ্নীকে ফণীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু যে প্রণয়িণীর প্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া বিদ্যাধ্যয়নে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহার পরমারাধ্য জনক জননীকে ত্যাগ করিয়া

এতাবৎকাল বিদেশে দীন ভাবে দিন যাপন করিলেন; একমাত্র যাঁহার অবলম্বনে ফণীন্দ্রনাথ সাধের সংসারে সংসারী হইবেন মনে মনে কল্পনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সেই নয়নমণি, হৃদি-বিলাসিনী রাধামতি কোথায়? পিতা মাতাবিদ্যমানে পরিবারের কথা উত্থাপন করিতে তাঁহার মনে মনে লজ্জার সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি এক্ষণে সহধর্ম্মিণীর সংবাদ শুনিবার আশায় একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, কোন প্রকারে প্রেম-প্রতিমার সমাচার জ্ঞাত না হইলে, তাঁহার উদ্বিগ্ন হৃদয় কিছুতেই প্রকৃতস্থ হইবার নহে ফণীন্দ্রনাথ পত্নীর তত্ত্বানুসন্ধানে অধীর হইয়াছেন, চন্দ্রনাথ পুত্রের বাহ্যিক হাব ভাব দর্শনে মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বধূমাতা যে কুলে কালী দিয়া বিপথগামিনী হইয়াছে, সেকথা আর পু্ের নিকট কোন মুখে প্রকাশ করিবেন? তিনি পুত্রের সকাতর ভাব অবলোকনে কথায় কথায় তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহের কথা জানাইলেন। এক্ষণে ফণীন্দ্রনাথের আশা ভরসা সকলই ফুরাইল! পিতা অকস্মাৎ তাঁহাকে বিবাহ করিবার কথা বলিলেন; রাধামতি তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী, সাংসারিক যাবতীয় সুখে উপেক্ষা করিয়া যে ফণীন্দ্র রাধামতির একমাত্র অনুরাগাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার পক্ষে অন্য রমণীর সহিত প্রণয়বন্ধনে সম্মিলনের কথা হৃদয়ে বজ্রাঘাত সদৃশ বোধ হইল। ফণীন্দ্রনাথ অনিমেষ লোচনে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। জগতবে

একমাত্র উপাস্য দেবদেবী জনক জননী! সেই পিতা তাঁহাকে দ্বার পরিগ্রহের কথা বলিয়াছেন, একথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেও পিতাকে কোন কথা বলিবার তাঁহার অধিকার নাই! তিনি পুত্র হইয়া পিতার কথায় প্রতিবাদ করিলে গুরুজনের অবমাননা করা হয়। এইরূপ বিপাকে পড়িয়াই ফণীন্দ্রনাথ একবার সংসারত্যাগী হইয়া ছিলেন। এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া মাতৃসমীপে গমন করিলেন। সে দিবস আর কোন কথার উত্থাপন হইল না। ফণীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভৃত্য আহারাদি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ফণীন্দ্র সহধর্ম্মিণীর সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্নমন, তাহাতে পিতার কথায় তাঁহার হৃদয় এরূপ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল যে, প্রিয়বন্ধু বিদায় যাচ্ঞা করিলে তিনি তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করিলেন না। সন্ধ্যার ট্রেণে ফণীন্দ্রনাথের বন্ধু জামালপুর যাত্রা করিলেন, ফণীন্দ্র তাঁহার সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া গাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর রাত্রিকালে যথাযথ আহারাদি সমাপ্ত হইলে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিল।

রজনী জীবের শান্তি-দায়িনী. শ্রমীজন দিবাভাগে শ্রম করিয়া নিশাযোগে অবসর গ্রহণ করে। এ সময়ে লোকের সাংসারিক ভাবনা চিন্তা কতক পরিমাণে শিথিল হইয়া যায়। দিবাভাগে নরনারী যাদৃশ বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, রাত্রিকালে সে সকল কার্য্যে অব্যাহতি পাইয়া, মনের আনন্দে নিদ্রা-দেবীর

সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত হইয়া শান্তিলাভ করে। কিন্তু চিন্তানলে যাহার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, এরূপ বিরাম সময়েও তাহার অবকাশ নাই! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নয়ন দ্বয় নিদ্রাদেবীর প্রবল প্রতাপে নিমীলিত হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত চিন্তাভারাক্রান্ত ব্যক্তি অধিকতর আকুলিত। ফণীন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া সকলকেই দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার বিরামদায়িনী প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। রাধামতি কোথায়? পিত্রালয়ে কি অবস্থিতি করিতেছেন? এক্ষণে তিনি যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীতা হইয়াছেন, এ সময়ে কি পিতার নিকটে আছেন? শ্বাশুড়ীর ত বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে, শ্বশুর কি এখনও জীবিত? শ্বশুর মহাশয় কি দুহিতাকে অবলম্বন করিয়া এখনও সংসার আশ্রমে আবদ্ধ আছেন? আচ্ছা যদি সহধর্ম্মিণী পিতৃগৃহেই বাস করিতেছেন, তাহা হইলে পিতা তাহাকে আনাইবার কথা না উত্থাপন করিয়া, আমাকে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করিবার কথা বলিলেন কেন? তবে কি সহধর্ম্মিণী অভাগাকে পরিত্যাগ করিয়া এ সংসার হইতে জন্মেরমত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? পিতা যেন কোন বিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন না, মাতার মুখেওত প্রিয়া সম্বন্ধে কোন কথা শুনিলাম না! জনকজননী উভয়েই যেন সন্তানের নিকট বধূ সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত করিলেন না, কিন্তু সহোদরা কি এগূঢ় রহস্য সবিশেষ অবগত নহে? ভগ্নীর নিকট অবশ্যই সকল কথা শুনিতে পাইতাম, কই তাহার মুখেত কোনি

কথাই শুনিলাম না। আমার সাধের রাধামতি তবে কোথায় গেল? এ যে বড় বিষম সমস্যায়ই পতিত হইলাম! সংসার ত্যাগী হইয়া মনের সুখে দিন কাটাইতাম, আজি এ কি ঘোর দুর্ব্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হইলাম! আমি যাহাকে দেখিয়া সুখ-সাগরে নিমগ্ন হই, যাহার সুখ চিন্তায় দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া মনে মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়না, যে প্রণয়িণী আমার প্রতি সময়ে অনুরাগিনী হইবে এই আশায় বিশ্বস্তহইয়া অদ্যাবধি প্রাণধারণ করিতেছি; আমি যাহাকে জীবনাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করি, যাহার সহিত আমার এ জীবনাতীত সম্বন্ধ, এক্ষণে সেই জীবন-সঙ্গিনী আমার রাধামতি কোথায়? এসংবাদ কাহার নিকট জানিতে পারিব? কে আমাকে তাহার সবিশেষ সংবাদ প্রদানে এ ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে? এইরূপ ভাবনা চিন্তায় ফণীন্দ্রনাথ জাগরিতাবস্থায় সারারাত্রি ক্ষেপণ করিলেন। বহুকালের পর বাটী আসিয়াছেন, স্বজন সহ মিলিত হইয়া মনের আনন্দে দিন যাপন করিবেন, কিন্তু একমাত্র সহধর্ম্মিণী তাহার সে সুখের পথে কণ্টক হইল। জননী ও সহোদরা পরদিবস প্রভাতে ফণীন্দ্রের বাহ্যিক বিকার লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বিষন্না হইলেন। রাধামতি গৃহ ত্যাগ করিয়া বিপথ গামিনী হইয়াছে, কথায় কথায় এই বিষয় ফণীন্দ্র-নাথের কর্ণগোচর হইল। বিবাহ কালাবধি ফণীন্দ্র রাধা-মতি সহ সহবাসে একদিনের নিমিত্তও সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রণয়ের কি বিচিত্রগতি! রাধামতি

তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী না হইলেও তিনি প্রণয়িণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক যাবতীয় সুখভোগে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যে রাধামতি তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার শুভ চিন্তায় তিনি রাত্রি ক্ষেপণ করিয়াও ক্লান্তি বোধ করেন নাই, এক্ষণে সেই রাধামতি ভ্রষ্টা রমণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তা হইয়াছে। এ সংবাদে ফণীন্দ্রের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। সাংসারিক আশা, ভরসা তাঁহার এত দিনের পর নির্ম্মূলিত হইল; তিনি সহধর্ম্মিণীর এবম্বিধ দুর্ম্মতির কথা শ্রবণ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া পড়িলেন; নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। জনক জননী পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া সাতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হইলেন। শোকের উদ্বেগ যে সময়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই সময়েই কষ্টকর। দিনে দিনে ফণীন্দ্র নাথ প্রকৃতস্থ হইলেন, অধিকন্তু যে পত্নীর প্রণয়াভিলাষী হইয়া তিনি এতদিন সংসার ধর্ম্মে মনঃসংযোগ রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রমণী লজ্জা ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া বারবিলাসিনীদিগের মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া তাঁহার সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হইল। রমণী কি অবিশ্বাসিনী! যে পুরুষ রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জীবন সমর্পণ করে, তাহার অপেক্ষা কাপুরুষ আর নাই। মনে মনে এই সকল তর্কবিতর্ক করিয়া তিনি রাধামতির চিন্তা হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে চির কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিলেন; শয়নে স্বপনে রাধামতি

তাঁহার চিন্তার অবলম্বন ছিল, এক্ষণে সে ভাবনা দূর হইল। পাপিয়সীর নাম উচ্চারণ করিলে পাপ হইবে, জীবনে আর কখন রাধামতির মুখ দর্শন করিবেন না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁহার সংসার ধর্ম্মে বিরক্তি জন্মিল। কামিনীর কুহকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছে, রমণীর সংস্পর্শে আর কদাচ মিশ্রিত হইবেন না, মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন। পিতা মাতাও সন্তানের ভাব গতিক দেখিয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ বিষয়ে তাঁহার নিকটে কেহ আকিঞ্চনও করিলেন না।

ফণীন্দ্রনাথ গত কয়েক বৎসর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া যে অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে এক দিবস কর্ম্মস্থানের আপনার শারীরিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া কার্য্য পরিত্যাগের নিমিত্ত কার্য্যালয়ের প্রধান সাহেবের নিকট একখানি বিনয় পূর্ণ আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। বড় সাহেব তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন, অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ফণীন্দ্রনাথ অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে উত্তরোত্তর তাঁহার মনোবিকার বর্দ্ধিত হইতে পারে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগের প্রার্থনা পত্র অগ্রাহ্য করিলেন এবং কার্য্য স্থানে আসিবার নিমিত্ত যথেষ্ট আকিঞ্চন করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু ফণীন্দ্র আর কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন না, জীবনের শেষ ভাগ মনের সুখে ক্ষেপণ

করিবেন, মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন ; সেই মর্ম্মেই পুনরায় কর্ম্ম স্থানের বড় সাহেবের নিকট আর একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। সদাশয় সাহেব কোন ক্রমেই ফণীন্দ্রকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলেন না, উপায়ন্তর হইয়া তাঁহার আবেদনপত্র গ্রাহ্য করিলেন এবং ফণীন্দ্র-নাথের কার্য্যস্থানে ও অন্যান্য লোকের নিকট যে টাকা কড়ি ছিল, সমুদায় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে ফণীন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক হইলেও তঁহার পিঁতার ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। সুখে দুঃখে দিনাতিপাত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ফণীন্দ্রনাথ শ্বশুর সমীপে ডাকযোগে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বক্কেশ্বর রায় মহাশয়ের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন। যথাসময়ে তাহার উত্তর হস্তগত হইল না। শ্বশুর কি এখন সে বাটীতে নাই ! অথবা তিনি কি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ! কিম্বা দুহিতা এরূপ বিপদগামিনী হইয়াছে বলিয়া লজ্জায় পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন না ? মনে মনে এইরূপ নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া ফণীন্দ্রনাথ সে বিষয়ের আর আন্দোলন করিলেন না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহসংসারেই পাপের যথাযথ প্রতিবিধান হইয়া থাকে। কোন একটী গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপাততঃ পরিত্রাণ পাইলেও নিস্তার নাই, পরিণামে তজ্জনিত বিষম কষ্টভোগ করিতে হয়। অভাগিনী রাধামতি সুখ সম্ভোগের বশবর্ত্তিণী হইয়া পরজন্মে এক দিনের নিমিত্ত যে, সুখে কালাতিপাত করিবে, সে আশা-লতা হতভাগিনীর চির-কালের জন্য নির্ম্মূলিতা হইয়াছে। দেহ বিনিময়ে অসৎ উপায়ে যেকিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে; সেই ধনের প্রতিই বা তাহার বিশ্বাস কি? পাপীয়সী লোকের কুহকে মুগ্ধ হইয়া, জাতি ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া আজি পথের ভিখারিণী। বয়ো-বৃদ্ধি সহকারে তাহার বুদ্ধিচাপল্যও বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে পরিণামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া ইহজীবনের অবশিষ্ট কাল সৎপথে যাপন করিবার বাসনা করিয়াছে। কিন্তু অসতী নারীকে কে আদর যত্ন করিয়া আশ্রয় প্রদান করিবে? রাধামতি যে দিবস কুল শীল লজ্জায় বিসর্জ্জন দিয়া বিপথগামিনী হইয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই সমাজের সহিত তাহার সংশ্রব ঘুচিয়াছে! স্বামী তাহাকে প্রাণা-পেক্ষা ভাল বাসিতেন, শ্বশুরশাশুড়ী, পিতামাতা সকলেরই রাধামতি যত্নের ধন ছিল, পাপীয়সীর নিজ বুদ্ধি দোষেই এইরূপ প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আর প্রতী-

কারের কোন উপায় নাই। অভাগিনী ইহজন্ম শোকানুতাপেই ক্ষেপণ করিবে। মৃত্যুকালে এক গণ্ডূষ জলও কেহ তাহার মুখে প্রদান করিবে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া রাধামতি এক্ষণে এরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে যে, অকস্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবিলম্বে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

যে দিবস দ্বারকানাথ আসিয়া হেমেন্দ্রকে লইয়া গেলেন, সেইক্ষণ হইতে যদি রাধামতির চৈতন্য হইত, তাহা হইলে তাহাকে ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু 'ললাটের লিখন, না হয় খণ্ডন।' বিধাতা তাহাকে সমাজের হাস্যাস্পদ ও লাঞ্ছনা ভোগ উদ্দেশেই স্বজন করিয়াছেন। অভাগিনী সে নির্দ্দিষ্ট বিধি হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? অসৎ লোকের প্রলোভনে মুগ্ধা হইয়া সরলা রাধামতি এক্ষণে পূর্ণ চতুরতার প্রতিমূর্ত্তি! শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা ইত্যাদি যাবতীয় গর্হিত আচরণে রাধামতি বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। গৃহস্থের কন্যা বা বধূগণ পর পুরুষ দর্শনে মনে মনে লজ্জিতা ও শঙ্কিতা হইয়া থাকেন; রাধামতি সে লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়াছে। ব্যভিচারবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মীয় স্বজনের নয়নশূল হইয়াছে। কোন উপায়ে ইহজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই এক্ষণে তাহার শান্তি! সংসার-ছলনায় মুগ্ধা হইয়া লোকের যে অশেষ দুর্গতি হয়, এতদিনে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। লোকে তাহার দুঃখের প্রতীকার করিবে,

সময়ে সহায়তা করিবে, সে সকল অসার কথায় এখন আর তাহার বিশ্বাস নাই। রমণীর গৌরব—যৌবন বয়সে, রাধামতি সেই বয়সে কুপথ-গামিনী হইয়া কত শত যুবকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; এক্ষণে সেই সকল কথা তাহার স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায়, আর তাহার সংসারের প্রতি আশক্তি নাই; এতাবৎ কাল রূপ ও সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া লোকের নিকট হইতে যে টাকা কড়ি হস্তগত করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দরিদ্রদিগকে দান ও ব্রতাদি করিয়া তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিল। অবশিষ্ট অর্থ এক্ষণে রাধামতির হস্তগত, সেই টাকা লইয়া তীর্থ পর্য্যটন মানসে বৈদ্যনাথ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও যথাযথ কার্য্যাদি করিয়া পরিশেষে কাশীধামে উপনীতা হইল। যে রমণীকে লইয়া রাধামতি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিল, তীর্থস্থানে হতভাগিনীর সমস্ত টাকা কড়ি তাহারই নিকট রাখিয়া দিত; কাশীধামে উপস্থিত হইবামাত্র, সেই স্ত্রীলোকটী রাধামতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল, আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এই সময়ে তাহার নিকটে যে যৎকিঞ্চিৎ টাকা কড়ি ছিল, তাহাও জনৈক তস্কর রাধামতির নিদ্রিতাবস্থায় অপহরণ করিয়াছে। প্রকৃত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বারানসী ধামের পথে ঘাটে বেড়াইয়া দুই চারি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া অভাগিনী এক্ষণে দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে, আর ভিক্ষালব্ধ অর্থে

দিনাতিপাত হয় না দেখিয়া অগত্যা রাধামতি লোকের বাটীতে বাটীতে গঙ্গাজল যোগাইতে আরম্ভ করিল। অভাগিনী রাধামতি দশাশ্বমেধ ঘাটে এইরূপ একদিন প্রাতঃকালে জল লইতে আসিয়াছে, অকস্মাৎ ফণীন্দ্রনাথের নেত্রপথে পতিতা হইল; ফণীন্দ্রনাথের এক্ষণে যথেষ্ট অর্থ—বিষয় কর্ম্মে আর অনুরাগ নাই। কোম্পানির কাগজের সুদে তাঁহার সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। তিনি প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বহুকালের পর ফণীন্দ্র স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। ফণীন্দ্র বিদেশে বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন, এতাবৎ কাল সহধর্ম্মিণীকে তিনি এক দিনের নিমিত্তও দেখিতে পান নাই। তাঁহার সহিত রাধামতির প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয়, তৎকালে রাধামতি বালিকা মাত্র। যাহা হউক রাধামতিরও ফণীন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; অনন্তর কোথায় যেন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, এইরূপ মনে মনে সন্দিগ্ধ হইয়া যে যাহার কার্য্যে চলিয়া গেল। সে দিবস কোন কথাবার্ত্তা হইল না। রাধামতি কলস ভরিয়া জল লইয়া চলিয়া গেল, ফণীন্দ্র অনিমেষ লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; দৃষ্টি যতদূর যাইতে পারে, রাধামতিকে তিনি নয়নের অন্তরাল করিলেন না। এ রমণী কে? প্রকৃতই কি রাধামতি—না অন্য কেহ? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ফণীন্দ্র রাধামতির অনুগামী হইলেন; কিন্তু ক্ষণবিলম্বে ফিরিয়া আসিলেন। রাধামতির পশ্চাৎবর্ত্তী হইতেও

ফণীন্দ্রনাথের সাহস হইল না। বিশেষতঃ ফণীন্দ্রনাথের চরিত্র নির্ম্মল, সাধু; অকস্মাৎ রমণীর অনুগামী হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতেছেন, এ অবস্থায় লোকের দৃষ্টি-গোচর হইলে তাঁহার আর লজ্জার পরিসীমা থাকিবে না।

ফণীন্দ্র বাটীতে যাইয়া অন্য দিবসাপেক্ষা সেদিন আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিলেন; রজনীও সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল। ফণীন্দ্রনাথ অন্যান্য দিবসা-পেক্ষা পর দিবস প্রাতেঃই দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। মনে মনে একান্ত বাসনা, সেই স্থানে সেই রমণীর সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইবে। এইভাবে তিনি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে, অদূরে রাধামতিকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রেই ফণীন্দ্রের নয়নযুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাধামতি ফণীন্দ্রের ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া অধোমুখী হইল। রাধামতিকে অবনতবদনা দেখিয়া ফণীন্দ্রের হৃদয় অধিকতর আকুলিত হইল, তিনি আর স্থির ভাবে অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, সত্বর রাধামতির পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলেন। লোকলজ্জা, সমাজ ভয়—ফণীন্দ্রের এক্ষণে কিছুরই প্রতি দৃষ্টি নাই! সেই রমণীই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। সবিশেষ বিবরণ প্রণয়িণী প্রমুখাৎ অবগত হইবেন, এক্ষণে ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা! সেই রমণী প্রকৃতই রাধামতি কি অন্য কোন কামিনী—মনে মনে তাঁহার এক এক বার সন্দেহ হইতেছে; কিন্তু পরস্পর নয়নে নয়নে মিলিত

হওয়ায় উত্তরোত্তর সে সন্দেহ বিদূরিত হইল। ফণীন্দ্র আর স্থির ভাবে অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, অনিবার্য্য মনাবেগে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে রাধামতি! তোমার সহিত যে এ জীবনে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে, অভাগা একমুহূর্ত্তের জন্যও সে আশা করে নাই। প্রাণেশ্বরি! আমি তোমারই জন্য লেখা পড়ায় বিসর্জ্জন দিয়া অহোরাত্র তোমারই মঙ্গল চিন্তায় যাপন করিয়াছি। সংসারে জননীর সহিত তোমার সদ্ভাব হইল না দেখিয়া, পরম পূজ্য পিতা মাতা, স্নেহের ভগ্নী, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তোমা ধনে পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশে অনাথা ভাবে দিনাতিপাত করিয়াছি। বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, তাই তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল।"

রাধামতি স্বামীপ্রমুখাৎ এই কয়েকটী কথা শ্রবণ করিয়াই সশব্যস্তে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল "নাথ! দাসীকে স্পর্শ করিবেন না; আমি নিজ দোষেই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, নিষ্কলঙ্ককুলে কালী দিয়াছি। আমার মত হতভাগিনী এসংসারে আর নাই—।" এই কথা বলিতে বলিতে রাধামতি মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাশায়ী হইল। পথিমধ্যস্থ এক প্রস্তর খণ্ডে রাধামতির মস্তক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তদ্দণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রাধামতি স্বামী-বিদ্যমানে প্রাণত্যাগ করিল। ফণীন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীর অসচ্চরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়াও মনে মনে তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন যে, ইহ জীবনে পত্নীর বিরহে

আর চিন্তা করিবেন না; কিন্তু রাধামতিকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া আর তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, বিস্মৃতি-সলিলে সে সংকল্প বিসর্জ্জন দিয়াছেন! অবিলম্বে লোকজন ডাকাইয়া ফণীন্দ্রনাথ সহধর্ম্মিণীর সংকার করিলেন। তাঁহার পিতা এ সংবাদ শ্রবণে অবিলম্বে পুত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ফণীন্দ্রের মুখাকৃতি দর্শনে তাঁহাকে মনে মনে বিষণ্ণ হইতে হইল।

এত দিনে ফণীন্দ্রের সংসার-পথের কণ্টক দূর হইল! স্ত্রী-বিয়োগ শোকে তিনি এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, পিতামাতার প্রবোধ বাক্যেও প্রবোধিত হইলেন না। অনন্তর তিনি বাহ্যিক হাবভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া, মনে মনে সহধর্ম্মিণীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ফণীন্দ্র বাল্যকালাবধি পিতামাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, একমাত্র রাধামতির প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তিনি তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই রাধামতি তাঁহার হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সহধর্ম্মিণী কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করিয়াছে। হিন্দুসমাজে তাহার কথা মুখে আনিলেও পাপের সঞ্চয় হয়! ফণীন্দ্র সুবিজ্ঞ বিচক্ষণ হইয়াও প্রণয়িণীর রূপে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই পাপিয়সীর শোকে এককালে অভিভূত হইলেন। তিনি মুখে কোন শোক ভাব ব্যক্ত করিলেন না বটে, কিন্তু রাধামতির মৃত্যু দিবসাবধি অহোরাত্র স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন। বৃদ্ধ জনকজননী স্নেহের বশবর্ত্তী

হইয়া ফণীন্দ্রনাথকে প্রকৃতিস্থ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত উদ্যম যত্ন বিফল হইল।

এইভাবে ফণীন্দ্রের শোকতাপে কিছুকাল গত হইলে, এক দিবস চন্দ্রনাথ তাঁহাকে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিলেন। পিতামাতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ফণীন্দ্রনাথেরচৈতন্য হইল। পাপি-যসী কুলকলঙ্কিনী রাধামতির প্রণয়াসক্ত হইয়া তিনি এক বার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ গমন করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল। পুনশ্চ সেই অভাগিনীর মৃত্যুজনিত শোকে ফণীন্দ্র অভি-ভূত হইয়া সংসারে বীতানুরাগী হইতেছেন; এক্ষণে আর তাঁহার হৃদয়ে স্ত্রী-বিয়োগ চিন্তা স্থান পাইল না। পিতা মাতার মনস্তুষ্টিকর কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। পুত্রের আচরণে চন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, লজ্জাশীলা-মনোরমা রূপলাবণ্যা ভদ্রবংশ-জাতা এককন্যারসহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ফণীন্দ্র-নাথের বিষয় সম্পত্তির অভাব নাই, পিতা মাতাকে সুখী করিবার জন্যই এক্ষণে তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে কাশীধামে একখানি বাসোপযোগী সুচারু নিকেতন নির্ম্মিত হইল।

পরিশিষ্ট।

যথাকালে বক্কেশ্বর রায় মহাশয় সহ বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস প্রভাতে ফণীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয়। ফণীন্দ্র শ্বশুর মহাশয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকদিগকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিলেন; কিন্তু গিরিজা মহাশয় জামাতার কথায় কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না; তিনি আর কোন্ মুখে বৈবাহিকের গৃহে যাইবেন?

লম্পট হেমেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণযোগী! সংসারধর্ম্মে তাহার আর তিলার্দ্ধ অনুরাগ নাই! কাশীধামে উপস্থিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে তাহার ধর্ম্মানুরাগ সমধিক বর্দ্ধিত হইল। এমন কি পিতার সেবা শুশ্রূষায়ও তাহার মন বসিল না; পরিণামের মঙ্গল চিন্তায় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক হিমাচলাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে একদিবস জনৈক তপস্বীর সহিত হেমেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়; অভাগা ভবিষ্যৎ-শুভ কামনায় সেই মহা-পুরুষ সমীপে আপনার আদ্যোপান্ত জীবনী যথাযথ বর্ণন করে; সন্ন্যাসী পাতকীর আখ্যায়িকা জ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন, তদ্দণ্ডে যে নয়নযুগলের প্রলোভনে হেমেন্দ্র অসৎ পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সেই নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি রোধ হয়। তৎপরে হেমেন্দ্রের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রাধামতির অধঃপতনের মূল-মন্ত্রণাদায়িনী পাপিষ্ঠা কামিনী ইহসংসার হইতে ইতিপূর্ব্বেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। দুশ্চারিণী ঈশ্বরের নিয়মাধীনে কুষ্ঠ, মহাব্যাধি প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ললিতচন্দ্র চৌর্য্যাপরাধে রাজপ্রহরী কর্তৃক ধৃত হইয়া এক্ষণে কারাগারে বন্দীভাবে জীবন যাপন করিতেছে।

রায় মহাশয় ও মিত্রজা মহাশয় আর গৃহাভিমুখী হইলেন না। কাশীধামে কিছুকাল বাস করিয়া, উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রায় মহাশয়ের পত্নী কনিষ্ঠ পুত্র হেমেন্দ্র সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, সংবাদ পাইয়াই শোক তাপে শয্যাগতা হইয়াছিলেন; আর তাঁহাকে সংসারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। পুণ্যবতী পুত্রবিরহ যন্ত্রণা হইতে অচিরেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নিয়তির নিয়মানুসারে ফণীন্দ্রের পিতা মাতা কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ফণীন্দ্র এক্ষণে সংসারী, জীবনের অবশিষ্টকাল সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করিতেছেন। রাধামতির প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা ছিল, এক্ষণে তাহা নবপ্রণয়িনীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে। দম্পতী প্রণয়মিলনে মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। যথাকালে ফণীন্দ্র দুইটী পুত্র ও একটী কুমারীর পিতা হইলেন।

সমাপ্ত।